ভাষা ও আদিরস

এবং

পরবশতা।

শ্রীশশধর রায় প্রণীত।

কলিকাতা,

২১০।৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রাবণ. ১৩১৬।

মূল্য কাপড়ের বাঁধা ১৲ টাকা।

কাগজের মলাট ৸৹ আনা।

উৎসর্গ পত্র।

যিনি সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় দেখিতেন;
যাঁহার পতি-প্রেম, পুত্র-স্নেহ জগতে
অতুলনীয় ছিল; সেই ধর্ম্মময়ী
মাতৃদেবীর স্মৃতি-বিরচিত
শ্রীপাদপদ্মে এই গ্রন্থ
ভক্তিভরে উৎসর্গ
করিলাম।

ভ্রম সংশোধন।

	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভাষা ও আদিরস	১৪	১৩	পমর্থ	সমর্থ
ঐ	১৮	১০	কামভাব	কামভাব।
পরবশতা	১	২১	শম্বূক	শম্বূক*
ঐ	১	+	+	পাদটীকা—(acorn-shell cirripedes)
ঐ	৪	১৫	পাখার পদযষ্টির	পাখার ও পদযষ্টির।
ঐ	৭	১৬	তপন	তখন।
ঐ	১৩	পাদটীকা		
		৩ পং	৭।১১।১	৬।১১।১
ঐ	১৭	১৫	কর্ম্মক্ষেত্রে	কর্ম্মক্ষেত্র।
ঐ	২০	পাদটীকা	(১)	(২)
ঐ	ঐ	ঐ	(২)	(১)
জাতীয় বিলোপ	৩২	×	পাদটীকা	৩১ পৃঃ পাদটীকা।
ভাব ও কর্ম্ম	৪৭	২১	পরিপুষ্ট	পরপুষ্ট।
দেহ ও কর্ম্ম	৫৮	১৯	সাধান	সাধন।
যোগ্যতমের জয়	৬০	১৫	ঔ	ঐ।
নব সমাগম	৬৬	৮	দিসের	দিগের।
ঐ	৬৮	১৮	ত	০
ঐ	৬৯	২১	জননহীনতার	জননহীনতা।
মানবদেহের আবির্ভাব ও তিরোভাব	৮০	২০	করিতে পারিত	করিয়াছিল।
ঐ	৮৩	৪	মানব নাশের	মানব নামের।
অনন্ত জীবন	৮৮	১৫	সূক্ষ্মাদপি	সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম।
ঐ	৯	২২	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত	যে জীবকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
মৃত্যুর পরপার	১০২	৮	বলিয়াছেন	বলিয়াছি।

বস্তু ও অবস্তু	১০৯	১৪	বাধ্য	বাধ্য।
ঐ	১১০	১৬	সে	যে।
ঐ	১১১	১১	মইল	হইল।
ঐ	১২০	১৫	কামভূলক	কামমূলক।
ঐ	১২৬ পাদটীকা(১)			
		৩ পং	৭৪	৭১
ঐ	১২৮	১৬	কণিকা।	কণিকা। §
মানবদেহের পরিণতি	১৪২	৭	বহিরাচরণের	বহিরাবরণের
ঐ	১৪৯	২	আধও	আরও।
স্বপ্ন	১৭১	১৬	কর্য্যে	কার্য্য।
উদ্ভিদের দুষ্টামি	১৯৯	২৮	রক্ষিত	সঞ্চিত।
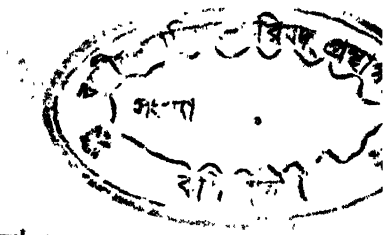
ভাষা ও আদিরস।

ভূমিকা।

মৎপ্রণীত যে সকল প্রবন্ধ ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারই কতিপয় প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল। কেবল "ভাষা ও আদিরসের" পরিশিষ্ট এবং "মৃত্যুর পরপার" আমার রচিত নহে। ঐ দুইটী প্রবন্ধ শ্রীমান সরসীলাল সরকার এম্-এ, এল্, এম্, এস মহাশয়ের রচিত। "ভাষা ও আদিরস" ভিন্ন এই গ্রন্থের অন্য কোন ভাগ তিনি দেখেন নাই।

"ভাষা ও আদিরসে" ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মত প্রচার করা হইতেছে, তাহার নিমিত্ত আমিই দায়ী। ঐ মত অন্য কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। শ্রীমান সরসীলাল ঐ মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন এবং তিনি উহাকে আধ্যাত্মিক ভাবে আরও মৌলিকতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বিবর্ত্তনবাদের সহিত আমার এই মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে আদিরসের আধ্যাত্মিক দিক হইতেই ইহার বিচার করা আবশ্যক। তিনি পরিশিষ্টে এই মত বিশদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষার আদিরসমূলক উৎপত্তিবাদ অভিনব হইলেও জীব-বিজ্ঞানের সহিত ইহার সম্পূর্ণ একতা আছে বলিয়াই বিশ্বাস করি। এই মতের পোষকতায় আমরা যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি, তাহা সুধিগণ প্রচুর বিবেচনা করিলেই কৃতার্থ হইব।

জড়-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞান যথাযথোরূপে আলোচিত না হইলে সাহিত্যও পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, জাতীয় উন্নতিও সুদূরপরাহত হয়। কিন্তু এতদ্দেশে সুকুমার সাহিত্যই অধিকতর আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থা শোচনীয়, সন্দেহ নাই। অধুনা বঙ্গ-সাহিত্যে বিলাসিতা ও চটুলতার ভাব কিছু কিছু কমিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহার স্থানে গভীরতা ও চিন্তাশীলতার ভাব দেখা যাইতেছে। ইহা বিশেষ আশাপ্রদ। কাব্যশাস্ত্রও জাতীয় উন্নতির সহায় হইতে পারে; কিন্তু এতদ্দেশে ঐ শাস্ত্র অধিকাংশস্থলেই সে ভাবে আলোচিত হয় না; ইহাই দুঃখের বিষয়।

উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে এ গ্রন্থে যে সকল কথা লিখিত হইল, তাহা কেহ যেন অপ্রাকৃত অর্থে গ্রহণ করেন না। ঐ সকলকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনাদির ফল স্বরূপ বিবেচনা করিতে হয়। জীবের দেহ ও মন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে এবং অ-ন্যান্য কারণে নিয়মিত হয়। উহাদিগকে উদ্দেশ্য-মূলক বিবেচনা করা সঙ্গত নহে। জীব-বিজ্ঞান প্রকৃতির মূল-উদ্দেশ্যের আলোচনা করে না। কেবল প্রাকৃতিক কার্য্যকারণের বিচার করে মাত্র। তবে সেই মূল উদ্দেশ্যের এবং মূল কারণের কথা স্বভাবতঃই মনে উদয় হয়। উহা ধর্ম্ম শাস্ত্রের অন্তর্গত। এই নিমিত্তই বিজ্ঞানালোচনা শিক্ষার্থীকে ক্রমে ধর্ম্মশাস্ত্রের দিকে লইয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্ববিধ মানবীয় জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের একাংশ মাত্র। সকল আলোচনাই ব্রহ্ম-জ্ঞানের অংশরূপে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক; নতুবা কোন আলোচনাই সুফল-প্রদ হইতে পারে না। এ কথা কখনই বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। আমি এই কথার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভারতীয় বেদান্ত শাস্ত্রের দিক হইতে জীব ও জড় বিজ্ঞানের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। "বস্তু ও অবস্তু" প্রবন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মত সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি। পাঠক দেখিবেন, ঐ মত ভারতীয় অদ্বৈতবাদকে কেমন আশ্চর্য্যরূপে সমর্থন করিতেছে।

এই গ্রন্থে কোন ব্যক্তিবিশেষ, কি সমাজবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলা হয় নাই। নিন্দা প্রশংসা আমার উদ্দেশ্য নহে। বৈজ্ঞানিকভাবে যাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। আশা করি, এই গ্রন্থের কোন অংশকেই কেহ যেন স্তুতিবাদ অথবা অপবাদ মনে না করেন; অলমতি বিস্তরেণ।

রাজসাহী
২৮শে আষাঢ়, ১৩১৬।

শ্রীশশধর রায়।

সূচী।

ভাষা ও আদিরস।

পরবশতা।

ভাষা ও আদিরস।

ভাষার উৎপত্তি সভ্য সমাজের এক প্রধান আলোচ্য বিষয়। বৈয়াকরণ ও দার্শনিক এ বিষয়ের অনেক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে, জীব-তত্ত্বের দিক হইতে ইহার আলোচনা হওয়া উচিত। যাহা দেহ হইতে উৎপন্ন ও যাহা মনের অবস্থা প্রকাশ করে, তাহা অবশ্যই জীব-তত্ত্বের বিষয়ীভূত। মনের পৃথক সত্তা থাকুক, আর না থাকুক সে কথা এক্ষণে আলোচ্য নহে। ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে জীববিজ্ঞান কোনও ইঙ্গিত করে কি না, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

প্রাণিগণ যে পর্য্যন্ত অন্যের নিরপেক্ষভাবে স্ব স্ব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে ভাবের বিনিময় আবশ্যক হয় না। যে মুহূর্ত্তে তাহারা অপরের সংশ্রবে আসে, অথবা সমাজ-বদ্ধ হয়, তখনই ভাব বিনিময়ের আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়। তখন যাহারা সক্ষম, তাহারা শব্দ-উচ্চারণের দ্বারা একে অন্যের নিকট মনেরভাব ব্যক্ত করে। ইহাই ভাষা। এই ভাষা বর্ণাত্মক; বর্ণ ঐ উচ্চারিত শব্দের কল্পিত প্রতিনিধি মাত্র। শব্দ ধ্বন্যাত্মক। সুতরাং ভাষা ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। ইহা প্রধানতঃ মুখ-নিঃসৃত; কিন্তু দেহের অন্যত্র * হইতেও শব্দ উৎপাদন করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করা যায়। ইহা জীব সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই শব্দের অনুকরণেই মুখ-নিঃসৃত ভাষার উৎপত্তি। তবে অন্যবিধ প্রাকৃতিক শব্দের অনুকরণেও ভাষা বর্দ্ধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। শব্দের মূলে যে ধাতু ও প্রত্যয় সকল কল্পিত হইয়া থাকে, তাহারা তীব্র, ক্ষুদ্র স্বরমাত্র, আর কিছুই নহে।

প্রাণিগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; অমেরু অর্থাৎ মেরুদণ্ডহীন ও সমেরু অর্থাৎ মেরুদণ্ডবিশিষ্ট। মোটের উপর বলিতে, উর্ণনাভ ও কীট ব্যতীত অমেরুপ্রাণিগণ সকলেই মূক †। আর সমেরু প্রাণিগণ অল্পাধিক শব্দায়মান।

---

* Weismann's Heredity vol II p 34.

† শব্দায়মান অমেরুগণের কথা পশ্চাৎ আলোচিত হইবে।

অমেরুগণের অনেকেরই স্ত্রী পুং ভেদ হইয়াছে, কিন্তু আদি-রস অর্থাৎ কাম-ভাব ইহাদিগের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত। সমেরুগণের মধ্যে সকলের নিম্নশ্রেণীস্থ জীব,—মৎস্যও এই ভাবের উত্তেজনায় কিঞ্চিৎ পীড়িত হয়; ইহারা ডিম পাড়িবার সময় আগত হইলে ঈষৎ লাল বর্ণ,উজ্জ্বল ও তাপযুক্ত হয়। সুতরাং ইহারা এই ভাবে উত্তেজিত হয়, সন্দেহ নাই। জীব-রাজ্যে উল্লেখযোগ্য কামের উত্তেজনা এই প্রথম আর শব্দ-উৎপাদনও এই প্রথম। সাধারণতঃ অমেরুগণের কামভাব নাই, শব্দ-উৎপাদনও নাই। যে মুহূর্ত্তে সমেরু শ্রেণীতে কামের উত্তেজনা লক্ষিত হইল, অমনই শব্দও আসিয়া উপস্থিত হইল; আর ঐ শব্দ ডিম পাড়িবার সময়ই সঞ্জাত হইল, অন্য সময়ে নহে। মৎস্যগণ উত্তেজিত হইলে পরস্পরের সহিত পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব ইত্যাদি ঘর্ষণ করে, তাহাতেই শব্দ উৎপন্ন হয়; আর তৎপরেই তাহাদিগের উত্তেজনা প্রশমিত হয়। এইরূপে দৈহিক-ঘর্ষণ-জাত শব্দের সহিত এক উপকারিতার ভাব তাহাদিগের অনুন্নত মস্তিষ্কেও স্মৃতি রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। কালক্রমে এই উপকার লাভের প্রত্যাশায় ঐ শব্দ সঙ্কেত-সূচক ধ্বনিতে পরিণত হয়। আর, যখন উত্তেজনায় মৎস্যের সমস্ত শরীর আলোড়িত হয়, সমস্ত শিরা কম্পিত হয়, তখন কতিপয় মৎস্যের মুখ হইতেও একরূপ অব্যক্ত ধ্বনি নির্গত হয়। ইহা দৈহিক উত্তেজনার বাহ্য বিকাশ, এবং ইহাতেও ঐ উত্তেজনা প্রশমিত হয়। এ উপকারও কাল-ক্রমে মৎস্যের স্মৃতি-রূপে পরিণত হয়। তখন ইহাও সঙ্কেত-সূচক ধ্বনির ন্যায় পরস্পরের নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করে। এইরূপ ঘর্ষণ-জনিত ধ্বনি অথবা মুখ-নিঃসৃত ধ্বনি ভাষা না হইলেও, ভাষার পূর্ব্বাভাষ।

তাহার পর কূর্ম্ম। মৎস্যের ন্যায় ইহারাও পৃষ্ঠের কমঠ-ঘর্ষণে একরূপ উচ্চ শব্দ উৎপাদন করে, তাহা কখনও কখনও দূর হইতেও শুনা যায়। কারণ সেই একই; সেই কামজ উত্তেজনা। এই উত্তেজনার ফলে ইহাদিগের দেহ আলোড়িত হইয়া থাকে, এবং মুখ হইতেও ধ্বনি নির্গত হয়। কিন্তু যাহা শারীরিক কারণে উৎপন্ন হইল, তাহার উপকারিতাবশতঃ কালক্রমে তাহা ভাবব্যঞ্জক সঙ্কেতে পরিণত হয়।

মৎস্য, কূর্ম্মাদি অপেক্ষা ভেক ও সর্পাদি অধিকতর মুখর। কিন্তু এ স্থলেও সেই একই কথা। ইহারাও ডিম পাড়িবার সময় সমাগত হইলেই মুখর হয়, অন্য সময়ে তদ্রূপ হয় না। প্রকৃতপক্ষে অন্য সময়ে অর্থাৎ শীতকালে ইহারা অল্পাধিক পরিমাণে নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে। বসন্তে যদিও জাগ্রত হয়, কিন্তু

অতীব দুর্ব্বল থাকে। বর্ষার প্রারম্ভেই ইহারা কামের উত্তেজনা অনুভব করে, আর তখনই ইহাদিগের ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হয়। এই সময়ে ভেকের আনন্দধ্বনিতে চতুর্দ্দিক শব্দায়মান হইয়া উঠে; ইহাদিগের বর্ণ উজ্জ্বল ও দেহ স্ফীত হয়। দেহজ উত্তেজনাই এই মুখরতার মূল কারণ। সর্পগণ কামকাল উপস্থিত হইলে যে প্রকার ভীষণ শব্দ করে, তাহা যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই ভীত হইয়াছেন। যদিও ইহারা অন্য সময়ে সম্পূর্ণ মূক নহে, তথাপি ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, কাম-কালের শব্দের উপকারিতা একবার স্মৃতিরূপে পরিণত হইলে, অন্য সময়ে এবং অন্য উপলক্ষেও উহা ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু কাম-কালীয় শব্দ যেরূপ উচ্চ, পরিষ্কার, গভীর, অথবা তীব্র, অন্যকালীয় শব্দ সেরূপ নহে।

মৎস্য, উভচর * ও সরীসৃপদিগের পরেই পক্ষিগণের কথা বিবেচনা করিতে হয়। ইহাদিগের ন্যায় মুখর জীব আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এবং ইহাদিগের ন্যায় কামোন্মত্ত জীবও আর নাই। উচ্চ, নীচ, গভীর, তীব্র, সুশ্রাব্য, কর্কশ,—সর্ব্বপ্রকার শব্দই ইহারা উচ্চারণ করিতে সক্ষম। ইহাদিগের চিরজীবন সঙ্গীতময়; আবার ইঁহাদের জীবন যেমন প্রণয়মাখা, ইহাদিগের দেহ মন যেরূপ সেই এক ভাবেই উত্তেজিত, এমনও আর কোনও জীব দেখা যায় না। † ইহারা কামকালে যেমন মধুর সঙ্গীত করে, তেমনই নানারূপ নৃত্যাদিও করিয়া থাকে। ‡ এই সময়ে কোনও কোনও পক্ষী এত উত্তেজিত হয় যে, শব্দ করিতে করিতে তাহাদিগের মুখ দিয়া রক্ত বাহির হয়; নৃত্য করিতে করিতে তাহারা অচেতন হইয়া পড়িয়া মরিয়া যায়। পক্ষিগণ যদিও সকলে এতাদৃশ মুখর নহে, তথাপি এই শ্রেণীর কথা বিবেচনা করিলে, আদি রসের সহিত ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে,—ইহা সহজেই মনে হয়। ইহাদিগের জীবনও যেমন কাম-মোহিত, শব্দও তেমনই নানাবিধ ও অতি মধুর।

---

* Amphibans, যথা ভেকাদি।

† Their whole life is saturated with love. Nature, 1903. Quoted from memory.

‡ Akin to the song of birds, and undoubtedly proceeding from the same cause, are the peculiar gestures which the males perform under the influence of the approaching seasons of pairing. Enc Brit. 9th Ed, Vol 3. p 771.

এক্ষণে স্তন্যপায়ী জীবগণের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। এই শ্রেণীর অনেক জীবের কামকাল নির্দ্দিষ্ট আছে; অন্ততঃ স্ত্রীজাতীয়গণের পক্ষে। এই সময়ে ইহারাও পরিষ্কার উচ্চ ও গভীর ধ্বনি করে। সেই ধ্বনিকে এতদ্দেশে "ডাক-আসা" বলে। পশুপালকগণ স্ব স্ব পশুর ডাক আসিলেই বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগের কামকাল আগত হইয়াছে। গো, মেষ, মহিষ, ছাগ, কুকুর, বিড়াল, অশ্ব, গর্দ্দভ প্রভৃতি জীবগণ কামেচ্ছা প্রবল হইলে যেরূপ পৃথক ভাবের ধ্বনি করে, তাহা অনেকেরই সুপরিচিত। ইহাদিগের বংশবৃদ্ধির নির্দ্দিষ্ট কাল থাকুক আর না থাকুক, তৎকালীন ধ্বনির যে এক বিশেষত্ব আছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এরূপ শব্দ অন্য সময়ে নির্গত হইতে শুনা যায় না। এ সময় ইহাদিগেরও দেহ উত্তেজিত ও শারীর-ক্রিয়া চঞ্চল হয়।

অবশেষে মানুষের কথা স্মরণ করিলেও অনায়াসে প্রতীয়মান হইবে যে, তাহারা যৌবনে পদার্পণ করিলেই কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়, উহা আর বাল্যের ন্যায় থাকে না। সেই স্বর-বিকৃতিকে এতদ্দেশে "বয়সা ধরা" কহে। মানবের উত্তেজনা-কাল অনির্দ্দিষ্ট; কিন্তু তথাপিও তৎকালীয় স্বর-বিকৃতি প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। সুতরাং এ স্থলেও আদি রসের সহিত ভাষার সম্বন্ধ থাকা স্বীকার করা যাইতে পারে।

আমরা দেখিলাম যে, আদি রসের সহিত ধ্বনির, শব্দের ও ভাষার নিকট-সম্বন্ধ নিম্ন হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হইতেছে। অমেরু প্রাণি-গণ কামের উত্তেজনা জানে না; তাহারা সাধারণতঃ মূক। সমেরুগণের মধ্যে এই ভাব যাহার যত অপরিস্ফুট, তাহার মুখরত্বও তত অল্প; এবং যাহার যত অধিক, মুখরত্বও তাহার তত অধিক। আমার মনে হয়, যেন পক্ষি-শ্রেণীতেই এই ভাব অতীব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া স্তন্যপায়িগণের মধ্যে উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত অথবা সংযত হইতেছে। সুতরাং ভাষার যে ভাগ ধ্বনির প্রতি নির্ভর করে, তাহা পক্ষি-শ্রেণীতে চরম উন্নতি লাভ করিয়া তৎপরে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু স্তন্যপায়িগণের মধ্যে মস্তিষ্কের আয়তন ও ক্রিয়াশক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখা যায়। এই হেতু ভাষার যে ভাগ শব্দ-যোজনার প্রতি নির্ভর করে, এই শ্রেণীতে উত্তরোত্তর তাহারই উন্নতি হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানবীয় ভাষার মূলেও অতি ক্ষুদ্র তীব্র স্বর অথবা ধ্বনির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। তাহা হইবারই কথা।

যদি কামকালীন উত্তেজনাবশতঃই আলোড়িত দেহ ভেদ করিয়া, কণ্ঠ প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনি নির্গত হয়; এবং যদি তাহাই উন্নত ভাষার পূর্ব্বাভাষ হয়; তবে সে ধ্বনি অব্যক্ত, ক্ষুদ্র, তীব্র ধ্বনিই হওয়া সম্ভব। অননুভূত শারীরিক অথবা মানসিক উত্তেজনা হঠাৎ অনুভূত হইবে, সহজেই দেহ হইতে ঐরূপ স্বর উচ্চারিত হইয়া থাকে। গম্, রম্, কৃ, দৃশ্, স্থা, ভূ, অন্, অদ, রা, লা প্রভৃতি যে সকল ধাতু মানবীয় শব্দের মূলে কল্পিত হইতেছে, তাহারা এইরূপ ক্ষুদ্র তীব্র অব্যক্ত অথবা অর্দ্ধ-ব্যক্ত ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ভাষা-গঠনে আদিরসের প্রভুত্ব অন্য রূপেও উপলব্ধি করা যায়। কাম-ভাবই জীবের আদি ভাব। যে অতীব অনুন্নত জীবের অন্য কোনও ভাব নাই, তাহারও কামভাব আছে। আমি সমেরু জীবের কথাই বলিতেছি। শব্দ অথবা ধ্বনি যদি ভাষার মূল হয়,আর ভাষা যদি ভাবের প্রকাশক হয়,তবে শব্দ অথবা ধ্বনিও ভাবের প্রকাশক। যাহার কাম ব্যতীত অন্য কোনও ভাবই নাই, শব্দ অথবা ধ্বনি তাহার কি প্রকাশ করিবে? ঐ ভাবই ব্যক্ত করিবে। লোভ, ক্রোধ, স্নেহ ইত্যাদি ঐ আদি ভাব হইতেই জাত। উহার উত্তেজনাই লোভের অন্যতর কারণ; উহার অপূর্ণতাই ক্রোধের অন্যতর হেতু; আর ঐ ভাব-সঞ্জাত অপত্যাদিই স্নেহের কেন্দ্রস্থল। কামভাব যদি মৌলিক হইল, উহার উত্তেজনাদি যদি সমস্ত শরীরকে আলোড়িত করিতে সক্ষম হইল, তবে উহা যথাক্রমে ধ্বনি, শব্দ ও ভাষা গঠন করিতে সক্ষম হইবেই। ইহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়। সেইজন্যই ভাষা ও আদিরস, এতদুভয়ের মধ্যে নিকট-সম্বন্ধ আছে, এরূপ বিবেচিত হইতে পারে।

আমরা দেখিলাম যে, কামজ দৈহিক উত্তেজনাই ভাষার মূলরূপে বিবেচিত হইতে পারে। প্রাকৃতিক শব্দের অনুকরণ ভাষাকে পুষ্ট করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা মূল হইতে পারে না। মৎস্য শ্রেণী হইতে স্তন্যপায়ী শ্রেণী পর্য্যন্ত সকল জীবই কাম-কালে * এক বিশেষ উত্তেজনা অনুভব করে এবং অল্পাধিক শব্দায়মান হয়। কিন্তু মৎস্যাদি অনুন্নত জীব সকল প্রাকৃতিক শব্দের অনুকরণ করে না; কারণ উহারা তদ্দ্বারা কোনও উপকারলাভ করিতে সক্ষম হয় না। অসভ্য মানব প্রাকৃতিক শব্দের অনুকরণে স্বকার্য্য সিদ্ধ করিয়া উপকার অনুভব করিতে পারে, কিন্তু অতিনিম্নশ্রেণীস্থ মুখর জীব ঐরূপ অনুকরণ দ্বারা

*Breeding Season.

কোনও উপকার প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং জীব-রাজ্যে তাহার মূল কারণ নির্ণয় করিতে গেলে, প্রাকৃতিক-শব্দানুকরণকে উল্লেখ করা যায় না। বিবর্ত্তন-বাদ অনুসারে, মানবের দেহ ও মন উভয়ই চিরাগত জৈব পরিবর্ত্তনের ফল। সুতরাং যেমন তাহার দেহ-গঠনের মূল সেই অতি অনুন্নত জীবরাজ্যে অনুসন্ধান করিতে হয়, মনের মূলও তাহাতেই অনুসন্ধান করা সঙ্গত। ফলতঃ মানব-মনও অনুন্নত জীবগণের মন হইতে ক্রমবিকাশের নিয়ম-অনুসারে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। শব্দ অথবা ভাষা মনেরই ভাবব্যঞ্জক। কিন্তু সেই প্রাথমিক অবস্থায় ভাষা মনের কোন ভাব ব্যক্ত করিবে? মৎস্য কূর্ম্মাদির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ভাব কি? ক্ষুধা ও কাম। ক্ষুধা তৃপ্তির নিমিত্ত তৎকালে অপরের সাহায্য আবশ্যক নাই; কিন্তু কাম অপরের সাহায্য প্রায় সর্ব্বদাই অপেক্ষা করিত। সুতরাং মনের এই ভাব প্রকাশ হেতুই আদিম ভাষা সঙ্কেতরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ঐ সকল জীবের অন্য ভাব ছিলই না; ভাষা কি প্রকাশ করিবে? কাম, পরাপেক্ষী বৃত্তি। কাম ভাববিনিময়ের আবশ্যকতা জীবকে প্রথমে শিক্ষা দেয়; সুতরাং ভাষাও মূলতঃ তাহারই কীর্ত্তি, সন্দেহ নাই।

এ স্থলে আর এক কথা বিবেচ্য হইতেছে। দেহজ উত্তেজনা যেমন ধ্বনির, শব্দের, সুতরাং ভাষার মূল কারণ; তেমনই ঐ ধ্বনি অথবা শব্দও দেহ-যন্ত্রের ক্রমিক পরিবর্ত্তনের অন্যতর হেতু। কামজ (অথবা অন্য যে কোন প্রকারই হউক), উত্তেজনায় দৈহিক শিরা পেশী সকল ক্রমশঃ উত্তেজিত হইবে, অথচ দীর্ঘকালেও পরিবর্ত্তিত হইবে না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। আর, সেই উত্তেজনা হইতে দেহ আলোড়িত করিয়া যে ধ্বনি উদ্ভব হয়, তাহা কালক্রমে সঙ্কেত-সূচক শব্দে পরিণত হইলে, সেই সঙ্কেতের সূচিত অনুষ্ঠান অবলম্বন করিতেও দৈহিক পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। ঐ ধ্বনির সঙ্কেতবশতঃ এক প্রাণী দ্রুতগতি অন্যের নিকটস্থ হইল; ইহাতে অবশ্যই তাহার গতিবিধায়ক যন্ত্রও ক্রমে সবল হইবে। আর, সে ঐ অব্যক্ত ধ্বনির উপকারিতা অনুভব করিয়া যথা সময়ে উহা পুনঃপুনঃ উচ্চারিত করিতে থাকিবে। তাহাতে তাহার বাগ্‌যন্ত্র, শ্বাস-যন্ত্র, আনুষঙ্গিক শিরা ও মস্তিষ্কও ক্রমে পুষ্ট হইবে। এইরূপে যেমন দেহজ উত্তেজনা ভাষার মূল কারণ হয়, তেমনই ধ্বনি, শব্দ ও ভাষাও দেহযন্ত্রের বিশেষতঃ মস্তিষ্ক পদার্থের পুষ্টিসাধন করে।* ক্রমবিকাশ ক্ষেত্রে

* As the voice was used more and more, the vocal organ would

উভয়েই উভয়ের সহায় হয়। অদ্যাপি ভাষায় চিন্তায় মানব-মস্তিষ্ক পরিমার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। এইরূপে জীব ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ক্রমোন্নতির অন্য কোনও কারণ না থাকিলেও, কেবল ভাষাগত কারণেই জীবের মস্তিষ্ক ও দেহের অন্যান্য অংশ ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিত।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আদি-রস হইতেই কালসহকারে অন্যান্য বৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে। "উহার উত্তেজনাই লোভের অন্যতর কারণ; উহার অপূর্ণতাই ক্রোধের অন্যতর হেতু; ঐ বৃত্তিসঞ্জাত অপত্যাদিই স্নেহের কেন্দ্র স্থল।" কেবল তাহাই নহে; যে সমস্ত দেবতুল্য বৃত্তি মানবকে দেবোপম করিয়াছে, এবং ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদবীতে উন্নীত করিবে, সে সকলই কাম হইতে উৎপন্ন। এই আদি বৃত্তি প্রকৃতই আদি-রস। ধর্ম্মভাব জটিল বৃত্তি; তাহা বহু বৃত্তির সংমিশ্রণে জাত। তন্মধ্যে বিস্ময়, সৌন্দর্য্য-বোধ, আসঙ্গলিপ্সা, ভক্তি, এই সকল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারাও কাম হইতে উৎপন্ন। কাম হইতে আসঙ্গলিপ্সা, সৌন্দর্য্য-বোধ উৎপন্ন হওয়া অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে। এই ভাব হইতে পরার্থপরতার উদ্ভব হওয়াও সহজবোধ্য। তাহা হইতে এবং অপত্য-পালনাদি হইতেও কৃতজ্ঞতা আসিয়া উপস্থিত হয়। সৌন্দর্য্য-বোধ হইতে বিস্ময়, কৃতজ্ঞতা হইতে ভক্তি সহজেই জাত হইয়া থাকে। সুতরাং কামই সর্ব্বপ্রকার উন্নত বৃত্তি সকলের মূলীভূত কারণ। এই উন্নত বৃত্তিনিচয় পরস্পর পরস্পরকে পুষ্ট করে। দেহ ও মন এরূপ ভাবে সম্বদ্ধ যে, দেহের উত্তেজনাবশতঃ মনের, ও মনের উত্তেজনাবশতঃ দেহের পরিবর্ত্তন হইবেই। এই পরিবর্ত্তন সকল কালে পুঞ্জীকৃত হইয়া এক দিকে যেমন উন্নত দেহ, অন্য দিকে তেমনই উন্নত মন গঠিত করে। মনের উন্নতিতে ভাষার উন্নতি; ভাষা ভাবের কিঙ্করী মাত্র। আর, সর্ব্ব ভাবই সেই আদি বৃত্তি হইতে জাত। আদিরস সত্যই আদিরস। এই ভাব হইতে, ধ্বনি, শব্দ ও ভাষা জাত ও পুষ্ট হইয়াছে; এবং এক পুরুষের পুষ্টি বংশানুক্রমে আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ভাষার মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া ডারুইন্ বলিয়াছেন যে, মানবীয় ভাষা তাহার স্বভাবিক ধ্বনি * হইতে উৎপন্ন। তিনি অন্যান্য কারণের মধ্যে

have been strengthened and perfected through the principle of the inherited effects of use and this would have reacted on the power of speech,—Descent of man, 1906 P, 133-4.

* Man's own instinctive cries, Descent of Man, 1906 Page 131.

স্বাভাবিক ধ্বনিকেও অন্যতম কারণ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, মানব প্রথমে কামের উত্তেজনায় নারীকে আকর্ষণ করিবার জন্যই সঙ্গীতের ভাষা ব্যবহার করে;—তাহা হইতেই ক্রমে প্রেম, হিংসা ও জয়-প্রকাশক শব্দের উৎপত্তি হয়; এবং তাহা হইতে বিবিধ জটিল ভাব-ব্যঞ্জক শব্দ সঞ্জাত হয়। † ডারুইনের চিন্তা মানবকে অতিক্রম করিয়া মানবের পূর্ব্ববর্ত্তী বহুযুগ পর্য্যন্ত প্রেরিত করিলে বুঝা যায় যে, তৎকালীয় অতীব অনুন্নত জীবগণের সম্বন্ধেও এই কথাই সত্য। তাহাদিগের Instinctive cries বা স্বাভাবিক ধ্বনি কি? উহাই কামজ ধ্বনি। ঐ Instinctই কাম। উহারাও কাম-কালেই শব্দায়মান, অন্য কালে মূক। সুতরাং ডারুইন্ যদিও কাম-বৃত্তিকেই ভাষার মূল বলেন নাই, তথাপি আমার মনে হয় যে,—বিবর্ত্তনবাদ স্বীকার করিলে, এই সিদ্ধান্তই অধিকতর সঙ্গত।

আমরা বলিয়াছি যে, দেহজ উত্তেজনা যেমন ধ্বনির অর্থাৎ ভাষার মূল, তেমনই ঐ ধ্বনি অথবা শব্দ উচ্চাচরণ করিতেও দেহযন্ত্রের ক্রমিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। বস্তুতঃ ধ্বনি শব্দ ও ভাষার প্রভাববশতঃ বাগযন্ত্র ও মস্তিষ্ক বিশেষরূপে পুষ্ট হয়। ধ্বনি ও শব্দ, যাহা সকল ভাষারই মূল, তাহা কামজ। এই মত সত্য হইলে, যাহাদিগের কামের উত্তেজনা অধিক, তাহাদিগেরই বাগযন্ত্রাদিও অধিকতর পুষ্ট হইবে, এরূপ আশা করা যায়। প্রায় সকল জীবের মধ্যেই পুংজাতীয় প্রাণিগণ অধিকতর কামোন্মত্ত। পুরুষেরাই এই আদিভাবে অধিক উত্তেজিত হয়। (২) সুতরাং পুরুষ জাতিগণের মধ্যেই বাগযন্ত্রাদির অধিকতর পুষ্টি লক্ষিত হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষেও তাহাই দেখা যায়। পুংজাতীয় পক্ষিগণের মধ্যে অনেকের গলনালী (æsophagus), কণ্ঠলগ্ন বায়ুযন্ত্র (air sac), কণ্ঠ-তার ইত্যাদি অধিক পুষ্ট ও বৃহৎ; স্ত্রীগণের

---

† Primeval man, or rather some early progenitor of man probably first used his voice in producing true musical cadences, that is singing; * * * and we may conclude that this power would have been specially exerted during the courtship of the sexes,—would have expressed various emotions, such as love, jealousy, triumph * * it is threfore probable that the imitation of musical cries by articulate sounds may have given rise to words expressive of various complex emotions. Descent of Man P, 133.

(২) cf. Descent of man Part II.
cf. Poulton's Colour of Animals.

হয় ত উহার মধ্যে কোনটী নাই, না হয় ত ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বলরূপে বর্ত্তমান আছে। ইহাদিগের পুংজাতীয়গণের কণ্ঠ-সঙ্গীত (৩) অধিকতর স্পষ্ট ও সতেজ। স্তন্যপায়ী শ্রেণীতেও পুংজাতীয়গণের বাগযন্ত্রই পুষ্ট; সুতরাং তাহাদিগের স্বরও স্ত্রীজাতীয়গণের স্বর অপেক্ষা উচ্চ, গভীর ও পরিস্ফুট। মানবগণের মধ্যেও স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরই স্বর উচ্চ, গভীর ও তীব্র। বাগযন্ত্র পুরুষগণেরই পুষ্ট; বক্ষঃস্থলও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে পুরুষেরই বড়; মুখগহ্বরও তাহাদিগেরই অধিকতর বিস্তৃত। সুতরাং মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে যে, পুরুষগণেরই বাগযন্ত্র অধিক পরিপুষ্ট। ইহার অর্থ কি? পুরুষগণ অধিক কাম-মোহিত; সুতরাং আদিরসের সহিত ইহার যোগ না করিলে, কোনও অর্থই উপলব্ধি করা সহজ নহে। বাগযন্ত্রের অবস্থা, ভাষার দিকেই লক্ষ্য করিতেছে। সুতরাং ভাষাও মূলতঃ কাম-বৃত্তি হইতেই উৎপন্ন, ইহা স্বীকার করিতে হয়। পুরুষগণের বাগযন্ত্রাদির পুষ্টি দেখিয়া এবং তাহাদিগের কণ্ঠস্বর অধিকতর প্রবল দেখিয়া, পণ্ডিতগণের মধ্যে উহার উপকারিতা সম্বন্ধে দুই মত উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সঙ্গীতে অথবা স্বরে অন্য প্রণয়ীকে পরাস্ত করিয়া স্ত্রীগণকে স্বীয় অনুগত করিবার চেষ্টা করাতেই, পুংগণের বাগযন্ত্রের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই বিবেচনা করেন, স্ত্রীগণকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা হইতেই পুরুষের বাগযন্ত্রের উন্নতি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই দুই মত একই। ফলতঃ কামকালীন উত্তেজনা হইতেই বিবিধ প্রকার ধ্বনি ও শব্দ এবং তাহা হইতে বাগযন্ত্রাদির পুষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এক্ষণে মস্তিষ্কের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে প্রথমেই দেখা আবশ্যক যে, কাম মূলতঃ দৈহিক উত্তেজনা; উহা ক্রমে ভাব-গত অর্থাৎ মস্তিষ্কের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে। মৎস্য কূর্ম্মাদি নিম্ন জীবের কেবল দৈহিক উত্তেজনাই কামের লক্ষণ দেখা যায়। কালক্রমে ঐ উত্তেজনা মস্তিষ্কের সহিত ভাব-রূপে জড়িত হয়। যখন উহার প্রশমনে উপকার অনুভব হয়, তখনই অনুরূপ চেষ্টা সুতরাং মস্তিষ্কের ক্রিয়া আরব্ধ হয়। প্রথমোক্ত কালে ভাষার ধ্বন্যাত্মক অবস্থা এবং শেষোক্ত কালে বর্ণাত্মক ভাষার উন্নতি কেবলই মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে। মানবীয় ভাষা অনেক নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণী উচ্চারণ করিতে ও অর্থগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এ সম্বন্ধে মানবের সহিত তাহাদিগের অধিক

(৩) পক্ষীয়া কেহ কেহ যন্ত্র-সঙ্গীতও ব্যবহার করে।

প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঐ সকল প্রাণী এ পর্য্যন্ত কোনও ভাষা গঠিত ও পরিপুষ্ট করিতে পারিল না। ইহার কারণ, মস্তিকের অনুন্নত অবস্থা। মানব-মস্তিকের উন্নতির যতই কারণ থাকুক, সেই সকলের মধ্যে মানবের দণ্ডায়মান অবস্থা একটী প্রধান কারণ। মানব দণ্ডায়মান হইবার পর মস্তিকের উন্নতি হওয়া যেমন সহজ হইয়াছে, তাহার শ্বাস-যন্ত্রেরও তেমনই পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। এতদুভয় ফল হইতেই মানবীয় ভাষার প্রচুর লাভ হইয়াছে। (৪) কিন্তু এ সকল পরের কথা। মানবীয় ভাষা আলোচনা করিতে হইলে, অন্য প্রাণীর বিষয় বিবেচনা করা অপেক্ষা, পক্ষিগণের প্রতি সবিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। কারণ, পক্ষিগণের সহিত এ বিষয়ে মানবের অনেক পরিমাণে সাদৃশ্য আছে। (৫) পক্ষিগণ কামকালে স্ত্রীগণকে মোহিত করিবার জন্যই নানারূপ সঙ্গীত উচ্চারণ করিয়া থাকে। (৬) এইরূপ সঙ্গীত করিতে করিতে তাহারা এত উত্তেজিত হয় যে, অবশেষে মরিয়া যায়। কামের উত্তেজনা ইহাদিগের মধ্যে প্রথমে সঙ্গীতেই ব্যক্ত হয়। মানবও সম্ভবতঃ স্ত্রী-গণের উদ্দেশেই প্রথম সঙ্গীত ব্যবহার করিয়াছিল। মানবীয় আদিম ভাষাও বোধ হয় সঙ্গীত। সে সঙ্গীত অবশ্যই অতি সরল ও সহজ ছিল। ক্রমে মানবের ভাবের উন্নতির সহিত সঙ্গীত বিশেষরূপে উন্নত হইয়াছে। কিন্তু উন্নত ভাষা যেমন উন্নত মস্তিকের ফল, তেমনই মস্তিকের উন্নতিও ভাষার উন্নতির উপর আংশিক রূপে নির্ভর করে। উন্নত ভাষা মস্তিকের উপর প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। (৭) এই অবস্থা মানবের সামাজিক উন্নতির পরবর্ত্তী। মানবের প্রাথমিক অবস্থায় ভাষার উন্নতি ছিল না। বর্ত্তমান প্রকার মানবীয় ভাষার আদৌ তখন অস্তিত্ব ছিল কি না, সে বিষয়েও কোনও কোনও পণ্ডিত সন্দেহ করিয়াছেন। (৮) সে যাহাই হউক, প্রাথমিক সময়ে

(৪) Haeckel-প্রমুখ পণ্ডিতগণ "connect the first beginning of human speech with a superiority in the command of the actions of respiration, which is involved in man's erect posture.—Ency. Brit, 9th Ed. vol, 8 p 770.

(৫) The sounds uttered by birds offer in several respects the nearest analogy to lauguage.—Descent of Man, p, 131.

(৬) Ibid p 133.

(৭) Ency. Brit. vol 20, p 75.

(৮) Some philologists have inferred that when man first became widely diffused, he was not a speaking animal.—Descent of Man p, 279. কিন্তু ডারুইন এই মত স্বীকার করেন নাই। প্রাচীন যুগের Palaeolithic মানবের কথা আলোচনা করিতে ডাক্তার সোলাস বলিয়াছেন যে, তাহাদিগের বাক্‌শক্তিই পূর্ণরূপে পুষ্ট হইয়াছিল না। vide p 525, Science Progress, Jan 11, 1909.

মানবীয় ভাষাও যে অতীব অনুন্নত ছিল, উহা যে প্রধানতঃ সাঙ্কেতিক চিহ্ন অথবা হর্ষ বিষাদ ক্রোধাদি ভাবব্যঞ্জক ধ্বনিমাত্র ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। (৯) মানবায় ভাষা এক্ষণে এত পৃথক যে, একজাতি অন্য জাতির ভাষা শিক্ষা না করিলে বুঝিতে পারে না। কিন্তু সাঙ্কেতিক চিহ্ন সর্ব্বজাতির মধ্যে একই, অথবা প্রায় এক। হর্ষ বিষাদ ক্রোধাদিরও বাহ্য লক্ষণ এক।

এই সকলের দ্বারা এক জাতি অপরের ভাষা না বুঝিলেও, কোনরূপে অনেক পরিমাণে তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়। সমগ্র মানবজাতি এই উপায়ে পরস্পরের সহিত ভাববিনিময় করিতে অনেকাংশে সমর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং এ উপায় যে মৌলিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক সময় এতদধিক সম্বল মানবের ছিল বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন না। এমন কি, মানব প্রথম অবস্থায় বর্ণাত্মক ভাষা ব্যবহার করিত কি না, সে বিষয়েও কেহ কেহ সন্দেহ করিতেছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখনও মানব-শিশু মানবসমাজে প্রতিপালিত না হইলে বর্ণাত্মক ভাষা ব্যবহার করে না। (১০) যাহা হউক, সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও হর্ষ বিষাদ ক্রোধাদিজনিত ধ্বনি সমগ্র মানবের ভাব-বিনিময়ের আদিম উপায় বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। ঐ সমস্ত ভাব কাম হইতে জাত, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সুতরাং এদিক দিয়া বিবেচনা করিলেও, ভাষার আদিম ইতিহাস সেই এক দিকেই লক্ষ্য করিতেছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অমেরুগণের (১১) কামভাব নাই। কথাটা

---

(৯) Communication by gesture-signs betweens persons unable to converse in vocal language is an effective system of expression common to all mankind * * To these gestures let there be added the use of the interjectional cries * * The total result of this combination of gesture and significant sound will be * * naturally intelligible to all mankind —Ency· Brit· vol 2, p 117·

(১০) কয়েক বৎসর হইল, জলপাইগুড়ীর নিকট এক জঙ্গলে একটি মানবশিশু পাওয়া গিয়াছিল। ঐ শিশুকে একটি বাঘিনী প্রতিপালন করিয়াছিল। সে কথা কহিতে পারিত না; বাঘের মত শব্দ করিত। সিভিলসার্জ্জন ডাক্তার র‍্যাপ্‌ তাহাকে দুই চারিটি কথা কহিতে শিখাইয়াছিলেন। তৎকালে কোনও সংবাদপত্রে এইরূপ পড়িয়াছিলাম, মনে হইতেছে।

(১১) মেরুদণ্ডহীন প্রাণী।

মোটের উপর সত্য; কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে। ঊর্ণনাভ ও পতঙ্গশ্রেণী সকাম; ইহাদিগের কামের ভাব আছে। এ স্থলে বোধ হয় উপরি-উক্ত কথার ব্যভিচার দেখা যাইতেছে। তাহা হইলেও, ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদিগের মত খণ্ডিত হইতেছে না। কতিপয় পতঙ্গ কামভাব অনুভব করে; কিন্তু ঠিক তাহারাই ধ্বন্যাত্মক ভাষাও উৎপন্ন করে। কেহ বা দেহের পূর্ব্বাংশ পশ্চাৎভাগের সহিত, কেহ বা পদাগ্রভাগ দেহের সহিত ঘর্ষণ করিয়া ধ্বনির উৎপাদন করে। দেখা যায় যে, এ স্থলেও পুংজাতীয়গণই এই কার্য্য অধিক করিয়া থাকে; এবং তাহাদিগের ধ্বনিই বিশেষ উচ্চ ও সবল। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও আমাদিগের মতই প্রতিপন্ন হইতেছে।

এক্ষণে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, ভাষা প্রথমতঃ দেহজ উত্তেজনা হইতে জাত হইয়া, পরে ভাব-গত হইয়াছে। তখন হইতেই মস্তিষ্কের উন্নতির সহিত ইহার উন্নতি জড়িত রহিয়াছে। বুদ্ধিবিকাশের ইতিহাস ও ভাষাবিকাশের ইতিহাস একই সূত্রে গ্রথিত। কিন্তু মানব মস্তিষ্কের সকল অংশের সহিত ভাষার সম্বন্ধ নাই। মস্তিষ্ক-পিণ্ড নানা অংশে নানা বৃত্তির আধার। কোনও কোনও পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, মস্তিষ্কপিণ্ডের বামার্দ্ধের পশ্চাৎভাগস্থ তৃতীয় খণ্ডের সহিত (১২) ভাষার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কেহ বা উহার সম্মুখভাগের সহিত ভাষার সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। য়্যাফেশিয়া নামক স্নায়বিক পীড়ায় যেমন মস্তিষ্কের উপরি উক্ত অংশ বিশেষ বিকৃত হয়, তেমনই কথা কহিবারও বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। আমি শুনিয়াছি যে, ইহা এক প্রকার বাত-ব্যাধি। ঐ পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি শব্দ উচ্চারণ করিতে সক্ষম হয় না। কেহ বা অতি কষ্টে শব্দের কোনও অংশ উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহাও বিকৃত রূপে। কেহ বা পারিলেও অন্যের স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক হয়। যাহা হউক, ভাষার মূল ধ্বনি; উহা প্রথমতঃ দেহজ উত্তেজনার ফল; শেষে মস্তিষ্কের উন্নতির সহিত উন্নত হইয়াছে। এ সকল কথা অস্বীকার করা যায় না। প্রাকৃতিক শব্দানুকরণ এক সময় ইহার পুষ্টির সহায়তা করিয়াছে। ধাতু সকলের অধিকাংশ ঐ উত্তেজনাপ্রসূত তীব্র ক্ষুদ্র ধ্বনি মাত্র; অবশিষ্টাংশ সম্ভবতঃ ধ্বনি-যোজনার ফল। এই ভাবে ভাষার উৎপত্তি চিন্তা করিলে, নিম্নপ্রাণী হইতে মানব পর্য্যন্ত সকলকেই এক ভাবে দেখা যাইতে পারে। ইহাই বিজ্ঞানসম্মত।

(১২) Posterior third of the third or inferior left frontal convolution.

কারণ, বহুত্বের মধ্যে একত্ব অনুভব করাই বিজ্ঞানের প্রধান কার্য্য। ভাষা নিম্নপ্রাণীদিগের ধ্বনি হইতে ক্রম-বিকাশের নিয়মানুসারে বিবর্দ্ধিত হইয়াছে; এই মতের সহিত বিবর্ত্তন-বাদের সামঞ্জস্য আছে। এই মতে ভাষাকে মূলতঃ কামজ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই মত অভিনব হইলেও আলোচনার যোগ্য। যাহা দেহ-যন্ত্র হইতে উচ্চারিত, এবং মনের ভাব ব্যক্ত করে, তাহা জীব-বিজ্ঞানের অধীন; এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভাষা প্রথমতঃ ধ্বন্যাত্মক, পরে বর্ণাত্মক। জীব-রাজ্যে কামের উত্তেজনার সহিত ধ্বনির আবির্ভাব কিরূপ ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ-যুক্ত, তাহা ইতিপূর্ব্বে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যে ধ্বনি প্রথমতঃ দৈহিক উত্তেজনার ফল, তাহাই ক্রমে ভাব-গত হইয়া কিরূপে বর্ণাত্মক ভাষায় পরিণত হইতে পারে, তাহাও ইঙ্গিত করিয়াছি। কিন্তু মানবীয় ভাষা মানব মস্তিষ্কের বিবর্ত্তনের সহিত ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে। মস্তিষ্কই ভাবের ভাণ্ডার; আর ভাবই মানবীয় ভাষার গৌরব। সুতরাং এক্ষণে মস্তিষ্ক পদার্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা আবশ্যক। কিন্তু তদগ্রে শিশুগণ কিরূপে ক্রমে কথা কহিতে ও অর্থ বোধ করিতে শিক্ষা করে, তাহা অবগত হইবার চেষ্টা করা সঙ্গত। কারণ শিশুর ব্যবহার দৃষ্টে মানব-জাতিরও প্রাথমিক অবস্থার অনেক আভাস পাওয়া যায়।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর আপনা হইতে ক্রন্দন করে। ইহা শারীরিক ক্রিয়ার ফল। মাতৃগর্ভে মাতার রক্তে তাহার দেহের পোষণ হইত; কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পর ঐ পোষণ-ক্রিয়ার অভাববশতঃ দৈহিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তাহাতেই ক্রন্দন করে। আবার সেই অভাব পূর্ণ হইলেই ক্রন্দনও মিটিয়া যায়। এই ক্রন্দন কেবল অব্যক্ত ধ্বনি মাত্র। ইহা দৈহিক পরিবর্ত্তনের ফল। মানব শিশুর যদি ভূমিষ্ঠ হইবার পরই কাম-ভাব থাকিত, তবে ঐ ধ্বনিকে কামজ দৈহিক পরিবর্ত্তনের ফল বলিতাম। কিন্তু তাহা না থাকিলেও, এই দৃষ্টান্ত হইতে দৈহিক উত্তেজনার ফলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহা বুঝা যাইতে পারে। এই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া মাতা স্তন্য দান করেন; তাহাতে শিশুর অভাব পূর্ণ হয়। সেও পরিতৃপ্ত হয়। ক্রমে এই ভাব তাহার মস্তিষ্কে এরূপ ভাবে জড়িত হয় যে, সে মাতার অবয়ব দেখিলেই আনন্দিত হয়। যাহা প্রথমে দৈহিক পরিবর্ত্তনের ফলে আরম্ভ হইয়াছিল,

তাহা এইরূপে ভাব-গত হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে শিশু নানাবিধ মানবীয় শব্দ শুনিতে আরম্ভ করে। তখন তাহার অর্থবোধ নাই; কেবল ঐ শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া মস্তিকের স্থানবিশেষকে * উত্তেজিত করে, এইমাত্র। তথায় উহা যেন অঙ্কিত হইয়া যায়। শিশু তখন উহা উচ্চারণ করিতে পারে না। উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে সে কেবল শুনিতে থাকে। পরে ঐ শব্দ উচ্চারণ করিতে মুখ-গহ্বর ও ওষ্ঠের যেরূপ ভঙ্গী হয়, তাহা অবলোকন করিতে থাকে। উচ্চারকের মুখভঙ্গী দর্শনেন্দ্রিয়ের যোগে মস্তিকের স্থানবিশেষকে † উত্তেজিত করে, এবং তথায় অঙ্কিত হইয়া যায়। প্রথমে কর্ণ শ্রবণ করে, পরে চক্ষু দর্শন করে। এই দুই উপায়ে শিশুর মস্তিকে শব্দের ও তাহার উচ্চারণ-কৌশলের একটা চিত্র পড়িয়া যায়। সে পুনঃ পুনঃ তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে, এবং বহুবার অকৃত-কার্য্য হইয়া পরে যথাযথ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। মস্তিকের যে দুইটি স্থানের কথা বলিলাম,

উহারা সূক্ষ্ম শিরাতন্তুযোগে শীঘ্রই সংযুক্ত ‡ হয়; এবং পরস্পরের কার্য্যে সহায়তা করে। তখন কর্ণ ধ্বনি শুনিবামাত্রই, চক্ষু মুখভঙ্গী সকল মস্তিকে লইয়া যায়। তাহাতেই শিশু ঐ শব্দ-উচ্চারণের চেষ্টা করিয়া ক্রমে কৃতকার্য্য হয়।

পার্শ্বে যে চিত্রটি প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা মস্তকের বাম ভাগের চিত্র। উহার মধ্যে মস্তিক্কের বামার্দ্ধ দেখা যাইতেছে। কারণ প্রায় § সকল লোকেরই ভাষা-উচ্চারণের মূল মস্তিকের বামার্দ্ধেই নিহিত আছে। সেই জন্য বাম ভাগই চিত্রিত হইয়াছে। উহার মধ্যে 'শ' চিহ্নিত স্থানকে শব্দ-কেন্দ্র এবং 'ভ' চিহ্নিত স্থানকে ভঙ্গী-কেন্দ্র বলা যাইবে। কর্ণেন্দ্রিয়ের যোগে শব্দ মস্তিকে নীত হইয়া শব্দ-কেন্দ্রকে উত্তেজিত করে; চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যোগে

---

* Auditory word-centre—শব্দ-কেন্দ্র।

† Glosso-Kinæsthetic word centre—ভঙ্গী-কেন্দ্র।

‡ যাহারা মূক-বধির, তাহাদিগের মস্তিকের ঐ দুই স্থান উত্তেজিত হইতে পারে না; তাহারা কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের যোগে মুখভঙ্গী দর্শন করে; তাহাতে তাহাদিগের মস্তিষ্কের এক স্থানমাত্র উত্তেজিত হয়। সুতরাং তাহারা মুখভঙ্গীর অনুকরণেই উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করে। ইহাদিগের শুধু Glosso-Kinæsthetic centre উত্তেজিত হয়।

§ যাহাদিগের বাম হস্ত বেশী সবল (left-handed), তাহারা ব্যতীত অন্য সকলেই।

উচ্চারণের মুখ-ভঙ্গী সকল ভঙ্গী-কেন্দ্র নীত হইয়া তাহাকে উত্তেজিত করে।(১) এই দুই উত্তেজনার সমবেত প্রতিক্রিয়াবশত শিশু শ্রুত-শব্দ উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে, এবং অবশেষে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। মস্তিষ্ক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আধার। চিত্রের 'শ' ও 'ভ' স্থান উচ্চারিত শব্দের মূল। 'বু' চিহ্নিত স্থান বুদ্ধিবৃত্তির মূল। 'শ' ও 'ভ' বামকর্ণের উপরে একটু পশ্চাৎ দিক্ হইতে সম্মুখের দিকে যে স্থান, তাহারই নীচে মস্তিষ্ক মধ্যে নিহিত আছে। আর 'বু' ইহাদিগের সম্মুখে ও ঊর্দ্ধে একটু কপালের দিকে অবস্থিত। 'শ' ও 'ভ' 'বু'র সহিত সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা শীঘ্রই যুক্ত হইয়া যায়। বুদ্ধি-কেন্দ্রের উন্নতিবশতই মানব ভাষার এত উন্নতি করিয়াছে। এই কেন্দ্রের অনুন্নত অবস্থার ফলে ইতর জীবগণ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিলেও, ভাষার উন্নতি করিতে পারে নাই; এবং মানবীয় শব্দের অনুকরণ করিতে পারিলেও ভালরূপ বুঝিতে সক্ষম হয় না। শিশুর বুদ্ধি-কেন্দ্র যত দিন শব্দ-কেন্দ্রের ও ভঙ্গী-কেন্দ্রের সহিত সম্পূর্ণরূপে যুক্ত না হয়, এবং বুদ্ধি-কেন্দ্র যত দিন অনুন্নত থাকে, তত দিন সে কেবল শব্দ উচ্চারণ করে মাত্র; কিন্তু অর্থ-বোধ করিতে সমর্থ হয় না। দা-দা-দা-দা বলিতেছে; কিন্তু কাহাকেও লক্ষ্য করিতেছে না; অথবা সকলকেই দা-দা বলিতেছে। প্রকৃত দাদাকে, ক্রমে ঐ শব্দের সহিত অন্বয় যোগ করিতে শিক্ষা করিলে পর, চিনিতে পারে; তৎপূর্ব্বে পারে না।

যাহার শব্দ-কেন্দ্র ও বুদ্ধি কেন্দ্র পরিস্ফুট, কিন্তু ভঙ্গী-কেন্দ্র উত্তমরূপে উত্তেজিত হয় না, সে শব্দ শুনিতে ও বুঝিতে পারে, কিন্তু ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে না। আর যাহার ভঙ্গী-কেন্দ্র ও বুদ্ধি-কেন্দ্র কর্ম্মক্ষম, কিন্তু শব্দ-কেন্দ্র ভালরূপ কর্ম্মক্ষম নহে, সে বুঝিবার ও উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, শব্দ স্মরণ করিতে পারে না। কেহ স্মরণ করাইয়া দিলে, অর্থাৎ তাহার নিকট শব্দ বলিলে, সে বুঝিতে ও উচ্চারণ করিতে পারে। এই সকল

---

(১) An auditory word-centre where the sounds of words are registered * * * A glosso-kinaesthetic word centre where the combined impressions which pass to the brain as a result of the movements of the lips, tongue, palate, larynx and other parts concerned with ariculate speech are registered—A system of medicine, edited by T.C. Allobut vol, 7, p. 395.

আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, ভাষা একটা গোটা জিনিস নহে; উহা পূর্ণ প্রস্তুত আকারে মানব প্রাপ্ত হয় নাই। উহা ক্রমে খণ্ডশঃ উদ্ভূত হইয়াছে। মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন স্থান সকল ক্রমে আবশ্যক পরিমাণে বিবর্দ্ধিত ও উন্নত হইয়া উত্তেজনা বহন করিবার ও অঙ্কিত করিয়া রাখিবার উপযোগী হইয়াছে; তাহাতেই ভাষারও ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সকল ক্রমে মানবের আয়ত্ত হইয়াছে। এবং তাহাদিগকে বুদ্ধিবলে পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া পূর্ণাবয়ব ভাষা গঠিত করিয়াছে। * প্রথম হইতেই শ্রবণেন্দ্রিয় একরূপ কার্য্য করিয়াছে; দর্শনেন্দ্রিয় অন্যরূপ কার্য্য করিয়াছে। তাহাতে মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন ভাষাও খণ্ডশঃ উচ্চারিত হইয়াছে। বালকের ন্যায় অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত হইয়াছে। পরে বুদ্ধিকেন্দ্রের উন্নতি হেতু ধ্বনির সহিত বস্তুর সংযোগ করিতে শিক্ষা করিয়াছে। এইরূপে প্রাথমিক ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাতে বস্তুনির্দ্দেশক নামই (বিশেষ্য সংজ্ঞা) অধিক। ক্রমে উচ্চারিত ভাষা ও ভাবের উপর প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে। যেমন ভাববশতঃ ভাষার উন্নতি, তেমনই ভাষাও ভাবকে উন্নত করিয়াছে। তখন ক্রমে ক্রিয়াপদ ইত্যাদিও ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, সর্ব্বনাম, বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদি—সকলই বস্তুনির্দ্দেশক বিশেষ্য পদ হইতে জাত, ইহা ভাষাবিদ্‌গণ এক্ষণে একরূপ প্রতিপন্নই করিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে,—(১) ভাষা খণ্ডশঃ গঠিত উচ্চারিত হইয়াছে। (২) তাহার মূল মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশে নিহিত। প্রধানতঃ শব্দ-কেন্দ্র, ভঙ্গী-কেন্দ্র ও বুদ্ধি-কেন্দ্রের উত্তেজনার সমষ্টি-ফলে উচ্চারিত ভাষা গঠিত হইয়াছে।

কিন্তু এই উত্তেজনা বাহ্য জগতের উত্তেজনা হইতে পারে না। অমেরু জীবগণের মধ্যে পতঙ্গ-শ্রেণীতে এবং সমেরু জীবগণের মধ্যে মৎস্য-শ্রেণীতে ধ্বন্যাত্মক ভাষার প্রথম আবির্ভাব। ইহারা উভয়েই কামমুগ্ধ; তাহাতে ইহাদিগের দৈহিক উত্তেজনা হইবেই। কিন্তু প্রাকৃতিক শব্দ,—যেমন বায়ুর শ্বসন, মেঘের গর্জ্জন, গিরিশৃঙ্গের পতন, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দ,—ইত্যাদি ধ্বনি ঐ নিম্ন জীবদ্বয় শুনিতে পারিলেও, উহার অনুকরণে ধ্বনির উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের † যোগে উহাদিগের মস্তিষ্ক অথবা মস্তিষ্কবৎ

* এস্থলে বাকুযন্ত্রের কথা বলিলাম না।
† কর্ণ বলিতেছি না। কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণেন্দ্রিয় থাকিতে পারে।

স্নায়ুগণ্ড (Ganglion) উত্তেজিত হইতে পারে ; তাহাতে ক্রমে শব্দ-কেন্দ্র জাত হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু ঐ সকল ধ্বনি মুখ-নিঃসৃত না হওয়ায়, উহাদিগের উচ্চারণ-ভঙ্গীর পর্য্যবেক্ষণ ও তাহার অনুকরণ করা অসম্ভব। সুতরাং ভঙ্গী-কেন্দ্র উদ্ভূত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত উহাদিগের উত্তেজনায় ধ্বন্যাত্মক ভাষাও গঠিত হওয়া সম্ভব নহে। তবে কোন্ উত্তেজনায় ঐ কেন্দ্রদ্বয় যুগপৎ উত্তেজিত হইবে? যদি বাহ্য জগতের ধ্বনির উত্তেজনায় না হইল, তবে স্বীয় দৈহিক উত্তেজনা ভিন্ন আর অন্য কোনও কারণ অনুমিত হইতে পারে না। নিজের দৈহিক * উত্তেজনার ফলে যে অব্যক্ত ধ্বনি উচ্চারিত হইত, তাহাই ঐ অনুন্নত প্রাণিগণের মস্তিষ্কে অঙ্কিত হইয়া, ক্রমে শব্দ-কেন্দ্র গঠিত করিয়াছিল। আর ঐ শব্দ অজ্ঞাত-ভাবে উচ্চারিত হইলে পর, কালক্রমে উহা ভাব-গত হইলে, তৎপ্রতি ঐ অনুন্নত জীবগণেরও মনোযোগ পড়িয়াছিল। কারণ, ঐ ধ্বনি দ্বারা তাহাদিগের দৈহিক উপদ্রব নিবারিত হইয়া, অথবা অপর ব্যক্তিকে আহ্বান করিবার কৌশলরূপে ব্যবহৃত হইয়া, উহা তাহাদিগের উপকারে আসিয়াছে। যখন হইতে ঐ ধ্বনির উপর তাহাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে, তখন হইতে উহার উচ্চারণের কৌশল, অর্থাৎ দেহভঙ্গী অথবা মুখভঙ্গী পরিলক্ষিত হইবে; আর তখন হইতেই ভঙ্গী-কেন্দ্র উদ্ভূত হইবারও সূত্রপাত হইবে। এইরূপে দৈহিক উত্তেজনা ও স্বানুকরণ হইতেই ধ্বনির প্রথম আবির্ভাব হওয়া একান্ত সম্ভব। কিন্তু এ উত্তেজনা ঐ সকল অনুন্নত জীবের পক্ষে দ্বিবিধ ; উহাদিগের প্রাথমিক অবস্থায় আর কোনও ভাবই নাই, কেবল ক্ষুধা ও কাম। ক্ষুধা তখন অপর ব্যক্তির অপেক্ষা করিত না। উহা নিজের চেষ্টাতেই প্রশমিত করিতে হইত। সুতরাং উহার জন্য ভাব-বিনিময়ের আবশ্যক হয় না। সুতরাং ভাষাও উহার নিকট ঋণী নহে। কাম বৃত্তিই পরাপেক্ষী। এই বৃত্তির উত্তেজনাতেই ক্রমে অপরের সহিত ভাব-বিনিময় আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই বৃত্তির ফলেই দৈহিক উত্তেজনা ; তাহার ফলে ধ্বন্যাত্মক ভাষা ; তাহার উপকারিতা অনুভব করাতেই ক্রমে উহা ভাব-গত হইয়াছে। ঐ ধ্বনি হইতেই শব্দ-কেন্দ্র এবং উহার অনুকরণেই ভঙ্গী-কেন্দ্র গঠিত হইয়াছে। তৎপরে বুদ্ধি-কেন্দ্রের বিকাশ হইলে, তিনের সাহায্যে ধ্বন্যাত্মক ভাষা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর

* কামজ।

হইয়া অবশেষে এই অতীব গৌরবান্বিত বর্ণাত্মক ভাষা গঠিত হইয়াছে। ভাষার অগ্রে ধ্বনি, উহা কামজ দৈহিক উত্তেজনার ফল—এ সিদ্ধান্ত এইরূপে অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ হউক, ভাষার উৎপত্তির আলোচনা করিতে হইলে, জীব-বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করাই একমাত্র পথ। এ পর্য্যন্ত এই পথ অধিক অবলম্বিত হয় নাই। কিন্তু এই পথ ভিন্ন অন্য কোনও প্রকৃষ্ট পথে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতেই পারে না, ইহা সহজেই বুঝা যায়। যাহা দেহ-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ও মনের ভাব ব্যক্ত করে, তাহা জীব-বিজ্ঞানেরই অন্তর্গত। জীবের ক্রমোন্নতির সহিত তাহার উন্নতি এক সূত্রে জড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহই নাই।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সাধারণতঃ যে সকল জীবের কাম-ভাব নাই, তাহারা মূক; এবং যে সকল জীবের কাম-ভাব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা শব্দায়মান। নিম্ন প্রাণিগণের মধ্যে অনেকেই কেবল কাম-কালে মুখর, অন্য সময়ে নহে। কামজ দৈহিক উত্তেজনা হইতেই প্রথমে ধ্বনি উৎপন্ন হইয়াছে, পরে উহার উপকারিতা অনুভূত হইলে মস্তিষ্কের উন্নতি সহ উহা ক্রমে ভাষায় পরিণত হইয়াছে। ভাষার বিকাশের নিমিত্ত মস্তিষ্কে অন্ততঃ তিনটি স্নায়ু-কেন্দ্রের উৎপত্তি আবশ্যক হইয়াছিল;—শব্দ-কেন্দ্র, ভঙ্গী-কেন্দ্র ও বুদ্ধি-কেন্দ্র। শব্দ-কেন্দ্র ও ভঙ্গী-কেন্দ্রের সাহায্যে ভাষা উৎপন্ন হইয়া বুদ্ধি-কেন্দ্রের সাহায্যে উহা উন্নত হইয়াছে। বুদ্ধির উন্নতির সহ ভাষার উন্নতি জড়িত। শিশুরও যেমন, মানবজাতিরও তেমনই,—বুদ্ধির যতই উন্নতি হইয়াছে, ভাষারও ততই উন্নতি হইয়াছে। উচ্চারণের সমস্ত যন্ত্র থাকিতেও নিম্নপ্রাণিগণ কেবল বুদ্ধিহীনতাবশতঃই ভাষার উন্নতি করিতে সক্ষম হয় নাই।

কিন্তু মানবীয় ভাষা বংশপরম্পরাগত বৃত্তি নহে। পশু, পক্ষিগণ স্বভাবতঃই স্বীয় ভাষা উচ্চারণ করে। যদিও সঙ্গীতের ভাষা তাহারাও মাতার নিকট শিক্ষা করে, তথাপি কেহ শিক্ষা না দিলেও, গৃহপালিত সঙ্গীহীন পক্ষী আপনা হইতেই স্বীয় জাতীয় শব্দ উচ্চারণ করে। কামজ উত্তেজনা ও বংশপরম্পরাগত কামিক নির্ব্বাচন (sexual selection) প্রভাবে উহা তাহার জীবনের একাংশরূপে পরিণত হইয়াছে।* কিন্তু মানব শিশুর

* The bird speaks, even when untaught, the language of its species, Sexual Selection, as we may suppose, has made this language, an essential part of its being.

Wiesmann on Heredity vol. II. p. 49—50.

তদ্রূপ নহে। একা একটিমাত্র মানবশিশু এক স্থানে থাকিলে মানবীয় ভাষা উচ্চারণ করিতে শিখিবে না। সে মানবসমাজে প্রতিপালিত হয় বলিয়াই মানবীয় ভাষা শিক্ষা করে। এক জাতীয় মানব-শিশু অন্যজাতীয় মানবসমাজে বাস করিলে, অনায়াসে শেষোক্তের ভাষাই শিক্ষা করে। জাপানী বালক বাঙ্গালী-সমাজে পালিত হইলে বাঙ্গালাই শিখিবে। এই সকল হইতেই বুঝা যায় যে, মানবীয় ভাষা বংশগত নহে। উহা আপনা হইতে প্রস্ফুটিত হয় না। উহা অন্য বিদ্যার ন্যায় † চেষ্টা দ্বারা শিক্ষা করিতে হয়। উহা বুদ্ধি সাপেক্ষ। বুদ্ধি যেন বিভিন্ন জাতির মানবের (Race) বিভিন্ন ভাবে গঠিত হইয়াছে; এক এক জাতির ভাব, চিন্তা, আশা, আকাঙ্ক্ষা যেন এক এক স্বতন্ত্র ভাবে বিকশিত হইয়াছে। তাই মানবীয় ভাষাও পৃথক পৃথক। পশু পক্ষিগণেরও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভাষার কিছু কিছু ইতর-বিশেষ আছে; ইহা এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে। মানবীয় ভাষা সহজ-বৃত্তি নহে, উহা শিক্ষালব্ধ। কিন্তু যে শিশু শিক্ষা করিবে, তাহার শিক্ষণীয়তা না থাকিলে শিখিতে পারে না। এই শিক্ষণীয়তা তাহার মস্তিষ্কের ও বাক্‌যন্ত্রের অবস্থারই নামান্তরমাত্র। বাক্‌যন্ত্রের কি মস্তিষ্কের কোনও অংশে অনুপ-যোগীতা থাকিলে, শিক্ষার সেই পরিমাণ বিঘ্ন হয়। এতদুভয়ের উপ-যোগিতা বংশপরম্পরাগত হয়। উপযোগিতা ও শিক্ষণীয়তা,—ইহারা বংশাগত ধর্ম্ম; অবশিষ্ট সকলই চেষ্টালব্ধ। যাহা বংশগত ধর্ম্ম, তাহা মানব অতি প্রাথমিক জীবগণ হইতে বিবর্ত্তন-প্রভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে। জীবরাজ্যে যখনই প্রথমে ধ্বনির উদয় হইয়াছে, সেই হইতে ক্রমে বংশপরম্পরাগত নিয়মানুসারে মানব ভাষার অধিকারী হইয়াছে। নিম্ন প্রাণিগণের কামজ উত্তেজনাই ধ্বন্যাত্মক ভাষার মূল ছিল; ইহার চরম উৎকর্ষ বিহঙ্গ-সঙ্গীত। আর মানবের ভাষা বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহার চরম উৎকর্ষ বুদ্ধির উৎ-কর্ষের সহিত জড়িত।

আদিকাল হইতে ধ্বনি, শব্দ ও ভাষার ইতিহাস এইরূপেই গঠিত

---

† His (man's) language does not exist as a perfected faculty * * But only as a possible expression of it, which only becomes actual when the individual preserves communication with those who preceded him. Viz. when he is taught to speak. Hence it is that every human child can learn any language; hence it is that there is not one single human language, but hundreds of them. Wiesmann on Heredity. vol. II. 150.

হইয়াছে। দেহ হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধিতে ভাষা ক্রমে বিবর্ত্তিত হইতেছে। দৈহিক উত্তেজনা * হইতে ধ্বনির উৎপত্তি হইয়াছে। তৎপরে তাহার উপকারিতা উপলব্ধি হইলেই তাহা ভাবগত হইয়াছে। তখন মনের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। পরে ক্রমে বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইয়া ভাষা এক্ষণে বহু পল্লবিত হইয়াছে। ভাষার প্রথম অবস্থা কামজ ধ্বনি; দ্বিতীয় অবস্থা সঙ্গীত—ধ্বন্যাত্মক সঙ্গীত; ভাষার তৃতীয় অবস্থা বর্ণাত্মক; সুতরাং এ অবস্থায় সঙ্গীতও তাহাই। দ্বিতীয় অবস্থার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ পক্ষীতে; আর তৃতীয় অবস্থার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ মানবে। সঙ্গীত মানবীয় ভাষার আদি ও শেষ বিবর্ত্তন। এই ভাবে ভাষার ইতিহাসের আলোচনা করিলে সমস্ত জীবজগৎ এক অপূর্ব্ব নিকট সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া যায়। ভাষাও বিবর্ত্তনবাদের অঙ্গীভূত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সন্দেহ নাই।

---

* কামজ।

পরিশিষ্ট।

মূল প্রবন্ধে ভাষার উৎপত্তি সংশ্লেষণ-প্রণালীতে (synthesis) আলোচনা করা হইয়াছে। ভাষার আরম্ভ আদিরস হইতে কিরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, এবং তৎপরে বাক্‌যন্ত্রাদি কিরূপে উহা হইতে বিকশিত হইতে পারে, তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয় বিশ্লেষণ-প্রণালীতেও (analytical) আলোচনা করা যায়। ক্রমবিবর্ত্তনের নিয়ম সকল অনুসরণ করিয়া দেখা যাউক, আমরা আদিরস, ভাষাবৃত্তি ও বাক্‌যন্ত্রাদির পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে সক্ষম হই কি না। ক্রমবিবর্ত্তনের নিয়ম এ প্রসঙ্গে এইরূপ বলা যাইতে পারে।

প্রকৃতির নিয়মই এই যে, একশ্রেণীস্থ জীবের মধ্যেও ব্যক্তিগত অল্পাধিক প্রভেদ হইতেছে। আমরা একদল কুক্কুট পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে, উহাদিগের পক্ষের বর্ণবৈচিত্র্য অগণ্য। এই বিচিত্রতার অবশ্যই পৃথক পৃথক প্রবর্ত্তক কারণ আছে। যদি একই কারণ, একই ভাবে একাধিক কুক্কুটের বংশপরম্পরার উপর ক্রিয়া করে, তবে উহারা সকলেই সম্ভবতঃ একই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইবে। আমরা ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনের কারণ এখনও সম্যক অবগত নহি। ডারুইন তদীয় "Origin of Species" নামক গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমাংশে বলিতেছেন,—"আমি এতক্ষণ জীবশ্রেণীর অল্পাধিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে এরূপ ভাবে বলিতেছিলাম, যেন উহা যদৃচ্ছাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ উহা তাহা নহে। ঐরূপ বলায় প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনের প্রকৃত কারণ বিষয়ে আমাদিগের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।" মূল প্রবন্ধে এই কারণ সকলের অবোধ্যতা একরূপ স্বীকার করিয়াও ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, ভাষার আদিকারণ সম্ভবতঃ আদিরস।

যদিও জৈবিক পরিবর্ত্তনের কারণ সকল সম্যক বোধগম্য করা দুরূহ, তথাপি জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ পরিবর্ত্তন সকলের কতিপয় নিয়ামক কারণ প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নিয়ামক কারণ সকলের মধ্যে নির্ব্বাচনই সর্ব্বপ্রধান, এবং তাহা এইরূপ।—জীবশ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে, তাহা যে কারণবশতঃই হউক, যত ক্ষুদ্রই

হউক, যদি ঐ জীবগণের উপকারী হয়, তবে তাহা কালসহকারে স্থায়িত্ব লাভ করিবে, এবং ঐ সকল শ্রেণী মধ্যে উহা বিস্তৃত হইবার একরূপ প্রবণতা লাভ করিবে। পক্ষান্তরে যে সকল পরিবর্ত্তন উহাদিগের উপকারে অথবা অপকারে আসে না, তাহার উপর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবিধির কোনও আধিপত্যই নাই ; ঐ সকল পরিবর্ত্তন অনির্দ্দিষ্টরূপে ঐ জীবশ্রেণীতে কোথাও অল্প, কোথাও অধিক ভাবে প্রকাশ পাইবে। আর যে সকল পরিবর্ত্তন এই জীবগণের অপকারী, তাহা ক্রমে প্রত্যাহৃত হইবে। কারণ, তাহার ফলে সেই সকল জীব বিনষ্ট হইবে। জীবন-সংগ্রাম ত্রিবিধ। (১) আহার্য্য ও অন্যান্য জীবগণের আবশ্যকীয় উপকরণের নিমিত্ত অপর জীবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ; (২) জল বায়ু ও শত্রু প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া ; (৩) বংশবৃদ্ধির সুবিধা ও অসুবিধা। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবিধি গণনার মধ্যে না আনিলেও, জৈবিক পরিবর্ত্তনের অন্যান্য অনেক অবান্তর নিয়ম আছে। যথা :—একত্র-পরিবর্ত্তনবিধি (correlated variation। ডারউইন্ "origin of species" নামক গ্রন্থে একত্র পরিবর্ত্তনবিধির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মানব ও মানবেতর জীবগণের মধ্যে দেখা যায় যে, দেহের এক যন্ত্র কি একাংশ পরিবর্ত্তিত হইলে, কোন অপরাংশও সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আমরা অনেক সময়ে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হই। ঐ একাংশ অপর অংশকে নিয়মিত করে, কি ঐ উভয় অংশের পরিবর্ত্তনই অপর কোনও কারণের প্রতি নির্ভর করে, তাহা বলা যায় না। সমধর্ম্মাক্রান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল একত্র ও সমভাবে পরিবর্ত্তনের দিকে বিশেষরূপে অগ্রসর হয় ; যেমন দেহের বাম ও দক্ষিণ ভাগদ্বয়, অথবা হস্ত ও পদদ্বয়। মেকেল্ বহু দিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, হস্তের পেশী সকল যদি সাধারণ পদ্ধতি হইতে পৃথকভাবাপন্ন হয়, তবে তাহারা পদের পেশীর আকার ধারণ ও অনুকরণ করিতে উদ্যত হয় ; পক্ষান্তরে পদের পেশী যদি সাধারণ নিয়ম হইতে স্খলিত হয়, তাহা হইলে উহা হস্তের পেশীর অনুকরণ করে। চক্ষু ও কর্ণ, দন্ত ও কেশ, কেশের এবং দেহের বর্ণ, দেহের বর্ণ এবং ধাতু,—ইহারা অল্পাধিক একত্রপরিবর্ত্তনশীল। অধ্যাপক স্যাফ্‌হসেন সর্ব্বাগ্রে বুঝাইয়াছেন যে, বলিষ্ঠ, দৃঢ়-পেশিক দেহ এবং ভ্রু-তলস্থ অস্থিরেখার উচ্চতা এত দূর একত্র পরিবর্ত্তিত হয় যে, একের প্রাধান্য অপ্রাধান্যের সহিত অপরের সংযোগ দেখা যায়। অসভ্য মানবের দেহে এই অবস্থা পরিস্ফুট। "Origin of Species" গ্রন্থে ডারউইন্ এই একত্র

পরিবর্ত্তনবিধির দৃষ্টান্তস্বরূপ কতিপয় বিশেষ দুর্ব্বোধ্য উদাহরণ সংগৃহীত করিয়াছেন। যে সকল মার্জ্জার সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ ও নীল-চক্ষু, তাহারা বধির। কাষ্ঠ-বর্ণ মার্জ্জার প্রায়ই স্ত্রীজাতীয়। ক্ষুদ্রচঞ্চু পারাবতের পদও ক্ষুদ্র, এবং দীর্ঘচঞ্চুদিগের পদও দীর্ঘ।

জৈবিক পরিবর্ত্তনের আর একটি নিয়ম এই দেখা যায় যে, পিতৃপুরুষে যে বয়সে কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তাহা বংশগত হইলে অপত্যেও ঐবয়সেই প্রকাশিত হইতে উদ্যত হয়। কোনও নির্দ্দিষ্ট বয়সে যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, ডার্‌উইন্‌ তাহাকে একত্র পরিবর্ত্তনবিধির অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করেন; সুতরাং তাহা অপত্যে তদ্রূপ ভাবে তুল্য বয়সের সহিত যুক্ত না হইয়াই পারে না।

ডার্‌উইন্‌ আর একটি কথার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন। এরূপ পরিবর্ত্তন অনেক আছে, যাহাতে জনন-যন্ত্রের উপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করে। কোনও কোনও পরিবর্ত্তনে জনন-শক্তির খর্ব্বতা উৎপাদন করে, অপর পরিবর্ত্তনে ঐ শক্তির উপর কোনও ক্রিয়াই করে না; এবং অন্যবিধ পরিবর্ত্তনে জনন-শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

ডার্‌উইন্‌ এ কথা অনেকবার বুঝাইয়াছেন যে, ঐ পরিবর্ত্তন পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর যেরূপ ভাবে নির্ভর করে, তদপেক্ষা অধিকতর রূপে জীবের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে। "জীবদেহে এমন অনেক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, যাহাকে স্থূল দৃষ্টিতে অহেতুক বলা যাইতে পারে; যে হেতু ঐ সকলের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে আমরা অনভিজ্ঞ। যাহা হউক, ঐ সকল পরিবর্ত্তন ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত পার্থক্যই হউক, অথবা গুরুতর আকস্মিক গঠনবৈচিত্র্যই হউক, উহা জীবের অন্তঃপ্রকৃতির উপর যেরূপ বিশেষ ভাবে নির্ভর করে, বাহ্য অবস্থার উপর তদ্রূপ নহে।"

এই সকল ও অপরাপর ক্রমবিবর্ত্তনবিধির মর্ম্মানুসারে ভাষার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে গেলে যেন বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয় যে, ভাষার সহিত আদিরসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভাষার সহিত আদিরসের সম্বন্ধ যে সকল জীবতত্ত্বান্তর্গত বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করে, তাহা মূল প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু এ স্থলে ডার্‌উইন্‌ প্রণীত "Descent of Man" নামক গ্রন্থের নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলে বিষয়টী বিশদরূপে বুঝা যাইবে। ডার্‌উইন্‌ বলেন, "যদিও সর্ব্ববিধ প্রাণীরই ধ্বনি দ্বারা নানা প্রকার উদ্দেশ্য ও উপকার

সাধিত হইয়া থাকে, তথাপি কামযন্ত্র সকল যে প্রথমতঃ বংশবৃদ্ধির উপায়-স্বরূপেই ব্যবহৃত ও উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা দৃঢ়রূপে বলা যায়। নিম্ন-শ্রেণীস্থ জীবের মধ্যে উর্ণনাভ ও কীট সকলকেই সর্ব্বপ্রথম ধ্বনি করিতে শুনা যায়।"

ঐ সকল জীবের ধ্বনি-উৎপাদনের নিমিত্ত ঘর্ষণ যন্ত্র আছে। উহা পুং-জাতীয়গণের মধ্যেই প্রায় দেখা যায়। লয়সহকারে একই স্বরের পুনঃপুনঃ উৎপাদনবশতঃ ঐ সকল ধ্বনি উৎপন্ন হয়; এবং উহা কখনও কখনও মানবেরও শ্রুতিমধুর বোধ হইয়া থাকে। পুংজাতীয়গণ প্রধানতঃ স্ত্রীজাতীয়-দিগকে আহ্বান অথবা মোহিত করিবার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ ধ্বনি উৎপাদন করে। পুংজাতীয় মৎস্য সকল কামকালেই ধ্বনি করিয়া থাকে। বায়ুশ্বাসী জন্তু সকল স্বভাবতঃ শ্বাসযন্ত্রের দ্বারা নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বাহির করিয়া থাকে; উহা একটী নলমাত্র; ঐ নলের এক মুখ ইচ্ছামত বন্ধ করা ও খোলা যাইতে পারে; সুতরাং ঐ জাতীয় নিম্নতর প্রাণীগণের যখন কোনও বিশেষ উত্তেজনায় সর্ব্বাঙ্গ আন্দোলিত হয়, তখন উহাদিগের পেশী সকল অবশ্যই গুরুতররূপে আক্ষিপ্ত ও কুঞ্চিত হইবে। ইহাতেই ধ্বনি উৎপন্ন হইবে, ঐ ধ্বনি উদ্দেশ্যমূলক নহে; উহা উত্তেজনা ও যন্ত্র কুঞ্চনের ফলমাত্র।

নিম্নপ্রাণিগণের মধ্যে উভচর প্রাণীই সর্ব্বপ্রথমে বায়ু দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। ইহাদিগের মধ্যে ভেকগণের বাক্‌যন্ত্র আছে। উহারা কামকালে ঐ যন্ত্র দ্বারা প্রায় সর্ব্বদাই ধ্বনি উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ যন্ত্র স্ত্রীগণের অপেক্ষা পুংগণেরই অধিক পরিপুষ্ট। অধিকাংশ কচ্ছপের মধ্যে পুংজাতীয়-গণেরই এই যন্ত্র আছে, স্ত্রীজাতীয়ের নাই; এবং উহা কামকালেই শব্দায়মান হয়। পুংজাতীয় কুম্ভীরগণ কামকালে উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিয়া থাকে। সকলেই জানেন, পক্ষিগণ কামকালে স্ত্রীগণকে আয়ত্ত করিবার জন্য কত বিচিত্র ধ্বনি উৎপাদন করে। স্তন্যপায়ী জন্তুগণও এই কালেই অধিকতর শব্দায়মান হয়। কোনও কোনও স্তন্যপায়ী জীব (সজারু ও জিরেফ ইত্যাদি) কামকাল ভিন্ন অন্য সময়ে সম্পূর্ণ মূক। অন্যান্য স্তন্যপায়িগণের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই, অথবা স্ত্রীগণ কামকালে ধ্বনি উৎপন্ন করিয়া সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীকে আহ্বান করে। জীবতত্ত্বের এই সকল বিধানের সহিত জীবমণ্ডলের ঘটনা সকলের তুলনা করিয়া আমরা ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে সিদ্ধান্ত-বিশেষে সমাগত হইতে পারি।

নিম্নতম জীবমণ্ডলীতেও দেখা যায় যে, যে সকল জীবের ধ্বনি উৎপাদন করিবার যন্ত্রই নাই, তাহারাও সঙ্গীতের সুখানুভব করিতে সক্ষম হয়। সঙ্গীতের স্বর, তান, লয় সংযোগে কতিপয় প্রাণীকে আনন্দিত করে কেন, তাহা আমরা জানি না; তেমনই এক স্বাদে সুখ, অন্য এক সৌরভে আনন্দ উপভোগ করি কেন, তাহাও আমরা বুঝিতে সক্ষম নহি। উভয়ই তুল্যরূপে দুর্ব্বোধ্য। যাহা হউক, অতি নিম্নতম প্রাণীও সঙ্গীতে অভিভূত হয়, তাহার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমরা জানি যে, শম্বুকশ্রেণীস্থ জীবগণের শ্রবণেন্দ্রিয় স্বরূপ কতিপয় কেশ আছে; তাহা উপযোগী স্বরের সহিত কম্পিত হয়। মশকের শুঁড়ের উপরিস্থ কেশেও এইরূপ কম্পন লক্ষিত হইয়াছে। উর্ণনাভকে সঙ্গীতস্বরে আকৃষ্ট হইতে বিশিষ্ট পরিদর্শকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন। ডারুউইন্ বলেন,—"পুংজাতীয় প্রাণিগণ স্ত্রীজাতীয়গণকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত সৌন্দর্য্য লাভ করে"; আমি বলি, তদ্রূপই বাক্‌যন্ত্র উদ্ভূত হইবার পূর্ব্বেও পুংজাতীয় অমেরুগণই এরূপ কারণেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঘর্ষণ করিয়া কামকালে শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাই দাম্পত্য নির্ব্বাচন (Sexual Selection); সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অন্তর্গত। কাল-সহকারে নিম্নতম মেরুগণ জাত হইল। উহারা শ্বাসযন্ত্রের দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস করে। ঐ যন্ত্র একটি নলমাত্র; যাহা এক দিকে ইচ্ছামত বন্ধ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ নির্দ্দিষ্ট বাক্‌যন্ত্র উদ্ভূত হয় নাই; ঐ নলই পেশীর সঙ্কোচন বশতঃ ধ্বনি উৎপাদন করিতে সক্ষম হইত। যথনই ঐ সকল জীব গুরুতর উত্তেজনা অনুভব করিত, তথনই উহাদিগের ইচ্ছার নিরপেক্ষভাবেও ঐ নল-সংলগ্ন পেশী সকল সঙ্কুচিত হইত। নিম্ন জীবগণের কাম-মত্ততা অপেক্ষা আর গুরুতর উত্তেজনা নাই।

সুতরাং কামকালে উহাদিগের ঐ নল হইতে শব্দ উৎপন্ন হওয়া অতীব স্বাভাবিক। কালক্রমে ঐ নলের অথবা ঐ নলধারী জীবের দেহযন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বলে যে সকল পরিবর্ত্তন জীবের বংশবিস্তারের সহায়ক হইল, তাহা হইতে ক্রমে বাক্‌যন্ত্র ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল। অবশেষে মানবে আসিয়া ঐ যন্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল।

সঙ্গীত অথবা বাগ্মিতা আমাদিগের মনে অনেক ভাব জাগাইয়া তুলে। ডারুউইনের মতে ইহা আদিরসমূলক ভাষা উৎপত্তির অন্যতর প্রমাণ।

তিনি বলেন, "সঙ্গীত আমাদিগের মনে নানা ভাব জাগাইয়া দেয় সত্য, কিন্তু আতঙ্ক, ক্রোধ, অথবা ভীতি উৎপাদন করে না। উহাতে প্রেম ও প্রীতিপূর্ণ ভাব জাগাইয়া দেয়, ধর্ম্মভাব উন্মুক্ত করে। সঙ্গীত কোমল ভাবের উৎস, ভয়ঙ্কর ভাবের নহে। চীনদেশীয় প্রবাদে কথিত হয়, সঙ্গীত স্বর্গ-লোককে মর্ত্ত্যধামে লইয়া আসিতে সক্ষম। ইহা আমাদিগের মনেও রণমত্ততা অথবা জয়োল্লাসের ভাব জাগাইয়া দেয়। এই শক্তিমগ্ন মিশ্র ভাব সকল হইতেই উচ্চতর মহান ও গম্ভীর ভাব সকল সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।" ডাক্তার সিমান বলেন, "শত শত পৃষ্ঠা লিখিয়া যে ভাব উত্তেজিত করা যায় না, সঙ্গীতের একটীমাত্র স্বরে তদপেক্ষা অধিক ভাব পুঞ্জীকৃত ও উন্মুক্ত করা যায়।" যখন পুংজাতীয় বিহঙ্গগণ কামোন্মত্ত হইয়া স্ত্রীজাতীয়গণকে স্বরলহরী বর্ষণ করিয়া বিমোহিত করিয়া তুলে, তখনও এইরূপ ভাবই সমুদ্ভূত হয়। কিন্তু মানবীয় সঙ্গীত অপেক্ষা বিহঙ্গ-সঙ্গীত দুর্ব্বল ও সরলতর। অদ্যাপি মানব-সঙ্গীতের প্রধান উপকরণ প্রেম। হার্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, "সঙ্গীত হৃদয়ের যে সমস্ত সুপ্ত ভাবকে জাগাইয়া তুলে, সঙ্গীত ব্যতীত তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মানব বুঝিতে পারিত না; তাহার মর্ম্ম অনুভব করিতে মানব অদ্যাপিও সম্পূর্ণ অক্ষম।" রিকৃটার বলিয়াছেন, "সঙ্গীত অদৃশ্য বস্তুর কথা বলিয়া দেয়। তাহা বুঝি জীবনে কখনই দেখিব না।" এ দিকে যখন মনের ভিতর জীবন্ত ভাব সকল অনুভূত হয় এবং বাগ্মীর মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে, অথবা দৈনন্দিন মানব-ভাষায় প্রকাশলাভ করে, তখন সঙ্গীতের তান লয় আপনই আসিয়া উপস্থিত হয়। আফ্রিকা দেশের নিগ্রোজাতি উত্তেজিত হইলে অনেক সময় একের মুখ হইতে সঙ্গীত ফুটিয়া বাহির হয়; অন্যে সঙ্গীতেই তাহার উত্তর প্রদান করে। এইরূপে সঙ্গীত-লহরীতে আন্দোলিত হইয়া সমবেত নিগ্রো-মণ্ডলী ঐকতান গুঞ্জন করিয়া উঠে। মর্কটগণও তীব্র ভাব ব্যক্ত করিতে নানাবিধ স্বর ব্যবহার করে। ক্রোধ ও অধীরতা মৃদুস্বরে, ভীতি ও ক্লেশ উচ্চস্বরে প্রকাশ করিয়া থাকে; সঙ্গীতে যে সকল ভাব ও অনুভূতির উদ্বোধন হয়, বাগ্মীর স্বর-লহরীতে যাহার অভিব্যক্তি, তাহা গভীর; তাহা অপরিস্ফুট বলিয়াই যেন কোনও চিরাতীত যুগের চিন্তা ও আবেগ স্মরণ করাইয়া দেয়। উহা তাহারই যেন পুনরাবৃত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

কামকালে সকল জন্তুই প্রেম, হিংসা, প্রতিযোগিতা ও জয়োল্লাসে মত্ত হয়। মানবের পূর্ব্ববর্ত্তী জীবগণ, যাহাদিগকে অর্দ্ধমানব বলা যাইতে পারে,

তাহারাও প্রণয়োদ্গম-সময়ে ধ্বনি সহ তান লয়ের সংযোগ করিত। এই সকল কথা স্মরণ রাখিলেই সঙ্গীত ও ভাবপূর্ণ বাক্যের আবেগ মানব-হৃদয়ে কিরূপে উপস্থিত হয়, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি একরূপ বুঝা যাইতে পারে। ভাব সকল বংশ পরম্পরাগত; এই সুপ্রমাণিত বিধান অনুসরণ করিলেই বুঝা যায় যে, সঙ্গীত-লহরীতে চিরাতীত কালের ভাবরাশি অস্পষ্ট স্বপ্নের মত মানব-হৃদয়ে জাগাইয়া দিবেই। সঙ্গীত, নৃত্য ও কাব্য যে এত পুরাতন কলা, ইহার প্রকৃত রহস্য এইখানেই নিহিত আছে। এতদপেক্ষাও অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায়; এই সিদ্ধান্তকে অতীতে প্রসারিত করিলে বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গীতই মানবীয় ভাষার অন্যতর মূল। এস্থলে উল্লেখ করিতে হয় যে, ভাষার মূল কারণ সম্বন্ধে ডারউইনের মতের সহিত হার্বার্ট স্পেন্সারের মতের পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য ডারউইন এইরূপে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, "স্পেন্সারের সিদ্ধান্ত আমার সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ডিডারটের সহিত ঐক্যমতে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভাবময় মানবীয় ভাষায় যে স্বর-তরঙ্গ বিকাশ পায়, তাহা হইতেই সঙ্গীতের উৎপত্তি। কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, আদি যুগের মানব দাম্পত্যসম্মোহন উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যেই সঙ্গীতের তান ও লয় প্রথমে ব্যবহার করিয়াছিলেন। এইরূপে সঙ্গীতে স্বরের সহিত জন্তুগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতম ভাবের সংযোগ হইয়া যায়; আর এই হেতুবশতঃই ভাষায় হৃদয়ের প্রবল আবেগ ব্যক্ত করিতে গেলে সঙ্গীতের তান লয় যেন আপনই আসিয়া পড়ে।"

বিবর্ত্তনবাদ অনুসারে ভাষার উৎপত্তি উল্লিখিত উপায়ে নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই মতগুলি আপন সীমার মধ্যে যথাসম্ভব সত্য বলিয়া স্বীকার করি; কিন্তু আমার বোধ হয় যে, ঐ সীমা অতিক্রম করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করিলে আরও গভীর তথ্য অবগত হওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য বিবর্ত্তনবাদ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও জীব-জগতে ক্রমবিবর্ত্তন বিষয়ে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন একটী বিশেষ প্রবল শক্তি, সন্দেহ নাই; কিন্তু সম্ভবতঃ ইহাই একমাত্র শক্তি নহে। বস্তুতঃ জৈবিক ব্যাপার সকলের মধ্যে অনেক ঘটনা এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা বোধগম্য হয় না। এ স্থলে জিরেফের কথা স্মরণ করুন। এই জন্তুর গ্রীবা দীর্ঘ হইবার কারণ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন মূলে ডারুইন এইরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।—

একশ্রেণীস্থ জন্তুগণের মধ্যে পরস্পরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছু কিছু ছোট বড় হইয়াই থাকে। প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা হইতেই ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এই নিয়মাধীনে যে সকল জিরেফের কোনও কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছু দীর্ঘায়তন হইয়াছিল, প্রায় তাহারাই জীবন-সংগ্রামে রক্ষা পাইয়াছিল। ইহারা পরস্পর অপত্যোৎপাদন করিলে, সেই অপত্য পিতৃমাতৃধর্ম্মানুক্রমবশতঃ ঐ অঙ্গের দীর্ঘতা প্রাপ্ত হইবে, অথবা এইরূপ দৈর্ঘ্যপ্রাপ্তির প্রবণতা লাভ করিবে। আর যাহারা ঐ বিষয়ে হীন, তাহারা গো মহিষাদি অপর পশুর সহিত জীবন-সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া বিলুপ্ত হইবার পথে অগ্রসর হইবে। ইহার ফলে জিরেফের গ্রীবা পদাদি অসাধারণ দীর্ঘ হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপ বিচারে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ঐ কারণ-বশতঃ কেবল যে জিরেফই লম্ব-দেহ হইবে, তাহা নহে; অন্যান্য সমাবস্থ জন্তুও তদ্রূপই হইবে। আফ্রিকার জিরেফ অসাধারণ লম্বগ্রীব। জগতের অন্য কুত্রাপি এরূপ লম্বগ্রীবের দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। জিরেফশ্রেণীস্থ অপর জীব জগতের অন্যত্র ঐ ভাবাপন্ন হয় না কেন, ডারউইন তাহার মীমাংসা করিতে গিয়া স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন। ঐ তর্কের এবং ঐরূপ অনেক তর্কের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা মীমাংসা করা যায় না। আর তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, শুধু প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনবিধির সাহায্যেই বিবর্ত্তবাদ সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

জীবের বংশবিস্তৃতির বিষয়ে আলোচনা করিলে বুঝা যাইতে পারে যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন হইতেও উচ্চতর বিধান জীবমণ্ডলীর বিবর্ত্তন বিষয়ে সহায়তা করিতেছে; নিম্নতম জীবগণের মধ্যে কাহারও দেহ খণ্ডিত ও বিভক্ত হইয়া, কাহারও বা দেহাংশ স্ফীত ও পরিত্যক্ত হইয়া, বংশবৃদ্ধি কার্য্য নিষ্পন্ন করে। এই উপায়ে একটী জীব হইতে দুইটী উৎপন্ন হয়। ইহাই বংশবৃদ্ধির প্রাথমিক ও সরলতম বিধান। যদি জীবন-সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বীতাই জীবমণ্ডলীর ক্রমবিবর্ত্তনের একমাত্র নিয়ামক শক্তি হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত সরল ও সহজ বিধানের পরিবর্ত্তে উচ্চতর জীবশ্রেণীর বংশবৃদ্ধিবিষয়ক জটিল বিধান প্রবর্ত্তিত হইবার কোনও কারণ দেখা যায় না। কারণ, বংশ-বৃদ্ধির নিয়ম যতই জটিল হইবে, জীবের জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার আশাও তত খর্ব্ব হইয়া যাইবে। জীব যতই উচ্চতর পদবীতে সমারূঢ় হইয়াছে,

ততই উল্লিখিত সরল ও সহজ উপায়দ্বয় পরিত্যক্ত হইয়াছে। উভলিঙ্গ জীবগণ কথঞ্চিৎ উচ্চশ্রেণীস্থ। ইহাদিগের মধ্যে ঐ উপায়দ্বয়ের পরিবর্ত্তে অন্তবিধ উপায়ে বংশবিস্তৃতি সিদ্ধ হইয়াছে।

এই সকল উভলিঙ্গ জীবের জনন কার্য্যে একটী বিবেচনা করিবার বিষয় আছে। যদিও ইহাদিগের প্রত্যেকেরই শরীরে স্ত্রী ও পুং উভয়বিধ জননেন্দ্রিয়ই বর্ত্তমান আছে, তথাপি অধিকাংশ স্থলেই এই শ্রেণীস্থ একটী জীবের উভয় ইন্দ্রিয়ের সংযোগে অপত্য উৎপন্ন হয় না; ইহাদিগেরও দুইটী জীবের পরস্পর সংযোগ আবশ্যক হয়। এই জাতীয় কতিপয় জীবের মধ্যে একের উভয় ইন্দ্রিয়ের সংযোগেই অপত্যোৎপাদন হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগেরও এইরূপ বিধান চিরদিন বংশপরম্পরায় রক্ষিত হয় না। উহারাও কালক্রমে দুইটী জীব সম্মিলিত হইয়া সময় সময় বংশবিস্তার করিতে আরম্ভ করে। নচেৎ বংশলোপ হইয়া যায়। ডারউইন স্বীয় "Origin of Species" গ্রন্থে বলেন যে,—"অতি নিকট কুটম্বগণের সংযোগে অপত্য উৎপন্ন হইলে, তাহার তেজ ও জননশক্তি অল্লাধিক কমিয়া যায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয় যে, কোনও একটি জীব আপন উভয় ইন্দ্রিয়ের সংযোগে অপত্য উৎপাদন করিয়া বংশপরম্পরায় স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। দুইটি জীবের পরস্পর সম্মিলনে অপত্য-উৎপাদন বংশরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। অন্ততঃ বহু বংশ পরেও এক এক বার ঐরূপে বংশবৃদ্ধি করা আবশ্যক হয়। উদ্ভিদগণের বিষয় আলোচনা করিলে অনেক সময় এইরূপ কৌতূহলজনক ব্যাপার লক্ষিত হয় যে, তাহা উল্লিখিত নিয়ম ব্যতীত অন্য প্রকারে বোধগম্য হয় না। কোনও কোনও বৃক্ষে প্রত্যেক ফুলে পরাগরেণু ও গর্ভকেশর দৃষ্ট হয়। ইহা স্ত্রী ও পুংবীজ। এ স্থলে অনেক সময় দেখা যায় যে, ঐ উভয়ের মধ্যে একটী পরিপুষ্টিলাভ করিলেও, অপরটি অপুষ্ট থাকে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ঐ নির্দ্দিষ্ট ফুলের গর্ভকেশর ও পরাগের সংযোগে বংশবৃদ্ধির উপায় নাই। ডারউইন এই ব্যাপার সম্বন্ধে বলেন যে, "ইহা অতীব বিস্ময়কর। পরাগরেণু ও গর্ভকেশর পরস্পরের এত সন্নিহিত, তথাপি উভয়ে এক সময়ে পরিপুষ্ট না হওয়ায় উহাদিগের মিশ্রণে অপত্য উৎপাদন হইতে পারিল না। এই সকল বৃত্তান্ত অতি সহজ ও সরল ভাবে বুঝা যাইতে পারে। আমরা বিবেচনা করি যে, সময়ে সময়ে দুইটি জীবের সম্মিলন বংশবিস্তার বিষয়ে উপকারজনক অথবা অপরিহার্য্য। যে সকল পুষ্পের

গর্ভকেশর ও পরাগরেণু যুগপৎ পরিপুষ্ট হয়, তাহাদিগেরও পতঙ্গগণ আসিয়া একের রেণু অন্যের কেশরে সংযুক্ত করিয়া বংশবিস্তারের উপায় করিয়া দেয়। পতঙ্গগণ ঐ পুষ্পের সঞ্চিত মধুর লোভে অথবা সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া যাহাতে সহজে প্রবেশ করিতে পারে, এবং রেণু বহন করিয়া উড়িয়া যাইতে পারে, তাহার বিধান ঐ পুষ্পমধ্যেই রচিত আছে। পতঙ্গগণের আগমন ইহাদিগের বংশবিস্তারের নিমিত্ত এতই আবশ্যক যে, উহা নিবৃত্ত করিলে ঐ সকল পুষ্পের বীজোৎপাদনশক্তি কমিয়া যায়। যদি প্রকৃতি এক পুষ্পের পরাগরেণু অপরের গর্ভকেশরে সংযুক্ত করিবার উপায় না করিতেন, তাহা হইলে এই সকল পুষ্পমধ্যে পতঙ্গ আকৃষ্ট করিবার যে সকল উপায় আছে, এবং পতঙ্গের সহজে আগম ও নির্গমের যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইত। ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, শিশির কিংবা বৃষ্টিপাত পুষ্পের বীজোৎপাদনের পক্ষে অতীব অনিষ্টজনক। তথাপি বহুসংখ্যক পুষ্পের পরাগ ও গর্ভকেশর শিশির ও বৃষ্টিপাতের অধীন। এই সকল হইতে তাহাদিগের আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই। কিন্তু এক পুষ্পের পরাগরেণু অপরের গর্ভকেশরে সংযুক্ত হইবার নিমিত্তই ইহারা এইরূপ বিপদের মধ্যেও রক্ষিত হইয়াছে।

এই সকল বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে, নিম্নতম জীবের মধ্যেও জননক্রিয়া শুধু বংশবৃদ্ধির জন্য নহে; এক জীব অপর জীবের সহিত সম্মিলনের দিকে অগ্রসর হইবার নিমিত্তও ঐরূপ বিধান রচিত হইয়াছে। অপরের নিরপেক্ষ হইয়া একের আত্মসর্ব্বস্বত্ব প্রকৃতির উদ্দেশ্য নহে। এই হেতু প্রকৃতি নিম্নতম শ্রেণীতেও জীবদ্বয়ের সংযোগের বিধান ক্রমশঃ শিক্ষা দিয়াছেন। অপরের সহিত সংযুক্ত হইবার নিমিত্ত এই সকল জীবকে অনেক সময় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বিপরীত দিকে যাইয়াও ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। ইহাকেই জীব-জগতের একটী আধ্যাত্মিক নিয়ম বলা যাইতে পারে। আমরা জানি না, কিরূপে এই আধ্যাত্মিক আসঙ্গলিপ্সা উৎপন্ন হইল। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনা হয় যে, ভাষার উৎপত্তি দাম্পত্যভাবের আধ্যাত্মিক দিকের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত, কেবলমাত্র শারীরিক দিকের সহিত সেরূপ নহে। আধুনিক বিবর্ত্তনবাদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ভাষা ও আদিরসের আধ্যাত্মিক বিভাগ একত্র পরিবর্ত্তন বিধির * একটী উদাহরণ স্থল।

* Correlated Variation.

হেকেল তাঁহার বিখ্যাত "History of Creation" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, মর্কট হইতে ক্রমবিবর্ত্তনের বিধান অনুসারে বর্ত্তমান মানবে উপনীত হইবার সময় একটা মধ্যবর্ত্তী অবস্থা ঘটিয়াছিল। সেই অবস্থায় মানব মূক অর্থাৎ ভাষাহীন ছিল। হেকেলের এই মত অসম্ভব বোধ হয় না; কারণ, সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত মর্কট ও বর্ত্তমান অসভ্যতম মানবের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয়ে কত প্রভেদ। এতদুভয়ের শরীরবিধান তুল্য হইলেও আধ্যাত্মিক প্রভেদ অনেক, সন্দেহ নাই। এই হেতু একটি মধ্যবর্ত্তী অবস্থার কল্পনা করিতে হয়। তাহা হইলে সেই অবস্থায় মানবের আদিরসের আধ্যাত্মিক ভাগ উৎকর্ষ লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়; এবং তন্মূলে ভাষাবিকাশের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিবর্ত্তনবাদিগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, মানবেতর জীবগণেরও বিবেকশক্তির বীজ আছে; উহা মানবে বিকাশলাভ করিয়াছে। আধুনিক মানবেতিহাসপাঠেও জানা যায় যে, বিবেকহীন মানব জাতি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ভাষাব্যবহারী মানবের পূর্ব্বে ভাষাহীন মানবের অস্তিত্ব-কল্পনা নিতান্তই অসম্ভব নহে। * যাহা হউক, মানবের আসঙ্গলিপ্সাবৃত্তি হইতেই অর্থাৎ দাম্পত্য বৃত্তির আধ্যাত্মিক বিভাগ হইতেই ভাষার মূল বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করা আবশ্যক; কারণ, এতদুভয় কার্য্যকারণ ভাবে সম্বদ্ধ। আদিরসের আধ্যাত্মিক দিকের সহিত ভাষার উৎপত্তি জড়িত আছে।

ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করিতে নয়ার উল্লেখ করিয়াছেন যে, যখন কোনও এক দল ব্যক্তি একত্র কোনও কার্য্য সমবেত-চেষ্টায় নিষ্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহারা অনেক সময় যেন একরূপ তালে তালে ধ্বনি উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা সমবেত প্রবৃত্তিরই ফল। নাবিকগণ একত্র রজ্জু আকর্ষণ করিবার সময়, অথবা দাঁড় বাহিবার সময় যে সমস্বরে ঐক্যতান ধ্বনি করে, তাহা সকলেই জানেন। দলবদ্ধ হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিবার কালে সেই দল হইতে সমস্বরে যে বিকট ধ্বনি যুগপৎ উৎপন্ন হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই সকল ধ্বনি অথবা চীৎকারকেই নয়ার আদিম ভাষার প্রারম্ভ বিবেচনা করেন। এই মত-

* বিশেষতঃ যখন পেলিওলিথিক যুগের মানবগণের অপরিস্ফুট ভাষার কথা মনে করা যায়, তখন তৎপূর্ব্বকালীয় মানবের সম্বন্ধে এই অনুমান সম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। Science Progress, January, 1909, P. P. 525-6.

অধ্যাপক সইস (Sayce) স্বীয় "Introduction to the Science of Language" গ্রন্থেও সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, যদি একাধিক ব্যক্তি একত্র সমবেত হইয়া কোনও সাধারণ কার্য্য করিতে যায়, তাহা হইলে সকলের মনেই এক উৎসাহ, উদ্যম ও তেজের ভাব উদিত হয়; তাহা হইতে আপনই মানবীয় ভাষার উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। নয়ারের এই মত মানবেতর জীবে প্রসারিত করিলে, ইহা আদিরসমূলক ভাষার উৎপত্তিবাদের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ, উৎসাহ, উদ্যম ও তেজের ভাব দাম্পত্য আবেগ হইতে যেরূপ উৎপন্ন হয়, তেমন আর কিছুতেই নহে; আর একাধিক পুংজাতীয় জন্তু আপন শোভা ও সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ দ্বারা, অথবা বলপূর্ব্বক, স্ত্রীজাতীয় জন্তুকে আয়ত্ত করে, ইহাতেই ঐ সকল ভাবের পুষ্টি হয়। সুতরাং কামকালে যখন জন্তুগণ আদিরসের উত্তেজনা অনুভব করে, তখনই স্বরমাধুর্য্য-প্রদর্শন ও স্বরের পরিপুষ্টি-সাধনের উপযুক্ত সময়। আর জীবতত্ত্বের আলোচনাতেও জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষেও এইরূপই ঘটে। কিন্তু বিহঙ্গ-সঙ্গীতকে যদি ভাষা বলা যায়, তবে জীবের ভাষার মূল প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অপেক্ষাও জীবন ব্যাপারের আরও গভীরতর স্তবে অনুসন্ধান করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডারউইন জীববিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া গভীরতম কারণ থাকা অনুমান করেন; কিন্তু তাহার সম্যকরূপে নির্দ্দেশ ও নির্ণয় করিতে পারেন নাই, তাহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট জীবশ্রেণীর মধ্যে প্রত্যেক জীবই অপর সকলের অপেক্ষা দেহবিধানে কিছু কিছু বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। বিবর্ত্তনবাদের ইহা এক প্রধান উপকরণ। ডারউইন ইহার কারণ নির্ণয় করিতে সক্ষম হন নাই। জীবের কোনও কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একত্র পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা বিবর্ত্তনবাদের অন্যতর বিধি। ডারউইন ইহারও কারণ-অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হন নাই। সুতরাং ভাষার উৎপত্তি-নির্ণয়ে উচ্চতর কারণ অনুমান করিবার বিশেষ কোনও বৈজ্ঞানিক বাধা নাই। এ স্থলে এ কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য যে, ডারউইন স্বয়ং জড়বাদী হইয়াও স্বীকার করিয়াছেন যে, জৈবিক পরিবর্ত্তন পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর যত দূর নির্ভর করে, তদপেক্ষা জীবের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির উপরই অধিকতর নির্ভর করিয়া থাকে। তাঁহার এই মত আমি পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। এই অন্তর্নিহিত প্রকৃতি কি? আমরা বলি, আত্মা। সুতরাং আদিরসের আধ্যাত্মিক দিক হইতে আসঙ্গলিপ্সার বিচার করিলে, ইহাতেই যে ভাষার মূল নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করিবার কারণ থাকে না। এই মতের সহিত ডারউইনের মতের অসামঞ্জস্য হয় না; বরং একই কথার উচ্চতর দিক হইতে সমাধান হয়।

পরবশতা।

পরবশতা।

পরবশতা।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং। সর্ব্বমাত্মবশং সুখং॥

আত্মবশে সকলই সুখ, পরবশে সকলই দুঃখ। কিন্তু আত্মবশ ত কেহই নহে। প্রথমজ (Protozoa) হইতে মানব পর্য্যন্ত সকলেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে। জীবের অন্তর্নিহিত শক্তি যাহা আছে, তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীনতা স্বীকার করিয়াই নিম্ন হইতে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা একদিকে দেহকে এবং অপরদিকে মনোবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। মন দেহকে, অথবা দেহ মনকে অনুসরণ করে,—সে প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়াও বলা যায় যে, যে জীবের দেহ যেমন, তাহার মনও তদ্রূপ। দেহ ও মনের সম্বন্ধ অস্বীকার করা যায় না। প্রথমজ জীবের দেহ কেবল একটী জীবকোষ মাত্র; উহার জটিলতা কিছুমাত্র নাই। উহার মনও তদুপযোগী। উহার মনে কোন উচ্চভাব থাকার পরিচয় নাই। এককৌষিক শ্রেণী হইতে জীব ক্রমে বহু-কৌষিকে উন্নত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোবৃত্তিও উন্নত হইতে লাগিল। বহুকৌষিক জীব মধ্যেও যাহারা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, তাহাদিগের মনোবৃত্তিও অনুন্নত। আর যাহারা দেহ-বিধানে উন্নত, তাহাদিগের মনোবৃত্তিও উন্নত। "দেহ বিধানে উন্নত" বলিতে জটিল বোধ করে। যাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে এবং ঐ সকল অংশ জটিলরূপে গঠিত, সেই জীবকেই দেহ বিধানে উন্নত বলা যায়। আর, যাহার দেহ-গঠন সহজ এবং দেহাংশে ক্রিয়া বিভাগের বাহুল্য নাই, তাহাকে অনুন্নত বলা যায়। সমস্ত জীব-রাজ্যের ইহা প্রায় অখণ্ডিত নিয়ম যে, যে জীবের দেহ যত উন্নত, তাহার মনও ততই উন্নত। বৃহৎ হউক, ক্ষুদ্র হউক, তাহার উপর নির্ভর করে না। শম্বুক পিপীলিকা হইতে বৃহৎকায়; তথাপি পিপীলিকার দেহ গঠন জটিলতর হওয়ায় উহারা শম্বুক হইতে উন্নতমনা। দেহ-

বিধানের মধ্যেও স্নায়ুমণ্ডলের, বিশেষতঃ মস্তিকপিণ্ডের জটিলতা এবং কর্ম্ম বিভাগের উপরই মনের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। কীট হইতে মানব পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর দেহও যত উন্নত হইয়াছে, মনও ততই উন্নত হইয়াছে। সুতরাং দেহ ও মনের নিকট সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে।

এই কথা সত্য হইলে, পরবশতার ফল কি হইবে? উহা দেহের উপর কিরূপ ক্রিয়া উৎপন্ন করিবে? এবং মনকেই বা কি ভাবে পরিণত করিবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাইলেই, মানবের অবস্থাও পরিজ্ঞাত হইতে বাকী থাকিবে না।

এক হিসাবে দেখিতে গেলে, কোন জীবকেই উন্নত কি অনুন্নত বলা যায় না (১), কারণ প্রত্যেক জীবই তাহার নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী। নতুবা সে জীবিত থাকিতেই পারিত না। আদি জৈবিক (২) সময়ের সরীসৃপ সে যুগের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। উহারা বর্ত্তমান নব-জৈবিক (৩) সময়ের সরীসৃপ হইতে এ হিসাবে অনুন্নত নহে। বর্ত্তমান যুগের সরীসৃপ এ যুগের উপযোগী; পূর্ব্বোক্তগণ সেই যুগের উপযোগী। এ হিসাবে কেহই উন্নত অনুন্নত নহে। তবে প্রভেদ এইমাত্র যে, পূর্ব্বোক্তগণ অপেক্ষা আধুনিক যুগের সরীসৃপগণ অধিকতর জটিলতার দিকে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাই ইহাদিগকে উন্নত বলা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীস্থ জীবের কথা স্মরণ করিলেও ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে, সরীসৃপ সরীসৃপত্বে যেরূপ উন্নত, মানব মানবত্বেও তদ্রূপই। এদিক হইতেও কাহাকেও উন্নত অবনত বলা যায় না। কিন্তু কেবলমাত্র দেহের জটিলতা এবং মনের অবস্থাতেই জীবগণকে উন্নত অবনত বলা যাইতে পারে। দেহের উন্নতি অবনতির উপর মনের উন্নতি অবনতি বিশেষ ভাবে নির্ভর করে।

পরবশতায় দেহের অবস্থা কিরূপ হয়? জীব-রাজ্যে অমেরু (invertebrate) প্রাণিগণ মধ্যে পর-পুষ্টের সংখ্যা অধিক। ইহারা কেহবা আহার্য্য বস্তুর সহিত

---

(১) It cannot be asserted that the primeval types of any given group are necessarily lower, zoologically speaking, than their modern representatives.

Nicholson—Ancient Life history of the Earth. p. 372.

(২) Palœozoic age. এই যুগে Pernion স্তরের পূর্ব্বে প্রকৃত সরীসৃপের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

(৩) Kainozoic age.

অপর জীবদেহে প্রবিষ্ট হয়; কেহবা বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত অপর দেহে আশ্রয় লয়; অন্যে ইচ্ছা পূর্ব্বক অপর জীবদেহে ডিম্ব প্রসব করে, তদবধি ডিম্ব সেই দেহেই বর্দ্ধিত ও পালিত হয়। কেহ বা দেহ-মধ্যে, কেহ বা দেহ-ত্বকের উপরে পরপুষ্ট ভাবে অবস্থান করে। হয়ত চির-জীবন এই ভাবেই কাটাইয়া দেয়; নতুবা জীবনের কোন অংশবিশেষ এই ভাবে যাপন করে। যে যে ভাবেই পরপুষ্ট অবস্থা গ্রহণ করে, ফল একই প্রকার উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ স্বচেষ্টায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ক্রমশঃ অনভ্যস্ত হইয়া পড়ে। পরপুষ্ট জীব অন্যের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়; তাই স্বাবলম্বন ভুলিয়া যায়। কি উদ্ভিদ, কি জন্তু, সকলেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এ অবস্থা কি? দেহের অবনতি; দেহ যন্ত্রের ও দৈহিক ক্রিয়ার (১) উভয়েরই অবনতি। পরপুষ্টের দেহ, স্বাবলম্বনের অভাবে ক্রমে অবনতির দিকে চলিয়া যায়। পরিশেষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দেহ যন্ত্রাদিও লুপ্ত অথবা অবসন্ন হইয়া পড়ে। জীবতত্ত্ববিৎগণ একবাক্যে বলিতেছেন, যে জীব পরপুষ্ট, পরের চেষ্টার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তাহার এ অবস্থা হইবেই। কোন নির্দ্দিষ্ট জীব মধ্যে, যাহারা স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগের তুলনায়, যাহারা পরপুষ্ট অবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত। কাহারও বা চক্ষু, কাহারও বর্ণ, কাহারও হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও উদর, কাহারও বা জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যায়। (২)

এ অবস্থা অধিকতর অগ্রসর হইলে সেই হতভাগ্য পরপুষ্ট জীব কেবল মাত্র একটী ডিম্বাধারে পরিণত হয়। উহার আর কিছুই থাকে না। দেহ ক্রমে অবসন্ন, নিষ্ক্রিয় ও লুপ্ত হইয়া যায়। জীবন-সংগ্রামে দেহের যে পরিচালন হয়,

---

(১) Retrograde metamorphosis and degeneration. Ency. Brit. Vol. 18 p. 263.

(২) This mode of life * * * reacts upon the parasite itself, as is manifested by the aberrant and degraded structure of parts (directly and indirectly) concerned in nutrition and even of the reproductive system.

—Ibid p. 268.

If the parasitic life be once secured, away go legs, jaws, eyes and ears; the active, highly gifted crab, insects or annilid may become mere sack. Ray Lankester, Degeneration p 33.

তাহাতে দেহ পুষ্ট হইয়া থাকে। পরমুখাপেক্ষীর জীবন-সংগ্রাম নাই; তাই তাহার দেহের পুষ্টিও নাই। আর সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার উন্নতির আশাও নাই। প্রায় সকল বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও, উন্নতি বন্ধ হইলেই অবনতি আরম্ভ হয়। সে অবনতি পরিশেষে পরপুষ্ট জীবকে অধঃপতনের শেষ সীমায় উপস্থিত করে। পরপুষ্ট অবস্থা থাকিলে এই শোচনীয় পরিণামের হস্ত হইতে উদ্ধার নাই, ইহা নিশ্চিত।

আমরা পরবশতা আলোচনা করিতেছিলাম। পরবশতা জীবরাজ্যে দুই প্রকার দেখা যায়। পরপুষ্টতা ও গৃহপালিত অবস্থা। এই দুই ই অতি গুরুতর বিষয়, এবং বহু বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য। উপরে অতি সংক্ষেপে পরপুষ্টতার পরিণাম ফল ইঙ্গিত করিয়াছি। এক্ষণে তদ্রূপ সংক্ষেপেই গৃহপালিত অবস্থার ফল কীর্ত্তন করিব। এই দুই অবস্থাতেই জীবগণ স্বীয় চেষ্টায় জীবিকা নির্ব্বাহ করে না। প্রায় সম্পূর্ণ রূপে পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকে। সুতরাং ফলও যে তুল্যই হইবে, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। গৃহপালিত পক্ষী ক্রমে উড়িতে অক্ষম হইয়া যায়; গৃহপালিত মৃগ ক্রমে দৌড়াইতে অপটু হয়। ডারউইন্ গৃহপালিত এবং স্বাধীন হংসের পাখার পদ-যষ্টির অস্থি সকল তুলনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, গৃহপালিতের পাখার অস্থি ওজনে কম এবং পদ-যষ্টি ওজনে বেশি হয়। (১) ইহার কারণ এই যে, গৃহপালিতের আহারান্বেষণের নিমিত্ত উড়িতে হয় না, অথবা অতি অল্পই উড়িতে হয়; তাই তাহার পক্ষাস্থি ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অনেক গৃহপালিত জীবের বংশ হানি হইয়া থাকে। উহারা হয়ত কারাবাস সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়াই যায়; নচেৎ অপত্যোৎপাদন ক্ষমতা অনেক স্থলেই হ্রাস হইয়া যায়। গৃহপালিত অবস্থারও পরিণাম দৈহিক দুর্ব্বলতা ও অবনতি (২) ইহারও কারণ, সেই স্বাবলম্বন-হীনতা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পরপুষ্ট এবং গৃহপালিত জীব উভয়েই স্বাবলম্বন ত্যাগ করা হেতু দেহাংশে নিতান্তই অধঃপতিত হইয়া যায়।

দেহের ত এই অবস্থা হইল, কাজেই মনের যে অবস্থা হইবে, তাহা পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিলেই বুঝিতে আর বাকী থাকে না। দেহের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে মনের অধঃপতন অনিবার্য্য। পরিচালনের অভাবে অস্থি, পেশি, সুতরাং

(১) Origin of Species, (1901) p 19.

(২) Cf. Variation of animals and plants under domestication.

স্নায়ু ও মস্তিষ্ক অবনত হইয়া গেল; তখন মনোবৃত্তি কখনই উন্নত থাকিতে পারে না। দেহ পীড়িত কিম্বা অবসন্ন হইলে মনও তদ্রূপ হয়। যে পক্ষী উড়িতে অক্ষম হইল, যে সিংহ মৃগয়া করিতে অনভ্যস্ত হইল, যে মৃগ দৌড়াইতে অপারগ, তাহার মনও সেই পরিমাণে সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত হইয়া যায়। পক্ষী গগন মার্গে উড্ডীন হইয়া মুক্ত বায়ুতে, মুক্ত আকাশে, কত কি দেখিত, কত কত কি ভাবিত, কত আনন্দই উপভোগ করিত। পিঞ্জরাবদ্ধ সে সকল ভাব কোথায় পাইবে? সিংহ মৃগয়া কালে স্বাধীনভাবে যে উৎসাহ ও উত্তেজনা অনুভব করিত, আবদ্ধ হইলে তাহা কোথায়? স্বাধীন ভাবে আপন জীবন ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে দেহ ও মনের যেরূপ পুষ্টি সাধিত হয়, পরপুষ্টের তাহা হইতেই পারে না। জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিলে উত্তরোত্তর বুদ্ধি ও কৌশল, ধীরতা ও সাহস প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তি সকল যেরূপভাবে উৎকর্ষতা লাভ করে, তাহাতেই ক্রমশঃ মানসিক উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু এ সকল যদি অনাবশ্যক হইয়া পড়ে, তবে মস্তিষ্ক ক্রমে জড়তা প্রাপ্ত হয়; এবং মনও ক্রমে অধঃপাতে চলিয়া যায়। পরাপেক্ষীর দেহ ও মনকে অবনতির হস্ত হইতে রক্ষা করিবার উপায় নাই। কার্য্যের অকরণেই জড়তা; তাহা পরবশতার অনিবার্য্য ফল।

জীব-জগতে ইহা প্রমাণিত সত্য। মানব জীব-জগতের বাহির নহে। জীবতত্ত্বের নিয়ম সকল মানবে ও অন্য জীবে তুল্যরূপেই প্রযোজ্য। সুতরাং মানবও যখন স্বচেষ্টায় জীবনের (পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক) কার্য্য সকল করিতে ক্ষান্ত ও অনভ্যস্ত হইবে, তখন তাহার পক্ষেও অধঃপতন অনিবার্য্য। তাহার দেহ ও মন ক্রমে অবনত ও অবসন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। যিনি জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল পরের হস্তে ন্যস্ত করিবেন, তাঁহার কার্য্যকুশলতা লোপ হইবেই, বুদ্ধি বৃত্তি জড়ত্ব প্রাপ্ত হইবেই।

পিপীলিকা হইতে নবাব ওয়াজেদ আলী পর্য্যন্ত, পর-প্রত্যাশী হইলে সকলেরই মানসিক অবস্থা একরূপই হইয়া যাইবে। এক লাল পিপড়ার ভৃত্য কাল পিপড়া ছিল; কাল না খাওয়াইয়া দিলে, লাল পিপড়াটী মরিয়া যাইবে, তথাপি সম্মুখস্থ আহার স্বচেষ্টায় গ্রহণ করিবে না। পরিচর্য্যা পাইতে পাইতে লালটী স্বাবলম্বন হারাইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। তাই অধ্যাপক ওয়েয়ার বলিয়াছেন, পরাপেক্ষীর দেহের সহিত মনও অধঃ-

পাতে যায়।* মানবের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই সত্য।† পরাপেক্ষী প্রভু এবং পরবশ দাস উভয়ই তুল্যরূপে অধঃপতিত হইবে। পরবশতা কখনও বা দেহকে অগ্রে আক্রমণ করে, পরে মন অবসন্ন হয়; আর কখনও বা মনকেই প্রথমে অবসন্ন করে, পরে দেহের অবনতি উহা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু যে পথেই হউক, এ ফল হইবেই, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বরং অন্য জীবের অপেক্ষা মানবের অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই এই শোচনীয় অবস্থা উৎপন্ন হইবে, ইহা সাহস করিয়া বলা যায়। দৈহিক ও মানসিক স্বাবলম্বনই ইহার একমাত্র মহৌষধ। দেহ ও মন যুগপৎ এমতভাবে গড়িয়া উঠা আবশ্যক যে, জীবন-ব্যাপারের কোন অংশে অন্যের মুখাপেক্ষা করিতে না হয়। নতুবা অবনতি ও ক্রমে ধ্বংস আসিয়া উপস্থিত হইবেই। ইহা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন, জাতির পক্ষেও তেমনই সত্য, কারণ জাতি ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র, আর কিছুই নহে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইহা কখনই সম্ভব নহে; কারণ মানব নিজ নিজ কার্য্য নিজেই সম্পন্ন করিবে, পরপ্রত্যাশা করিবেই না, ইহা কখন হইতে পারে না। ঠিক; এ কথায় কোন আপত্তি নাই। মানব সমাজ-বদ্ধ-জীব, সুতরাং একে অন্যের শ্রমভার লাঘব করিবেই। নতুবা সমাজ চলিতে পারে না। কিন্তু সমাজের গঠন এইরূপ হওয়া আবশ্যক যে, উহা ব্যক্তির আত্মবশতার বিঘ্নজনক না হয়। যখন সমাজ ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য চেষ্টিত হয়, যখন ব্যক্তির মঙ্গল ও সমাজের মঙ্গল এক হইয়া যায়, তখন সমাজ ব্যক্তিত্ব বিকাশের বাধক ত হয়ই না, বরং বিশেষভাবে সহায়তা করে। এ সমাজ ব্যক্তির সহিত সমভাবাপন্ন। কিন্তু যখন কোন প্রতিকূল সমাজ ব্যক্তিত্বকে পদতলে চূর্ণ করিতে চাহে, তখনই ব্যক্তি ও সমাজে সংঘর্ষ উপস্থিত

---

* Here we have an example of degeneration in the mentality of an animal incident to the enervating influence of slavery.

Weir Dawn of Reason p. 156.

† The influence of slavery on the human race * * shows very plainly that man himself quickly (comparatively speaking) loses his stamina when subjected to it. This fact is but another proof of kinship in all animals, and the similarity, nay, the sameness of mind in man and the lower animals; mind is the same in kind, though differing in degree.

Ibid p. 157.

হয়। ব্যক্তি দুর্ব্বল, সমাজ প্রবল। এ নিমিত্ত ব্যক্তি পরাজিত হয়। তাহার ব্যক্তিত্ব নষ্ট করিয়া তাহাকে সমাজের মুখাপেক্ষী করিয়া তুলে। তখন সে প্রকৃত পরপ্রত্যাশী হয়। নিজের জীবনব্যাপারের প্রায় সমস্ত কার্য্যেই যদি ব্যক্তি সমাজ শক্তির দিকে তাকাইয়া থাকে, অথবা নির্ভর করিতে বাধ্য হয়, তখনই তাহার পরপুষ্টের ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন হয়; আর তখনই তাহার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে। যেমন সমাজ ব্যক্তিকে এই অবস্থায় আনিতে পারে, তেমনি এক সমাজও অন্য সমাজকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিতে পারে। তখনই উৎপীড়িত সমাজের পতনের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। এই অবস্থার প্রতিরোধ করিতে না পারিলে ব্যক্তিরও যেমন, সমাজেরও তেমনই, আত্ম-প্রতিষ্ঠার উপায়ান্তর নাই।

জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। চিরাতীত কাল হই-তেই এক সমাজ অন্য সমাজকে আত্মবশ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিয়া আসিতেছে। যখন এই শেষোক্ত সমাজ স্বাবলম্বন-পরায়ণ হইয়া প্রথমোক্তের উপর আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন তাহার আবার অভ্যুত্থান হইয়াছে, আর যখন প্রথমোক্ত সমাজ সর্ব্ব বিষয়েই শেষোক্ত সমা-জকে নিজের সম্পূর্ণ অধীন করিয়াছে, তপন সে স্বাবলম্বন হারাইয়া দেহে ও মনে একবারেই অধঃপতিত হইয়াছে। কখন বা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, কখন বা ধ্বংসের পথে যাইতে যাইতে প্রথমোক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ফলতঃ যদি এক সমাজ অন্য পরাক্রান্ত সমাজ কর্তৃক এরূপ ভাবে দলিত হয় যে, উহার কোন বিষয়েই স্ববশতা থাকে না, সকল বিষয়েই ঐ পরাক্রান্ত সমাজের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, তখনই উহার পরপুষ্টের ন্যায় দুর্দ্দশা আসিয়া উপস্থিত হয়। তদবধি সেই সমাজস্থ জনগণের দেহ ও মন ক্রমে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। জগতের ইহিহাসে এ দৃশ্য পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইয়াছে।

দেহ ও মনের শত্রু অনেক। আত্মবশতা গেলে অনেক শত্রুই আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের প্রধান শত্রু নিশ্চেষ্টতা ও নিরানন্দ। আত্মবশে সকল কর্ম্মেই জীবন্ত উৎসাহ ও নির্ভীকতা থাকে। সুতরাং মনও প্রফুল্ল থাকে। আর পরবশ হইলে ভয়ে ভয়ে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। কর্ম্মের সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকে না; প্রত্যেক কর্ম্মেই পরমুখাপেক্ষী হইতে হইতে মনের উদ্ভাবনী শক্তি ও উদ্যম একবারেই চলিয়া যায়। মন ক্রমে অবসন্ন হয়, দেহও দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তখন সে সমাজ ক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত

হইতে থাকে। অসভ্য সমাজের কথা আলোচনা করিতে মহাত্মা ডারুউইন এই বিষয় বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহারা পরাক্রান্ত বিজেতৃ সমাজের সংঘর্ষে একবারেই নির্ম্মূল হইয়াছে, অথবা হইতেছে। ইহার প্রধান কারণ "depression of spirits" অর্থাৎ মনের নিরুৎসাহ। (১) সভ্যাবস্থায় কোন অধীন সমাজ সহজে নির্ম্মূল হইতে স্বীকার করে না। তথাপি যখন সেই সমাজ আত্মবশে কোন গুরুতর কর্ম্মই করিবার সুযোগ ও ক্ষেত্র পায় না, তখন তাহার মন অবশ্যই অল্পাধিক জড়তাপ্রাপ্ত হইবেই ; দেহও অল্পাধিক অবসাদগ্রস্ত হইবেই।

বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশীয়গণের দেহ ও মনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। প্রায় প্রতি পল্লিতেই ম্যালেরিয়া কলেরা ইত্যাদি আপন ধ্বংসক্রিয়া বিস্তার করিতেছে। এই সকল, দূরবর্ত্তী বিভিন্ন জাতীয় মানব সমাগম জনিত নবাগত পীড়া। আয়ুর্ব্বেদে ইহাদিগের উল্লেখ নাই। গত ১৯০৬ সালে বাঙ্গালা দেশে সর্ব্ব প্রকারে ১১৩২৫৭৯ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল ; তাহার মধ্যে শতকরা ৬২·২৯ জন কেবল জ্বর রোগেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। জন্মের সংখ্যা ১৯০৫ সালে সহস্র জনে ৩৯·৫৫ ছিল ; কিন্তু ১৯০৬ সালে ৩৭·২ হইয়া গিয়াছে। তবেই দেখা গেল যে, জন্মের সংখ্যা কমিতেছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে যাহারা মরে, তাহাদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যাহারা বাঁচে, তাহাদিগের অবস্থা কিরূপ দেখা যায় ? তাহারা প্লীহা ও যকৃতে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় জীবন যাপন করে। ইহাদিগের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির দ্বারা সমাজের কোন গুরুতর কার্য্যই হওয়া সম্ভবপর নহে। তারপর, আর এক কথা। ম্যালেরিয়া জ্বরের শক্তিই এই যে, উহাতে অপত্যোৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে। (২) তবেই জন্মের সংখ্যা কমিতেছে এবং আরও কমিবার আশঙ্কা আছে। পক্ষান্তরে, এতদ্দেশে মৃত্যুর সংখ্যা উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি হইতেছে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণ প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। প্রতি গ্রামে গ্রামে দেখিলেই বুঝা যায়, ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতীয়গণ প্রায় মরিয়াই গেল। যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহারাও অন্নাভাবে ও পীড়ায় মৃতবৎ হইয়া গিয়াছেন। আর সে পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ

(১) Descent of Man (1900) Ch VII. part I. p. 285—286.

(২) Inhabitants of districts subject to malaria are apt to be sterile. Macnamara quoted in Descent of Man. P. 292.

নাই; আমোদ ক্রীড়া কৌতুক, গান বাজনা, আনন্দ উৎসব প্রায় কিছুই নাই। Depression of spirits, অর্থাৎ মনের অবসন্নতা প্রায় সম্পূর্ণ রূপে হইয়াছে। তাহার উপর এতদ্দেশীয়গণের কতিপয় সামাজিক দুর্নীতি, এই মরণের খেলা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। এই বাল্য-বিবাহ—কত মৃত্যুর জন্যই যে এই প্রথা দায়ী, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহাতে সন্তান অল্পায়ুঃ হয়, এবং বাল্যবিবাহিত নর-নরীও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।* কর্ম্মে উৎসাহ নাই, কর্ম্মক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ; সর্ব্ব কর্ম্মই পরায়ত্ব; সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, এমন কি, অনেক পারিবারিক কর্ম্মও স্ববশে নাই। সুতরাং মনের নিষ্কর্ম্মা ভাব হইতে জড়তা ও অবসাদ অবশ্যই আসিবে এবং প্রকৃতপক্ষেও আসিয়াছে। তাহার পর দেহ নানারূপ পীড়ায় অবসন্ন ও মৃতপ্রায়। জন্মের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতেছে; মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার পরিণাম কি? দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত। আর বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমাদিগের চরিত্রবল, নীতি-বল, ধর্ম্ম-বলও পরবশতায় অনেক শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। মানবসমাজের উন্নতির প্রধান কারণ এই সকল।† জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে; সমাজস্থ জনগণের শরীর ও মন প্রফুল্ল এবং সুস্থ থাকিবে; তাহাদিগের আবশ্যকীয় সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম আত্ম-বশে থাকিবে; তাহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে অলঙ্কৃত হইবে এবং ধর্ম্মবলে ও চরিত্র-বলে বলীয়ান হইবে,—ইহাই জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ ও লক্ষণ। এই সকল গুণ না থাকিলে কোন সমাজ উন্নত হইতে পারে না। এ সকল গেলে পরিণাম ফল কি? এ প্রশ্নের উত্তর অতীব সহজ। উত্তর—ধ্বংস। কিন্তু সভ্য মানব কখনও ধ্বংসের মুখে সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করে নাই। জগতের ইতিহাসে কি এতদ্দেশেই এই ধ্বংস লীলার প্রথম অভিনয় হইবে? তাহা হইতেই পারে না। ইহার একমাত্র মহৌষধ, আত্মবশতা। জাতীয়-জীবন ব্যাপারের কর্ম্ম সকল স্ববসে আনিতেই হইবে। তাহা হইলেই মনের

---

* With women, marriage at too early an age is highly injurious, * * * The mortality also of husbands under twenty is excessively high.

Descent of Man, p, 213—214,

† We can only say that it (progress) depends on an increase in the actual number of the population, on the number of men endowed with high intellectual and moral qualities as well as on their standard of excellence. Ibid p, 216,;

জড়তা বিদূরিত হইবে। তাহা হইলেই সামাজিক চেষ্টা ও উদ্যম আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে। দেহের প্রফুল্লতা ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে। চরিত্রবল ও ধর্ম্মবল স্বাবলম্বনের মূল। পরমুখাপেক্ষীর এ সকল কিছুই থাকে না।

কিন্তু স্বাবলম্বন চেষ্টা সাপেক্ষ। কেবল বুঝিলে হইবে না; চেষ্টা আবশ্যক। কর্ম্ম কিরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বিবেচ্য। কর্ম্ম ভাবের দাস। যেখানে একাগ্রভাব আছে, সেখানে কর্ম্ম হইবেই। ভাব না থাকিলে কর্ম্ম থাকে না। সমাজ মধ্যে ভাবের বিস্তৃতি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; কর্ম্ম তাহার অনিবার্য্য ফল।* কোন বাধাই তাঁহাকে নিবারণ করিতে সক্ষম হয় না। কোন সমাজে কর্ম্ম প্রতিহত হইতেছে, দেখিলেই বুঝিতে হইবে, সে সমাজে ভাবের বিস্তৃতি হয় নাই। ভাবের বিস্তৃতিতেই কর্ম্ম; কর্ম্মই স্বাবলম্বনের মূল এবং স্বাবলম্বনই ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতির একমাত্র কারণ। আত্মবশ না হইলে জগতে সে জীবের স্পন্দন নাই। তাই ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।

যাহা চাই, কর্ম্মকে সেই পথে চালিত করিতেই হইবে। নচেৎ জাতীয় অধঃপতন কখনই নিবৃত্ত হইবে না, ইহা নিশ্চিত। যে প্রতিকূল সমাজ অপর সমাজকে দলিত করে, স্বাবলম্বন হইতে চ্যুত করে,—হয় তাহাকে আত্ম-অনুকূলে আনিতে হইবে, নতুবা তাহার উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহা কালসাপেক্ষ, কিন্তু ইহাই আত্মবশতার মূল সূত্র। ঐ প্রতিকূল সমাজ শেষোক্ত সমাজের অনুকূল হইলে, তাহার আত্মবশতার বিঘ্ন উৎপাদন না করিলে, উভয় সমাজই এক ভাবাপন্ন হইয়া যায়। তখন পরস্পর পরস্পরের উন্নতির সহায় স্বরূপ হয়। কিন্তু এই অবস্থা সহজে আশা করা যায় না। এই নিমিত্তই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদিগের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। লক্ষ্য সেইদিকেই থাকে, পরে ঘটনা চক্রে সামাজিক বিবর্ত্তন ঈপ্সিত পথে স্থায়ীত্ব লাভ করে। ইতিহাস ও বিজ্ঞান ইহা ভিন্ন অন্য কোন পথ জানেনা; অন্য কোন উপদেশ দেয়ও না। ইহাই প্রথম কথা, ইহাই শেষ কথা।

এই কথাই অন্য ভাবে বিবেচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। জীব-রাজ্যে পরবশতার যে শোচনীয় ফল, তাহা দেখিলাম। ইহাতে কি

---

* Wherever puplic opinion is strongly roused, it will lead to action. Galton's Probability, the foundation of Eugenics, p, 29.

উদ্ভিদ কি জন্তু, সকলেরই দেহ ও মন উভয়ই অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে লতা স্বচেষ্টায় জীবন ধারণ করে, সে পত্রপুষ্পে সুশোভিত; যে লতা পরপুষ্ট, তাহার প্রায়শঃ এ সকল কিছুই থাকে না; তাহার দেহ ক্ষীণ এবং শীর্ণ। যে জন্তু স্বাবলম্বী, তাহার দেহ ও মন পুষ্ট; কিন্তু পরপুষ্ট জন্তুর হস্ত, পদ, মুখ, উদর, স্নায়ু, শিরা, মস্তিষ্ক সকলই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। (১) পরপুষ্টের এতই মানসিক অবনতি হয় যে, তাহার আহার-গ্রহণ-বৃত্তি এবং বংশরক্ষণ বৃত্তিও পরিণামে লোপ হইয়া যায়। (২) দেহের সহিত মনের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ,তাহাতে দেহ অবসন্ন ও ধ্বংসাভিমুখ হইলে মন অবসন্ন হইবেই। এ সকল আমরা পূর্ব্বেও দেখাইয়াছি। জীববিজ্ঞানের ইহা বহু প্রমাণিত সত্য, মানব-ইতিহাসের ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা। আত্মবশতা গেলে অধঃপতন অনিবার্য্য। (৩) পরবশতার প্রতি বিধাতার অভিসম্পাত আছে। ইহাতে প্রথমতঃ প্রাপ্ত বয়স্ক জীবের অধোগতি হয়, পরে তাহার বংশশ্রেণীও অধঃপাতে চলিয়া যায়। (৪) যে পরবশ ও যে অপরকে পরবশ করে, উভয়ই ক্রমে ক্রমে দৈহিক ও মানসিক দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হয়। অন্য জীব অপেক্ষা মানব অধিকতর দ্রুতবেগে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানব অধিকতর পরিবর্ত্তনশীল, তাই যেমন অন্যাপেক্ষা অল্প সময়ে উন্নতি লাভ করে, তেমনই অল্প কালেই অবনতিও প্রাপ্ত হয়।

দেহ ও মন অবসন্ন হইলেই অবনতি। কিন্তু দেহ ও মনই মানবের ধর্ম্মসাধনের উপায়, তাহার আর কোন সম্বল নাই। মানবজীবনের প্রধান কর্ম্মই ধর্ম্মসাধন,অন্য সকলই তাহার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান মাত্র। পরিবার, সমাজ,রাজ্য

---

(১) Ray Lankester, Degeneration P, 33,

(২) Ency. Brit. 9 Ed, Vol, 18, P, 268,

(৩) আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ব্রিটিশ-শাসিত ক্যানাডার প্রতি লক্ষ্য করুন। যুক্তরাজ্য স্বাবলম্বী, ক্যানাডা একাংশে পরাপেক্ষী। উভয়েরই পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমান,অধিবাসিগণও প্রায় সমশ্রেণীর, দেশদ্বয়ও পরস্পরের নিকটবর্ত্তী। তথাপি যুক্তরাজ্য সভ্যতায় ও কর্ম্ম-কুশলতায় কত উচ্চ; ক্যানাডা তাহার কত নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে!

(৪) So it is not only amongst men that there is a curse upon slavery, even animals become degraded by it * * * Retrogression in an organ which degenerates from disuse, takes place first in the mature stage, and does * * extend to the embryogenic stage * * much later,

Weismann's Heredity, Vol II, p 27-28,

—যাহা কিছু বল, সকলই মানবের ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত। এতদ্দেশে এ তত্ত্ব এত প্রাচীন যে, ইহার পুনরাবৃত্তি নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। অন্যান্য দেশেও এ তত্ত্বের এক্ষণে ক্রমে উপলব্ধি হইতেছে। ধর্ম্মসাধনই যখন মানবজীবনের একমাত্র কর্ম্ম, ধর্ম্মসাধনই যখন মানবজন্মের একমাত্র সফলতা, তখন দেহ-মনের সম্পূর্ণ অবসাদক পরবশতা ধর্ম্মবিরোধী; ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুস্থ ও সবল দেহ, দীর্ঘ-আয়ু, ক্ষোভহীন প্রশান্ত, নির্ম্মল মন—এ সকল না থাকিলে ধর্ম্মসাধন হইতেই পারে না। যাহার দেহ রুগ্ন, মন উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তায় অভিভূত, ধর্ম্মসাধন তাহার অসম্ভব। তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ, ধীসম্পন্ন মনীষিগণ ইহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই পুনঃপুনঃ উপদেশ করিতেছেন। কবি বলিতে-ছেন, শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং, শরীরই প্রধান ধর্ম্মসাধন। শ্রুতি বলিতেছেন, স যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বলস্যগতং তত্রাস্য......। (১) যিনি বলকে ব্রহ্মরূপে জানিয়া উপাসনা করেন, যাবতীয় পদার্থই তাঁহার বলগত হয়। বলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে। দৈহিক ও মানসিক বল পৃথক নহে; বল এক, বল অদ্বিতীয়। সেই এক শাশ্বত মহাশক্তি জগতের ধারক। ইহাকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করিবে। বলকে বিস্মৃত হইলে কোন ব্যক্তিই, কোন জাতিই, কোন সমাজই অধঃপতন হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। দেহের বল, মনের বল, দুই-এ সমন্বয় করিতে হইবে। বরং দেহের বল অপেক্ষা মনের বলই শ্রেষ্ঠ। (২) মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন, বলদ্বারা স্বর্গরাজ্য অধিকার করা যায়। (৩) কিন্তু সে অধর্ম্ম-মূলক বল নহে; বলকে ব্রহ্মবোধে আপনার অঙ্গীভূত করিতে হইবে। নচেৎ অধঃপতন অনিবার্য্য।

বলহীন পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে না, সে ধর্ম্মে পতিত; এ মর্ত্ত্য-জগতেও বলহীনের স্থান নাই। যে জাতি ক্রমে রুগ্ন, দুর্ব্বল ও জীবন্মৃত হই-তেছে, সে জাতি ধর্ম্মে পতিত। যাহার মনে হর্ষ নাই সে জাতি তিষ্ঠিতে

(১) ছান্দোগ্য ৭।৮।২

(২) মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া। (ধম্মপদ) মনঃ পূর্ব্বঙ্গমাঃ ধর্ম্মা মনঃশ্রেষ্ঠাঃ মনোময়াঃ। অর্থাৎ মনই ধর্ম্মসমূহের শ্রেষ্ঠ; ধর্ম্ম মনোময়।

(৩) And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of Heaven suffereth violence, and the violent take it by force,

Matthew Ch. 11, 12.

পারে না। (৪) মানবের কথা দূরে থাকুক, বৃক্ষলতাদিও হর্ষে জীবন ধারণ করে। স এষ (বৃক্ষ) * * * * * মোদমানস্তিষ্ঠতি।" (৫) যাহার জাতীয় জীবনে আনন্দ নাই, জাতীয় ক্রীড়াকৌতুক নাই, রোগে শোকে যে জাতি প্রায় শয্যাগত (৬) যাহাদিগের সহস্র সহস্র ব্যক্তি বর্ষে বর্ষে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, যাহাদিগের জন্মসংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই ধর্ম্মে পতিত। ধর্ম্মই ধরাধারক। সুতরাং এই ধ্বংসাভিমুখ-গতি প্রতিরোধ করিতে না পারিলে ধরিত্রী তাহাদিগকে বহু দিন ধারণ করিবেন না, ইহা নিশ্চয়।

সকল ধর্ম্মের সার উপদেশ আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে জানাই বন্ধন-মুক্তির এক মাত্র উপায়। কি ঐহিক কি পারত্রিক, সর্ব্বত্রই আপনাকে জানিতে পারিলে, প্রকৃত রূপে আপনাকে চিনিতে পারিলেই মনুষ্যত্বের সফলতা। অন্য জীবেরও তাহাই। যে হস্তীকে এক সামান্য বালক অঙ্কুশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া আজ্ঞাবহ করিতেছে, সে আপনাকে চিনে না। যে মুহূর্ত্তে সে আপনাকে চিনিতে পারে, ঐ বালকের ন্যায় শত শত বালকের সাধ্যও নাই যে, আর তাহাকে তিলার্দ্ধও পরবশে রাখিতে সক্ষম হয়। যে মানব নীচ-প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়া ঘৃণ্য পতিত জীবন যাপন করিতেছে, সে যে মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারে যে, সে-ই শুদ্ধমুক্ত নিত্য বস্তু, তন্মুহূর্ত্তেই তাহার প্রবৃত্তির দাসত্ব-শৃঙ্খল খসিয়া পড়ে। জীব জগতে যে দিকেই দেখ, ঐ এক কথা,—আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে চিনিতে পারিলেই সব হইল। কিন্তু যে পরবশ, যাহার দেহ ও মন পরবশতার ফলে অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে, সে আপনাকে চিনিবে কেমন করিয়া? সে যে অমৃতের অধিকারী, সে যে নিত্য মুক্ত, তাহা সে বুঝিতেই পারে না, তাহা সে জানিতেই পারে না। যে পরবশ, সে ভয়ে ভয়ে আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে; তাহার আত্মার বিকাশ হইতেই পারে না। কর্ম্ম করিতে করিতেই স্বাবলম্বনবৃত্তি জাগিয়া উঠে। যাহার কর্ম্মক্ষেত্র প্রায় নাই বলিলেই হয়, যাহার জাতীয় জীবনের কর্ম্ম সকল প্রায় সম্পূর্ণ পরায়ত্ত, সে জড়, সে ধ্বংসাভিমুখ। (৭) তাহার দৈহিক ও মানসিক বিকাশ

---

(৪) Descent of Man Part I, Ch VII, P 285-6

(৫) পূজ্যপাদ ভাষ্যকার বলিতেছেন "স এস বৃক্ষ * * * মোদমানো হর্ষং-প্রাপ্নুবং স্তিষ্ঠতি।" সেই বৃক্ষ * * আমোদ সহকারে জীবিত রহিয়াছে। ছান্দোগ্য ৭।১১।১

(৬) পল্লীতে প্রায় আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত একজ্বর রোগেই।

(৭) Descent, Part I, Ch VII, P 283.

হইবার উপায় নাই। তাই সে আপনাকে প্রকৃত পক্ষে চিনিতেই পারে না। সে একবার প্রবৃত্ত হইলে যে কর্ম্ম অনায়াসে করিতে পারে, তাহা সে চিন্তা করিতেও বিভীষিকা দেখে; আর আপনার অক্ষমতা কল্পনা করিয়া নিরুদ্যম হয়। আপনাকে সে প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাস করিতে জানে না। তাহার আত্ম-প্রত্যয় নাই। যে বিশ্বাসী, যাহার কণা মাত্রও আত্মপ্রত্যয় আছে, সে মুহূর্ত্ত মধ্যে পর্ব্বত উড়াইয়া দিতে পারে; তাহার কিছুই অসম্ভব নাই। (১) সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালে মনীষিগণ এই কথাই বলিতেছেন। আত্ম-প্রত্যয়, আত্ম-জ্ঞান থাকা চাই, নচেৎ জীবের ধর্ম্মহানি হয়। পরপুষ্টের আত্ম-প্রত্যয় থাকিতেই পারে না; কারণ তাহার দেহ ধ্বংসাভিমুখ, মন অবসন্ন। সুতরাং পরপুষ্টের জগতে স্থান নাই, তাহাকে ধরিত্রী ধারণ করেন না, তাহার বৃথা ভার তিনি বহন করেন না। ধর্ম্মোধরাধারকঃ; যাহার ধর্ম্মহানি হইল, তাহাকে ধারণ করিবে কিসে? তাই সে নির্ম্মূল হয়। আত্ম-প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর জয়ী হইতে না পারিলে, পরিণামে ধ্বংসের মুখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়ান্তর নাই। যদি কোন জাতিকে দেহে ও মনে অবসন্ন দেখা যায়; আর সেই অবসন্নতা, সেই জড়তা, সেই কর্ম্মহীনতা হইতে ক্রমে ধর্ম্ম-হানি হইতে থাকে, তবে তাহার পরিণাম বুঝিতে আর বাকী থাকে না। তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইলে দেহের ও মনের, বিশেষতঃ মনের বলে বলীয়ান হইতে হইবে, কারণ "বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি * * * বলেন লোকস্তিষ্টতি, বলমুপাস্বেতি।" (২) বলের সাধনা করিতে হয়। ইহারই মহিমায় ধর্ম্মহানি হইবার পর আবার যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইতেছে। ইহাই জীবকে স্ব-ভাবে স্ব-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। জগতের কর্ম্ম-মঞ্চে এ অভিনয় পুনঃ পুনঃ হইয়াছে। ইহার সাধন দেহ ও মন, বিশেষতঃ মন। মন সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক ইন্দ্রিয়। যাহারা ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় ধ্বংসাভিমুখগতি প্রতিরোধ করিবে, তাহাদিগকে মনের আজ্ঞাবহ হইতে হইবে। (৩) মন, সঙ্কল্প করিবে, বুদ্ধি তাহার(৪) দাসের ন্যায় উপায় উদ্ভাবন করিবে, চিত্ত তাহাকে আত্মসাৎ করিবে, সফলতার পূর্ণমূর্ত্তি আপনাতে অঙ্কিত করিয়া লইবে, অহং

---

(১) Matthew I7, 23.

(২) ছান্দোগ্য ৭।৮।১

(৩) এই নিমিত্তই মনকে বংশানুক্রমে নির্ম্মলভাবে গড়িয়া তুলিতে হয়।

(৪) সঙ্কল্পের।

জ্ঞান পরিপূর্ণ হইবে, তখনই কর্ম্মের পূর্ণ সফলতা ; তখনই মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, এই চতুষ্টয় মিলিয়া জীবকে আত্ম প্রতিষ্ঠিত করিবে। ইহারই নাম একাগ্র সাধনা। ইহাতে তিলমাত্র পশ্চাৎপদ হইলেও ধ্বংস হইতে অব্যাহতি নাই। পণ্ডিত রে ল্যাঙ্কেষ্টার সত্যই বলিয়াছেন, মানব প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান। (১) মানবকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, এই নৈতিক বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে হইবেই। আত্মপ্রতিষ্ঠার ইহাই একমাত্র উপায়। যে পরবশ, তাহার আত্মরক্ষার ইহাই একমাত্র পন্থা। এ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবেই। বর্ত্তমান অবসন্নতার পদে অবনত মস্তকে আপনাকে ঢালিয়া দিলে কিছুই হইবে না ; তাহার প্রতিকূল কর্ম্ম করাই যথার্থ ধর্ম্ম। (৫) জড় প্রকৃতির সম্বন্ধে ইহা যেমন সত্য, সমাজবদ্ধ জীবের সম্বন্ধেও তদ্রূপই। আত্ম-প্রতিষ্ঠাই এ যজ্ঞের মূলমন্ত্র। পরবশতায় অবসাদ,অবসাদে ধ্বংস ; আত্ম-প্রতিষ্ঠাই একমাত্র মহৌষধ। জীবের ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" এই মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। বলহীন মুক্তির অধিকারী হয় না। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এক-বাক্যে বলিতেছেন, পরবশতার ফল অবসাদ। ইহাকেই ভগবদ্গীতাতে ক্লৈব্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই ক্লৈব্য পরিহার না করিতে পারিলে ধর্ম্মহানি অনিবার্য্য। মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়, নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং তক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥* উত্তিষ্ঠ অর্থে কর্ম্ম করা। ক্লৈব্য পরিহারের একমাত্র উপায়ই কর্ম্ম করা। বিধিসম্মত কর্ম্ম করিতে করিতেই ক্লৈব্য দূর হয়, হৃদয়ে বল সঞ্চার হয়। তাই বলকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করিতে হইবে। নতুবা কর্ম্মে একাগ্রতা, তন্ময়তা হয় না। কিন্তু বিধিসম্মত উপায় কি ? যাহা চাও, তাহার উপযোগী উপায়ই বিধিসম্মত উপায়। জীব চায় কি ? জীবের একমাত্র লক্ষ্যই মুক্তি। যাহার হৃদয় ক্ষুদ্র, সে অনন্তের অধিকারী হইবে কেমন করিয়া ? পরবশতায় হৃদয়ের বিকাশ নাই, তাই হৃদয় ক্ষুদ্র হইয়া যায়। হৃদয়ের ক্ষুদ্রত্ব, হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য ধ্বংসের পূর্ব্বগামী, ইহাদিগের ফল ধ্বংস। যে পরবশ সে নিরানন্দ, তাহার হৃদয়ে আনন্দ থাকে

(১) Man is natures' rebel, * * her insurgent son. Nature & Man, p, 22-23

(৫) The truest piety ssems to me to reside in taking action and not in submissive acquiescence to the routine of Nature,

Galton, The Herbert Spencer Lecture, 1907, p, 9

* ভগবদ্গীতা ২।৩।

না, তাহার কর্ম্মে উৎসাহ থাকে না। তাই মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করে। ট্যাস্‌ম্যানিয়ার আদিমনিবাসিগণ যখন ইউরোপীয়দিগের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কত চেষ্টা করা হইল, তাহাদিগের সহিত কত সদ্ব্যবহার করা হইল, তাহাদিগকে কত স্বাস্থ্যকর স্থানে রখা হইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইল না। তাহাদিগের মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, দেহ ভাঙ্গিবেইত। প্রথমে তাহাদিগের বংশহানি হইতে আরম্ভ হয়, পরে তাহারা নির্ম্মূল হইয়া গেল। তাহারা স্ববশে থাকিলে ধনে বংশে বাড়িয়া উঠিত, মৃত্যুর মুখ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত। আত্মবশতা হারাইয়া তাহারা সব হারাইল। আজি জগতে তাহারা কথামাত্রে পরিণত হইয়াছে। (১) ইউরোপীয়গণ পশু শিকার করার ন্যায় ট্যাসম্যানিয়দিগকে শিকার করিয়াছিল; কিন্তু তখনও তাহারা নির্ম্মূল হয় নাই। হা ভগবান্, মানুষে কি মানুষ শিকার করে !! কিন্তু তখনও আত্মবশতা ছিল, তাই তাহারা নির্ম্মূল হয় নাই। পরে যখন তাহারা ইউরোপীয়গণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন আর জগতে তাহাদিগের স্থান হইল না। শিকারাবশিষ্ট ১২০ জন ৩৭ বৎসরেই নির্ম্মূল হইয়া গেল। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, নিরানন্দ, depression of spirits. আমাদিগের কি হইতেছে? একবার চক্ষু তাকাইয়া দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। নিরানন্দ আমাদিগকে মসিম্লান আবরণে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সেই সে কালের গ্রাম্য ক্রীড়া কৌতুক কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে; সেই নৃত্যগীত, যাত্রা মহোৎসব, আর এতদ্দেশকে নিত্য মুখরিত করে না। উচ্চ হাস্য আজি ক'জনের মুখে শুনা যায়? সকলই যেন নীরব। সকলের মুখেই যেন এক অস্বাভাবিক

---

(১) After the famous hunt by all the colonists * * * they consisted only of 120 individuals, who were in 1832 transported to Flinders Island * * * It seems healthy and the natives were well-treated. Nevertheless they suffered greatly in health. * * * "If left to themselves to roam as they were wont and undisturbed, they would have reared more children and there would have been less mortality. * * * The births have been few and the deaths numerous. This may have been in a great measure owing to their banishment. * * * and *consequent depression of spirit.*

Descent of Man (1906) p 284—286.

বিষাদ-রেখাপাত হইয়া গিয়াছে। প্রফুল্লবদন প্রায় কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না। শিশুগণও প্রথম পাঠ হাতে করিয়া গম্ভীরভাবে পত্রলগ্ন-দৃষ্টি হইয়া বসিয়া থাকে। সেই দৌড়াদৌড়ি, গাছে উঠা, এগুলি যেন শিশুগণও ভুলিয়া যাইতেছে, কারণ তাহাকে 'পড়া করিতে হইবে।' এ সকল দেখিলে কি মনে হয়? আনন্দ গেলে আর থাকে কি? যে দেশে নিত্য দুর্ভিক্ষ, যে দেশ নানাবিধ রোগের আবাসভূমি হইয়া উঠিল, সে আনন্দ কোথায় পাইবে?

পীড়া যত কারণেই হউক, তাহার মধ্যে নবাগত মানবসংসর্গও একটী প্রধান কারণ। যখন কোন দেশে অন্যত্র হইতে নূতন মানবের সমাগম হয়, তখন কি এক অদ্ভুত কারণে নূতন নূতন পীড়াও আসিয়া উপস্থিত হয়। পণ্ডিত স্প্রোট ভ্যাঙ্কুবর দ্বীপের আদিমনিবাসিগণের বংশক্ষয় হইবার কারণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,ঐ দ্বীপে ইউরোপীয়গণের নবসমাগমে আদিমবাসীদিগের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; তাহাদিগের সমাগম বশতঃ অনেক অস্বাস্থ্য উৎপন্ন হইল; তাহারা নবাগতদিগের সংশ্রবে হতবুদ্ধি হইয়া গেল; কর্ম্মে প্রবৃত্তি-হীন হইয়া উঠিল; পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া গেল, অথচ নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে উন্মুক্ত হইল না—এই সকল কারণ বশতঃ তাহারা নির্ম্মূল হইয়া গেল। (১) ডারুইন্ বলেন, দূরবর্ত্তী পৃথক জাতীয় মানবের পরস্পর সম্মিলনে পীড়া উৎপন্ন হয়; ইহার কারণ সর্ব্বস্থলে সুবোধ্য নহে, কিন্তু ইহা সত্য। (২) এতদ্দেশে ম্যালেরিয়া কি পূর্ব্বে ছিল? বোধ হয় না। আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া, প্লেগ, অথবা কলেরার উল্লেখ নাই। এ সকল সম্ভবতঃ নবাগত পীড়া। কিন্তু নবাগত পীড়াও তাহার মারাত্মক শক্তি সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইত না, যদি দেহে পুষ্টি থাকিত, উদরে অন্ন থাকিত, মনে আনন্দ থাকিত। আমাদিগের এ সকলের যে কিছুই নাই। আমরা বাঁচিব কেমন করিয়া? বলিয়াছি ত গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় মানুষ মরিয়া কেমন উজাড় হইয়া গেল; বহুপল্লী কেমন নিবিড়

(১) Mr. Sproat who in Vancuver Island closely attended to the subject of extinction believed that changed habits of life, consequent on the advent of Europeans induces much ill health. He lays also great stress on the apparently trifling cause that natives become bewildered and dull by the new life around them; they lose the motives for exertion and get no new one's in their place.

Descent of Man, p 283.

(২) It further appears, mysterious as is the fact, that the first meeting of distinct and separated people generates disease. Ibid p 283

জঙ্গলে পরিণত হইল। হিন্দুর সংখ্যা কেমন নিত্যই ক্ষয় হইয়া উঠিল,—এ সকল কি অকারণ? তাহা কখনই হইতে পারে না। নব সমাগমের ফলই এইরূপ, পরবশতার পরিণামই এই; এ কথা জীববিজ্ঞান মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে। মনু বলিয়াছেন, সর্ব্বং পরবশং দুঃখং। বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র সমস্বরে যে তত্ত্ব বিঘোষিত করিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে। করিলে, তাহার ফল ধ্বংস।

জাতীয় আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন মানবের ধ্বংসের এক সাংঘাতিক কারণ। যে জাতি চিরাতীত কাল হইতে যেরূপ আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া পুষ্ট হইয়াছে, তাহার দেহ ও মন সেই ভাবে গঠিত হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তন হইলে ঐ জাতি তাহা সহ্য করিতে সক্ষম হয় না। ঐ পরিবর্ত্তন সাক্ষ্যাৎ স্বরূপ কু-ফলপ্রদ না হইলেও উহার দূরবর্ত্তী ফল অতীব মারাত্মক। ইহাতে স্বাস্থ্যক্ষয় ও বংশলোপ হইয়া যায়। ডারুইন বলেন, বালকদিগের মধ্যে ইহার বিষময় ফল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপে দৃষ্টিগোচর হয়। (১) বালকই ভবিষ্যৎ সমাজ। সুতরাং ইহার ফল ভবিষ্যতে ধ্বংশের পথ স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য, এতদ্দেশে শিশু-মরণ অত্যন্ত অধিক। জাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে চিরাগত আচার ব্যবহার সহজে পরিবর্ত্তন করা যায় না। যাহা আপনার তাহা ভাল, যে আপনার সে ভাল—ইহাই এক্ষেত্রে রক্ষা পাইবার মূলমন্ত্র। কবি বলিতেছেন, নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা। ইহা একটী বৈজ্ঞানিক সত্য। ইহা কেবল কবি-কল্পনা নহে, ইহাই কঠোর সত্য। যে জাতি এ মন্ত্র ভুলিয়া যায়, সে সত্যভ্রষ্ট। সুতরাং রক্ষা হইবে কিসে? আহার, পরিচ্ছদ; উৎসব, আনন্দ,—সকল বিষয়েই জাতীয়তা রক্ষা করা আবশ্যক। নতুবা আয়ুঃক্ষয় হয়, (২) বংশবৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়।

---

(১) The most potent of all the causes of extinction appears in many cases to be lessened fertility and ill health, specially amongst the children arising from changed condition of life, *notwithstanding that the new conditions may not be injurious in themselves.* Ibid p 284.

Mere alterations in habits which do not appear injurious in themselves seem to have this same effect; and in several cases, children are particularly liable to suffer. Ibid p 291.

(২) The maoriese attributs their decadence in some measure to the introduction of new food and clothing and the attendant change of habits. It will be seen that they are probably right. Ibid 287.

আমরা দেখিলাম, পরবশতার ফল অবসাদ। তাহাতে নিরানন্দ আনয়ন করে, অন্নকষ্ট উপস্থিত করে, বিবিধ পীড়া উৎপন্ন করে, শারীর-যন্ত্র সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে পরবশ বিশ্ব হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। আত্ম-বশতাই এ পরিণামের একমাত্র প্রতিরোধক। কিন্তু তাহাত কথায় আসে না; উপযোগী কর্ম্ম চাই। কর্ম্মের পূর্ব্বাবস্থা ভাব; সুতরাং ভাবের উত্তেজনা না হইলে এ শ্রেণীর কর্ম্ম হইতেই পারে না। যে জাতি জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে ভাবের উত্তেজনায় আন্দোলিত হইতে হইবেই। কর্ম্ম তাহার অনিবার্য্য ফল। (১) ভাব যথাযথ রূপে উত্তেজিত হইলে, কর্ম্ম আসিবেই। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সেই কর্ম্ম ক্ষণিক চেষ্টায় পরিণত না হয়। উহার স্থায়ীত্ব বিধান করা অত্যাবশ্যক। হেকেল বলিতেছেন, ভাব সাধারণতঃ বংশগত, কিন্তু প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের ভাব পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে উপস্থিত সময়ে নিয়মিত হয়। (২) আমাদিগের বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি? এ সময়ের উপযোগী করিয়া ভাবকে নিয়মিত করিতে হইবে। ডারুইন্-প্রমুখ জীবতত্ত্ববিৎগণ বলেন, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও বন্ধ্যত্বই জাতীয় বিলোপের প্রধান কারণ, হয়ত একমাত্র কারণ। ইহাদিগকে নিবারণ করিতে হইবে। হিন্দুর বংশপরম্পরাগত নিয়ম অনুসারে যত কিছু বিধান প্রচলিত আছে, প্রায় সকলই স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল। বিধি-নিয়মের মধ্যে এই বিষয়কে এত প্রাধান্য, বোধ হয়, আর কোন জাতিই দেয় নাই। এ সকলকে কদাচ উপেক্ষা করিতে হইবে না। গ্রামে গ্রামে নানাবিধ পীড়ার বীজ যাহা নিহিত আছে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহার অনুসন্ধান ও প্রতিরোধ করিতে হইবে। সুস্থ, সবল দেহ সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তারপর বংশ। এই ধ্বংসাভিমুখ জাতির বংশবৃদ্ধি হইবার বহু বিঘ্ন রহিয়াছে। ব্যক্তিগত বিঘ্ন ত আছেই, তাহার উপর আবার জাতীয় বিঘ্ন। এই দরিদ্র দেশে ধন-গৌরবের উপর বিবাহ-গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইলে আমরা বাঁচিব কেমন করিয়া?

---

(১) Whenever public opinion is roused, it will lead to action.

Nature, June, 13, 1907.

(২) The character of the inclination was determined long ago by heredity from parents and ancestors; the determination to each particular act is an instance of adaptation to the circumstances of the moment.

The Riddle of the Universe, 1907 p 47

জানি, বাল্য-বিবাহ বংশক্ষয়কর; (১) জানি, এই সামাজিক কুপ্রথা মরণের খেলা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। জানি, কত পরিবারে বিধবামাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু আমরা নিশ্চেষ্ট। জানি, বিবাহ-ক্ষেত্রে এক রক্তমাংস পুনঃ পুনঃ সম্মিলিত হইলে অপত্যে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে; তাই জীবরাজ্যে অন্ততঃ সময়ে সময়ে, নূতন রক্তমাংসের সহিত মিলিত হওয়া বলসঞ্চয়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এ সকল বৈজ্ঞানিক কথা জানি। কিন্তু আচরণ করিবার শক্তি কৈ? দুর্ব্বল অধঃপতিত জাতির শক্তিলাভের এক প্রধান উপায়, বিবাহ-ক্ষেত্রের বিস্তার। এ সকল বুঝি; কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি কৈ? তাই শ্রুতি শিখাইতেছেন, বলকে ব্রহ্মবোধে সাধনা করিবে। পতিত ব্যক্তির উত্থিত হইতে যেমন বলের আবশ্যক হয়, পতিত জাতিরও তাহাই। মানব জীবরাজ্যের বাহিরে নহে; তাই জীবতত্ত্বের নিয়ম সকল অবগত হইয়া বংশপরম্পরা পুষ্ট ও সুগঠিত করিতে হয়। নতুবা পরবশতার পরিণাম হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। এই পথ কালসাপেক্ষ হইলেও অবশ্য অবলম্বনীয়, আমি এ বিষয় অন্যত্র যথাশক্তি আলোচনা করিয়াছি। (২) এস্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। এতদ্দেশীয় প্রত্যেক নরনারীর মনেই এই একমাত্র কথা বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক যে, পরবশতায় অবসাদ, অবসাদে ধ্বংস। জীব-বিজ্ঞান এই কথা আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতেছে। মানবেতর জীব-গণের, কি অসভ্য মানবের, অথবা সভ্য মানবের,—সকলের পক্ষেই এই বিধি প্রযোজ্য। এ তত্ত্ব বিস্মৃত হইলে আত্মরক্ষার উপায়ান্তর নাই। ওঁ তৎসৎ।

---

(১) "ভাব ও কর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ দেখুন।

(২) Late marriages are far more prolific than early ones,

Stark Wheather, Law of sex, p 75.

জাতীয় বিলোপ।*

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মানবজাতির কতিপয় শাখা প্রশাখা সম্পূর্ণ অথবা আংশিকরূপে চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে। হাম্‌বোল্ট দক্ষিণ আমেরিকায় একটী টিয়াপাখী দেখিয়াছিলেন, সে এক বিলুপ্ত জাতির ভাষায় একটী মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিত। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রাচীন স্তম্ভ এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সকল স্থানের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ তৎসম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঐ সকল স্তম্ভ এবং দ্রব্যাদি যাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে ও জনসমাগম-বিরহিত স্থানে এখনও কতিপয় ক্ষুদ্র এবং বিচ্ছিন্ন (মানব) জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা কোন কোন প্রাচীন জাতির লুপ্তাবশেষ মাত্র। স্ক্যাফ হসেন (Scaffhausen) বলেন, ইউরোপীয় প্রাচীন জাতি সকল বর্ত্তমান অসভ্যতম মানব অপেক্ষাও অনুন্নত ছিল। সুতরাং তাহারা বর্ত্তমান জাতি সকল অপেক্ষা, কোন কোন অংশে পৃথক ভাবাপন্ন ছিল। অধ্যাপক ব্রোকা লিছ ইজিস (Les Eyzies) স্থান হইতে যে সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা যদিও সম্ভবতঃ একটী পরিবারের দ্রব্য বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তাহা হইতে (প্রায়) মর্কটভাবাপন্ন অথচ উন্নত অবস্থার মানবজাতির অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। এই লুপ্ত-জাতি প্রাচীন ও আধুনিক সকল জাতি অপেক্ষাই সম্পূর্ণ পৃথক ভাবাপন্ন ছিল। বেল্‌জিয়মের গুহা মধ্যে অতি প্রাচীন কালে যে জাতি বাস করিত, তাহাদিগের অপেক্ষাও ইহারা বিভিন্ন ছিল।

যে সকল প্রাকৃতিক অবস্থা মানববাসের অতীব অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয়, মানব সে সকল অবস্থাতেও বহুদিন বাস করিতে পারে, মানব সে সকল অবস্থাকেও বহুদিন প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হয়। মানব নিদারুণ শীত-প্রধান উত্তর মেরুদেশে বহুকাল বাস করিতেছে; তথায় তাহার ডিঙ্গী খানি প্রস্তুত করিবার, কি কোনও প্রকার ব্যবহার্য্য বস্তু নির্ম্মাণ করিবার

---

* ডারুইন-প্রণীত Descent of man (১৯০৬) গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ৭ অধ্যায়, ২৮১ হইতে ৩০৭ পৃষ্ঠার অনুবাদ।

উপযোগী কাষ্ঠ নাই, অগ্নি জ্বালিবার জন্যও চর্ব্বিভিন্ন, কাষ্ঠ, কয়লা তৈলাদির সম্পূর্ণ অভাব, এবং বরফ-গলিত জল ভিন্ন অন্য কোন পানীয়ও নাই। আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে ফিউজিয়ান্‌রা বাস করে; অথচ তাহাদিগের অঙ্গে বস্ত্র নাই, বাস করিবার কুঁড়ে খানি পর্য্যন্ত নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় শুষ্ক প্রস্তরে ভয়াবহ হিংস্র জন্তু সকলের মধ্যেও মানব স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে; হিমালয় পর্ব্বতের পাদমূলে তরাই প্রদেশের সাংঘাতিক জল বায়ুর মধ্যে, এবং আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান স্থান সকলের মহামারির মধ্যেও মানব আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে।

মানবের বিনাশ প্রধানতঃ এক জাতির সহিত অপর জাতির কিম্বা এক শাখার সহিত অপর শাখার সংঘর্ষণ হইতেই সাধিত হয়। অসভ্য জাতিগণের জন সংখ্যা নানা কারণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না; দুর্ভিক্ষ, নিয়ত ভ্রমণশীলতা, (যাহাতে শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি করে), অধিক বয়স পর্য্যন্ত স্তন্যদান, পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ, আকস্মিক দুর্ঘটনা, নানাবিধ পীড়া, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, স্ত্রী হরণ, শিশুবধ, এবং জনন-শক্তির হীনতা, এই সকল বিবিধ কারণে অসভ্য জাতিগণের সংখ্যা বৃদ্ধির বিঘ্ন উপস্থিত করে। যদি কোন কারণে এই সকল বিঘ্ন একটুও প্রবল হয়, তাহা হইলেই তৎজাতীয়গণের সংখ্যা আরও হ্রাস হইতে থাকে। আর, দুই নিকটবর্ত্তী প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি মধ্যে যদি একটী এইরূপ কারণে কিছু হীনবল ও সংখ্যায় ন্যূন হয়, তবে অপরটী শীঘ্রই তাহাকে যুদ্ধ করিয়া, হত্যা করিয়া, আহার করিয়া, দাসত্বে পরিণত করিয়া অথবা আত্মসাৎ করতঃ শেষ করিয়া ফেলে। আর, এ সকল কারণ না ঘটিলেও, উহাদিগের মধ্যে একটীর সংখ্যা হ্রাস হইতে আরম্ভ হইলেই, উহা ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যদি অসভ্য জাতীয়গণের সহিত কোন সভ্য জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তবে অসভ্যগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অতীব ক্ষণস্থায়ী হয়। যদি উহাদিগের আবাস স্থলে জলবায়ুর উৎপীড়নে ঐ সভ্য জাতি তিষ্ঠিতে অসক্ত হয়, তবে উহাদিগের কথঞ্চিৎ রক্ষা, নতুবা আর রক্ষা নাই। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভ্য জাতীয়গণের বিজয় লাভের হেতু, কখন বা অতি সহজবোধ্য; কখন বা দুর্ব্বোধ্য। তাঁহাদিগের অবলম্বিত উপায় কখন বা সরল, কখন বা জটিল। অসভ্য জাতীয়গণকে সভ্য করিতে হইলে ভূমি কর্ষণ শিখাইতে হয়, কিন্তু উহাই তাহাদিগের পক্ষে সাংঘাতিক হইয়া উঠে, কারণ উহারা নূতন অভ্যাস গ্রহণ করে না, অথবা করিতে সক্ষম হয় না; উহারা

জীবিকা নির্ব্বাহের চিরন্তন প্রথা পরিবর্ত্তন করিতে পারেনা। নবাগত পীড়া, নবাগত দুরাচার, অনেক স্থলেই অতীব মারাত্মক। যে পর্য্যন্ত, উহাদিগের মধ্যে যাহারা অধিকতর ব্যাধি-প্রবণ, তাহারা মরিয়া নির্ম্মূল না হয়, সে পর্য্যন্ত নূতন পীড়া ঐ সমাজ ক্ষয়ের প্রধান কারণ হইয়া থাকে। মদ্যের বিষময় ফল ইহাদিগের পক্ষে অতীব সাংঘাতিক, আর সেই মদ্যপান-স্পৃহাই ইহাদিগের প্রবল হইয়া উঠে। অতি দূরবর্ত্তী পৃথক শ্রেণীভুক্ত মানবগণ যখন পরস্পরের সহিত প্রথম মিশিতে আরম্ভ করে,তখন কিছুদিন কি এক অজ্ঞাত কারণে,উহাদিগের মধ্যে নূতন পাড়া সকল আবির্ভূত হয় (১) মিঃ স্প্রোট ভ্যাংকোবর দ্বীপে এই বিষয় বিশেষ- রূপে অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, ইউরোপীয়গণের সমাগম জন্য ঐ দেশে অনেক অস্বাস্থ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। আর তিনি এ কথাও অতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিয়াছেন যে, ঐ দেশবাসিগণ চতুর্দ্দিকে নবাগত ইউরোপীয়গণের নূতন জীবন, নূতন আচার ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি ও নিরুৎসাহ হইয়া যায়; (ইউরোপীয়গণের ব্যবহারে) উহাদিগের স্ব-চেষ্টার প্রবৃত্তি হ্রাস হইয়া যায়, (পূর্ব্বানুষ্ঠিত) কর্ম্মেচ্ছা ফুরাইয়া যায়, অথচ উহারা নূতন কর্ম্মক্ষেত্রও প্রাপ্ত হয় না।

প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিগণের মধ্যে সভ্যতার ন্যূনাধিক্যের উপর তাহাদিগের জয় পরাজয় নির্ভর করে। কতিপয় শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাচ্য জাতীয়গণের (২) আগমন ও আক্রমণ হইতে ইউরোপ ভীত হইয়াছিল; এক্ষণে ওরূপ ভয় নিতান্তই হাস্যাস্পদ হইবে। (৩) একটী অতীব অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, অসভ্যগণ বর্ত্তমানকালীয় সভ্য জাতিগণের সংঘর্ষে যতদূর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, প্রাচীনকালীয় সভ্য-সমাজের সংঘর্ষে তেমন কিছুই হইত না। মিঃ বেঝট ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে সভ্য ও অসভ্যের সংঘর্ষে অসভ্যগণ যদি বর্ত্তমান কালের মত বিনষ্ট হইয়া যাইত, তবে প্রাচীন নীতিশাস্ত্র-প্রণেতাগণ এ বিষয় অবশ্যই বিশেষ প্রণিধান করিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের গ্রন্থাদিতে এ সম্বন্ধে কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায় না। মানবজাতির বিনাশ সাধন করিবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কারণ দুইটী, জন্ম সংখ্যার হ্রাস ও পীড়া। এই কারণদ্বয় শিশুগণকেই অধিক বিনাশ করে। জীবন ব্যাপারের, আচার

(১) আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া, কলেরা ও প্লেগের উল্লেখ নাই।
(২) গ্রন্থকার উহাদিগকে বর্ব্বর জাতি বলিয়াছেন।
(৩) রুষ জাপান যুদ্ধের পর লিখিতে হইলে ডারউইন কি লিখিতেন, বলিতে পারি না।

ব্যবহারের, নূতন পথ অনুকরণ করিতে বাধ্য হইলেই এইরূপ হইয়া থাকে। ঐ সকলের পরিবর্ত্তন সাক্ষাৎ স্বরূপে অনিষ্টজনক না হইলেও অনভ্যস্তের পক্ষে উহার পরিণাম ধ্বংস। (১) মিঃ হোওয়ার্থ এ বিষয় আমার মনোযোগ আকর্ষণ করায় আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি এ বিষয় আমাকে অনেক সংবাদ দিয়াছেন। আমি নিম্নলিখিত বৃত্তান্তগুলি সংগ্রহ করিয়াছি।

ট্যাস্‌ম্যানিয়াতে যখন প্রথম (ইউরোপীয়দিগের) উপনিবেশ স্থাপিত হয়, তখন তদ্দেশবাসিগণের সংখ্যা কেহ ৭০০০, কেহ ২০০০০ গণনা করিয়াছিলেন। শীঘ্রই তাহাদিগের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়া গেল। ইংরাজদিগের সহিত এবং পরস্পরের সহিত (২) যুদ্ধ বিগ্রহ ইহার প্রধান কারণ। (নবাগত) উপনিবেশিকগণ ইহাদিগকে যেরূপে সংহার করিয়াছিলেন, (৩) তাহা একরূপ প্রসিদ্ধ। এই সংহারের পর যখন হতাবশিষ্ট কয়েকজন গবর্ণমেণ্টের নিকট আত্ম সমর্পণ করিল, তখন তাহারা ১২০ জন মাত্র ছিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই ১২০ জনকে ফ্লিণ্ডার্স দ্বীপে স্থানান্তরিত করা হয়। এই দ্বীপ ট্যাস্‌মেনিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্ত্তী; ইহা দীর্ঘে ৪৯ মাইল, প্রস্থে ১২ হইতে ১৮ মাইল। দ্বীপটীও স্বাস্থ্যকর এবং ঐ ১২০ জনের উপর ব্যবহারও ভালই করা হইয়াছিল; তথাপি তাহাদিগের অত্যন্ত স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গেল। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল যে, উহাদিগের সংখ্যা বয়স্থ পুরুষ ৪৭ জন, বয়স্থা স্ত্রীলোক ৪৮ ও শিশু ১৬ জন, মোট ১১১ জন হইয়া গিয়াছে। ১৮৩৫ সালে উহারা ১০০ জন মাত্র হইয়া গেল। উহারা ক্রমেই সংখ্যায় কমিয়া যাইতেছিল। উহারা বিশ্বাস করিত যে, অন্যত্র বাস করিলে উহাদিগের দশা এরূপ হইত না; সুতরাং ১৮৪৭ সালে উহাদিগকে ট্যাস্‌ম্যানিয়ার দক্ষিণ দিকে অয়ষ্টার কোভ নামক স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। তখন উহাদিগের সংখ্যা, পুরুষ ১৪ জন, স্ত্রীলোক ২২ জন এবং শিশু ১০ জন, মোট ৪৬ জন মাত্র। কিন্তু স্থান পরিবর্ত্তনেও কোন উপকার হইল না। পীড়া এবং মৃত্যু তাহাদিগকে ছাড়িল না। ১৮৬৪ খ্রীঃ উহাদিগের সংখ্যা, পুরুষ ১, স্ত্রীলোক ৩ জন, মোট ৪ জন মাত্র থাকিল। ঐ পুরুষটীও ১৮৬৯ খ্রীঃ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিল। ইহাদিগের সমাজে স্বাস্থ্যভঙ্গ ও পীড়া অপেক্ষা জন্ম সংখ্যার হ্রাসই অধিকতর বিস্ময়জনক। নারী-

(১) এই কথাগুলি প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত।

(২) এই গৃহবিবাদ কে বাধাইয়াছিল, গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ করেন নাই।

(৩) ইউরোপীয়গণ মানুষ শিকার করেন!

দিগের গর্ভধারণ ক্ষমতাই কমিয়া গেল। যখন তাহাদিগের স্ত্রীলোক সংখ্যা ৯টী মাত্র ছিল, তখন তাহারা মিঃ বনউইক্‌কে বলিয়াছিল যে, উহাদিগের মধ্যে কেবল দুইটী স্ত্রীলোকের সন্তান জন্মিয়াছিল, এবং এই দুই জনেরও ৩টী মাত্র সন্তান হইয়াছিল।

এই অভূত-পূর্ব্ব ঘটনার কারণ সম্বন্ধে ডাক্তার ষ্টোরি বলেন যে, উহাদিগকে "সভ্য" করিতে গিয়াই উহারা মরিয়া গেল। "উহারা অপ্রতিহত ভাবে পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারিলে অধিকতর সন্তান সন্ততি উৎপন্ন করিতে পারিত, এবং উহাদিগের মৃত্যু সংখ্যাও তত অধিক হইত না।" মিঃ ডেভিস্ নেটিভ্‌দিগকে অর্থাৎ তত্তদ্দেশবাসিগণকে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "উহাদিগের জন্ম সংখ্যার হ্রাস ও মৃত্যু সংখ্যার বৃদ্ধি হয়। ইহার প্রধান কারণ, আহারের পরিবর্ত্তন এবং জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালী পরিবর্ত্তন। ভ্যাণ্ডিমনস্ ল্যাণ্ড্ হইতে ইহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। এই সকল কারণে ইহাদিগের মন ভাঙ্গিয়া গেল, ইহারা নিরুৎসাহিত হইয়া গেল। তাহাতেই ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হইল।" (১)

অষ্ট্রেলিয়ার দুইটী পৃথক প্রদেশেও এইরূপ ঘটনা দৃষ্ট হইয়াছে। বিখ্যাত ভ্রমণকারী মিঃ গ্রেগরি মিঃ বন্‌উইক্‌কে বলিয়াছিলেন যে, "কৃষ্ণবর্ণগণের বংশবৃদ্ধির হানি হইতেছে; যাহারা অল্পকাল হইল বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেও বংশ হানি দেখা যাইতেছে। ইহারা শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে।" সার্কস্ বে প্রদেশ হইতে যে ১৩ জন আদিম নিবাসী মার্চিসন নদীপ্রবাহিত দেশে উপনীত হইয়াছিল, উহাদিগের মধ্যে ১২ জন তিন মাসেই যক্ষ্মারোগে মরিয়া গেল।

মিঃ ফেণ্টন নিউজিলাণ্ডের মাউরিগণের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার কারণ বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া সুন্দর রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহা হইতে, একটী বৃত্তান্ত ব্যতীত, নিম্নের সমস্ত বিষয় গৃহীত হইল।

"১৮৩০ খ্রীঃ হইতে তাহাদিগের জনসংখ্যা কমিয়াছে এবং ক্রমেই কমিতেছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন; তাহারাও বলে। এ পর্য্যন্ত তাহাদিগের জনসংখ্যা গণনা করা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু প্রবাসিগণ বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক নানা স্থানে তাহাদিগের সংখ্যা অবধারণ করিয়াছেন। অতএব তাহা বিশ্বাস্য। ইহা হইতে জানা যায় যে, ১৮৪৪খ্রীঃ হইতে ১৮৫৮খ্রীঃ পর্য্যন্ত উহারা সংখ্যায়

(১) এই সিদ্ধান্ত বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা উচিত।

শতকরা ১৯·৪২ জন কমিয়া গিয়াছিল। উহাদিগের কয়েকটী শাখার জনসংখ্যা বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে, ঐ সকল শাখার ব্যক্তিগণ পরস্পর হইতে প্রায় ১০০ মাইল দূরে বাস করিত; কেহবা সমুদ্রের উপকূলে, কেহ বা তাহা হইতে ব্যবধানে বাস করিত। তাহাদিগের আহার্য্য বস্তু বিভিন্ন প্রকার, চলা ফেরা আচার অভ্যাসও কোন কোন অংশে পৃথক্ রূপ ছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উহাদিগের মোট সংখ্যা ৫৩,৭০০ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ১৮৭২ খ্রীঃ অর্থাৎ ১৪ বৎসর পর আবার যখন জনসংখ্যা লওয়া যায়, তখন উহারা ৩৬,৩৫৯ হইয়া গিয়াছিল। তবেই দেখা গেল যে, এই ১৪ বৎসরে শতকরা ৩২·২৯ জন কমিয়া গিয়াছে। মিঃ ফেণ্টন বিস্তৃত রূপে দেখাইয়াছেন যে, পীড়া, স্ত্রীগণের ব্যভিচার, পানদোষ, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি যে সকল কারণ উহাদিগের সংখ্যা হ্রাসের সম্বন্ধে সচরাচর অনুমান করা হয়, তাহা নিতান্ত অপ্রচুর। তিনি সঙ্গত কারণ বশতঃই বিবেচনা করেন যে, মাউরিগণের সংখ্যা হ্রাসের প্রধান কারণ দুইটীঃ—স্ত্রীগণের গর্ভধারণ করিবার শক্তিহীনতা এবং শিশুগণের (অসাধারণ) মৃত্যু। ইহার প্রমাণ জন্য তিনি দেখাইয়াছেন যে, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুর সংখ্যানুপাত ২·৫৭:১ ছিল; কিন্তু ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ অনুপাত ৩·২৬:১ হইয়া গিয়াছিল।* প্রাপ্ত বয়স্কগণেরও মৃত্যু সংখ্যা অনেক অধিক ছিল। ইহাদিগের সংখ্যা হ্রাসের আর একটী কারণ তিনি উল্লেখ করেন; তাহা এই যে, ইহাদিগের মধ্যে পুত্র সন্তান অপেক্ষা কন্যা সন্তান জন্মেই কম, তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যানুপাতের তারতম্য হইয়া পড়ে। ইহার কারণ বোধ হয় পৃথক, তাহা পশ্চাৎ আলোচ্য। আইল্যাণ্ড দেশের সহিত নিউজিল্যাণ্ডের জনসংখ্যা হ্রাসের তুলনা করিয়া মিঃ ফেণ্টন আশ্চার্য্যন্বিত হইয়াছেন। এতদুভয় দেশের জল বায়ুর প্রভেদ নাই, এবং অধিবাসীগণের আহার পরিধেয়, ও ব্যবহারও প্রায় তুল্যরূপ। মাউরি জাতীয়গণ নিজে বিবেচনা করে যে, নূতন আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়াতেই তাহাদিগের মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে।† অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বংশবৃদ্ধি বা ক্ষয়ের যে নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা বিবেচনা করা কালে আমরা দেখিতে পাইব যে মাউরিগণের এই বিশ্বাস সম্ভবতঃ যথার্থ। উহাদিগের সংখ্যা হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, ১৮৩০

* অর্থাৎ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শিশুরা প্রাপ্ত বয়স্কের প্রায় অর্দ্ধেক ছিল, কিন্তু ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উহারা প্রায় এক তৃতীয়াংশ হইয়া গিয়াছিল।

† এতদ্দেশীয় বিলাত-ফেরতগণকে প্রায়শঃ দীর্ঘায়ু হইতে দেখা যায় না।

খ্রীষ্টাব্দের ও ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে; আর মিঃ ফেণ্টন দেখাইয়াছেন যে, ঐ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়েই উহাদিগের মধ্যে ভুট্টা দীর্ঘকাল জলে ডুবাইয়া পচাইবার প্রথা প্রচালিত হয়, * এবং অনেকেই তদ্রূপ করিতে আরম্ভ করে। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, যখন ইউরোপীয়গণ কেবল মাত্র নিউজিলাণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, প্রায় তখন হইতেই মাউরি-গণের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে। যখন আমি ১৮৩৫ সালে বে আইল্যাণ্ডে গিয়াছিলাম, তখন উহাদিগের পরিচ্ছদ এবং আহার অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহারা আলু, ভুট্টা এবং অন্যান্য খাদ্য জন্মাইত, এবং উহা ইংরাজদিগকে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজ-প্রস্তুত দ্রব্যাদি ও তামাক লইত।

বিসপ প্যাটিসনের "জীবন-চরিত" হইতে জানা যায় যে, নিউহেব্রিডিস্ ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জবাসী মিলানেসিয়ানগণকে খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজকরূপে শিক্ষিত করিবার জন্য যখন নিউজিল্যাণ্ড, নরফোক্‌দ্বীপ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতেও তাহাদিগের অত্যন্ত স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, এবং বহুসংখ্যক লোক মরিয়াই গিয়াছিল।

স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসিগণের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যাওয়ার কথা সকলেই জানেন; নিউজিল্যাণ্ডেও যেমন স্যাণ্ডউইচেও তেমনি ঘটিয়াছিল। যাহারা এ বিষয় উত্তমরূপ জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, ১৭৭৯ খ্রীঃ যখন কুক স্যাণ্ডউইচ দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তখন তাহার অধিবাসী সংখ্যা মোটামুটি ৩ লক্ষ ছিল। কিন্তু ১৮২৩ খ্রীঃ যখন তাহাদিগকে গণনা করা হয়, তখন তাহারা প্রায় ১৪২,০৫০ জন মাত্র হইয়া গিয়াছিল। এই গণনা বিশুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এবং তৎপর পর সময়ে যখন শুদ্ধরূপে গবর্ণ-মেণ্ট পক্ষ হইতে গণনা করা যায়, তখন দেখা গেল যে, উহাদিগের সংখ্যা নিম্নলিখিত মত কমিয়া গিয়াছিল।

	জনসংখ্যা	মন্তব্য
১৮৩২	১৩০,৩১৩	১৮৩২ ও ৩৬ সালের গণনা
১৮৩৬	১০৮,৫৭৯	সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে।
১৮৫৩	৭১,০১৯	

* বঙ্গদেশে জলে ডুবাইয়া পাট পচানের প্রথা স্মরণ করুন। প্রায় ৪০ বৎসর হইল এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার আবির্ভাবও প্রায় ঐ কালই হইবে।

১৮৬০	৬৭,০৮৪
১৮৬৬	৫৮,৭৬৫
১৮৭২	৫১,৫৩১

এই তালিকা হইতে জানা যায় যে, ১৮৩২ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৪০ বৎসরে স্যাণ্ডউইচবাসিগণের সংখ্যা শতকরা ৬৮ জন কমিয়া গিয়াছে! ইহাদিগের স্ত্রীলোকের অসতীত্ব, পূর্ব্ববর্ত্তী মারাত্মক যুদ্ধবিগ্রহ, বিজিত-জাতির প্রতি আরোপিত কঠিন পরিশ্রম, এবং নূতন আমদানি নানাবিধ পীড়া যাহাতে বহুলোক নষ্ট হয়; অনেক গ্রন্থকার ইহাদিগের বংশক্ষয়ের এই সকল এবং এতদনুরূপ কারণ অনুমান করেন। এই সকল কারণে ইহাদিগের সংখ্যা হ্রাস হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং বোধ হয়, ১৮৩২ হইতে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই ৫ বৎসরের অত্যধিক লোকক্ষয় ঐ সকল কারণেই হইয়াছিল। কিন্তু আমার অনুমান হয় যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কারণ, স্ত্রীগণের গর্ভধারণের শক্তি হ্রাস হওয়া। ইউনাইটেড ষ্টেটস্ রণপোত বিভাগের ডাক্তার রুসেন-বার্জার ১৮৩৫ হইতে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই দ্বীপে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, উহার হাওয়াই প্রদেশে ১১৩৪ জন অধিবাসী মধ্যে কেবল ২৫ জন লোকের এবং অপর এক বিভাগে ৬৩৭ জন মধ্যে ১৩ মাত্র লোকের সন্তান সন্ততি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, আর ইহাদিগেরও সন্তান সন্ততি তিন-টীর ঊর্দ্ধ ছিল না। ৮০ জন বিবাহিতা নারী মধ্যে কেবল ৩৯ জন গর্ভধারণ করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যে জানা যায় যে, ঐ দ্বীপে সমস্ত জনসংখ্যার হিসাবে প্রত্যেক দম্পতি গড়ে আর্ধখানা সন্তানের অধিকারী। অয়েষ্টার কোভের ট্যাস্মেনিয়নদিগের মধ্যেও অপত্য সংখ্যার গড় অনুপাত ঠিক এই-রূপই। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জার্ব্বিস্ স্বরচিত ইতিহাসে প্রকাশ করেন যে, যে পরিবারে তিনটী সন্তান সন্ততি আছে, তাহাদিগের কোন টেক্স দিতে হইবে না, এবং যে পরিবারের অপত্য সংখ্যা তিনটীর অধিক, তাহাদিগকে জমি দিয়া ও অন্য প্রকারে উৎসাহিত করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত এই অভূতপূর্ব্ব বিধি হইতেই বুঝা যায় যে, অধিবাসিগণ কত দূর বন্ধ্যাভাব ও জনন-হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রেভারেণ্ড এ বিসপ সাহেব ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে "স্পেক্টে-টার" নামক পত্রিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্যাণ্ডউইচ দ্বীপে শিশুদিগের মৃত্যুসংখ্যা অনেক বেশী, এবং বিসপ্ ষ্ট্যান্‌লি আমাকে বলিয়াছেন যে, অদ্যা-পিও শিশুগণের অবস্থা ঐরূপই আছে। এ অবস্থা নিউজিল্যাণ্ডের তুল্য।

কেহ কেহ মনে করেন যে, স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রতিপালনে যত্ন করে না বলিয়াই এইরূপ হয়। কিন্তু সম্ভবতঃ ইহার প্রধান কারণ এই যে, জননশক্তির হ্রাস হওয়ায় অপত্যের দৈহিক দুর্ব্বলতা স্বভাবতই আসিয়া উপস্থিত হয়; তদ্ধেতুই শিশুগণের মৃত্যুসংখ্যা এত অধিক হইয়া থাকে। নিউজিল্যাণ্ডের সহিত স্যাণ্ডউইচ দ্বীপ-বাসিগণের আর এক বিষয়ে ঐক্য দেখিতেছি; ইহাদিগের মধ্যেও পুত্র অপেক্ষা কন্যাই অধিক জন্মে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের আদম স্নুমারীতে মোট পুরুষ সংখ্যা ৩১৬৫০ ও স্ত্রী সংখ্যা ২৫২৪৭ পাওয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ ১২৫.৩৬ জন পুরুষের স্থলে ১০০ জন মাত্র স্ত্রীলোক ছিল, কিন্তু সকল সভ্যদেশেই স্ত্রী-লোকের সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা অধিক। স্ত্রীলোকের অসতীত্ব এই জননশক্তির হীনতা কতকাংশে উৎপাদন করিতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিবাসিগণের চালচলন, আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন হওয়াই এই অবস্থার প্রবলতর কারণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। ইহাতে মৃত্যুসংখ্যা, বিশেষতঃ শিশুর মৃত্যু, এত অধিক হওয়ার হেতুও বুঝা যাইতেছে। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কুক এই সকল দ্বীপে গিয়াছিলেন, ১৭৯৪ খ্রীঃ ভ্যাঙ্কোবর গিয়াছিলেন এবং তৎপর তিনি মৎস্য-শিকারীদিগের নৌকায় অনেকবার গিয়াছিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ উপস্থিত হন এবং দেখেন যে, তাঁহাদিগের আসিবার পূর্ব্বেই দ্বীপ-বাসিগণের রাজা মূর্ত্তিপূজার প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন। ইহার পর হইতেই উহাদিগের আচার ব্যবহার প্রায় সকল বিষয়েই বিশেষরূপে দ্রুতগতি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল; উহারা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য হইয়া উঠিল। মিঃ কোন ঐ দ্বীপেই জন্মিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, ইংরাজ জাতি সহস্র বৎসরে যত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, দ্বীপবাসি-গণ পঞ্চাশ বর্ষ মধ্যেই তদপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিসপ ষ্টেলির নিকট হইতে জানা যায় যে, যদিও অনেক নূতন নূতন ফল এই সকল দ্বীপে আমদানী হইয়াছে এবং ইক্ষু সর্ব্বত্রই প্রচলিত, তথাপি দরিদ্র-শ্রেণীর লোক-দিগের আহারের বেশী পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইউরোপীয়গণের অনুকরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায়, ইহারা অল্পকাল মধ্যেই পোষাক পরি-বর্ত্তন করিয়াছিল এবং মদ্যপান করিতে আরম্ভ করে।* যদিও এই সকল পরিবর্ত্তন বাহ্যতঃ দেখিতে বড় বেশী বলিয়া বোধ হয় না, তথাপি মানবেতর

* বিশেষ বিবেচ্য।

প্রাণিগণের সম্বন্ধে যাহা জানা আছে, তাহাতেই উহা দ্বীপবাসীদিগের জননশক্তি হ্রাস হইবার প্রচুর কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

মিঃ ম্যাকনামারা বলেন যে, বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্বদিগের অনুন্নত ও অসভ্য আণ্ডামান দ্বীপবাসিগণ জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। এমন কি, উহাদিগকে ঐ দ্বীপ হইতে অন্যত্র লইয়া গেলে, আহার ও অন্যান্য অবান্তর অবস্থা ঠিক পূর্ব্ববৎ রাখিলেও উহারা প্রায়ই মরিয়া যায়। তিনি ইহাও বলেন যে, নেপালের উপত্যকা-বাসিগণকে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতিগণকে সমতল ভূমিতে আনিলে তাঁহারা আমাশয় ও অম্ল রোগে পীড়িত হইয়া পড়ে এবং সম্পূর্ণ বৎসর উহাদিগকে তথায় রাখিলে উহারা মরিয়া যায়।

এইরূপে দেখা যায় যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য মানবগণের আচার ব্যবহার কিম্বা জীবনধারণ উপযোগী ক্রিয়া কর্ম্মের পরিবর্ত্তন বশতঃ বিশেষ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে। কেবল নূতন জলবায়ুর ফলেই যে তদ্রূপ হয়, তাহা নহে। শুধু আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; ঐ প্রাচীন আচারাদির পরিবর্ত্তে নূতন যে সকল আচারাদি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা আপাততঃ অনিষ্টজনক বলিয়া বোধ না হইলেও, অর্থাৎ ঐ সকল নূতন আচার সাক্ষাৎস্বরূপে অনিষ্টজনক না হইলেও, উহা হইতে সকলেরই, বিশেষতঃ শিশুগণের, বিশেষরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া থাকে। অনেকে অনেকবার বলিয়াছেন যে, মানব গুরুতর ঋতু পরিবর্ত্তন এবং অন্যান্য পরিবর্ত্তনের মধ্যেও আত্মরক্ষা করিতে পারে; কিন্তু একথা কেবল সভ্য মানবের পক্ষেই সত্য। অসভ্য মানবগণ, তাহাদিগের নিকট-কুটম্ব মর্কটদিগের মতই (anthropoid apes) ঐ সকল পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে অক্ষম। অসভ্য মানবকে তাহাদিগের জন্মভূমি হইতে স্থানান্তরিত করিলে তাহারা অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে না।

স্বাস্থ্যভঙ্গ ও মৃত্যু অপেক্ষা, অবস্থার পরিবর্ত্তন বশতঃ জননশক্তির হ্রাস হওয়াই অধিকতর কৌতূহলজনক। ট্যাস্ম্যানিয়ান্, মাউরি, স্যাণ্ডউইচ দ্বীপবাসী এবং অষ্ট্রেলিয়ানদিগের এইরূপই হইয়াছিল। কারণ অত্যল্প পরিমাণ বন্ধ্যত্বও অন্যান্য জনসংখ্যা হ্রাসকারক কারণের সহিত মিলিত হইয়া বিলোপ সাধন করিতে পারে। জননশক্তি স্ত্রীলোকের অসতীত্ব বশতও কখন কখন হ্রাস হয়, যেমন কিছুদিন পূর্ব্বে টাহিটিয়ানদিগের মধ্যে হইয়াছিল। কিন্তু মিঃ ফেণ্টন দেখাইয়াছেন যে, নিউজিল্যাণ্ডার ও ট্যাসম্যানিয়ানদিগের সংখ্যা হ্রাস এ কারণে হয় নাই।"

উপরে যে প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে মিঃ ম্যাক্‌নামারা কারণ উল্লেখ করতঃ দেখাইয়াছেন যে, ম্যালেরিয়া পীড়াগ্রস্ত স্থানের অধিবাসিগণ বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইবার দিকে অগ্রসর হয়।* কিন্তু উপরোক্ত জাতীয়গণের মধ্যে অনেক স্থলে এই কারণ সর্ব্বথা প্রযোজ্য নহে। কোন কোন লেখক বিবেচনা করেন যে, দ্বীপ সকলের আদিম-নিবাসিগণের জননশক্তি-হীনতার কারণ তাহাদিগের স্ববংশে সন্তানোৎপাদন করা; কিন্তু উপরে যে সকল জাতির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে দেখা যায় যে, ইউরোপীয়গণ তাহাদিগের দ্বীপে আসিবার সময় হইতেই তাহাদিগের জননশক্তি হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল; ইহাতে ঐ রূপ কারণ এ সকল স্থলে স্বীকার করা যায় না। মানব স্ববংশে সন্তানোৎপাদন করিলে ঐরূপ কুফল উৎপন্ন হয়, এমত বিবেচনা করিবার কোন কারণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ নিউজিল্যাণ্ড কিম্বা স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় বিভিন্ন অবস্থাপন্ন স্থানের বিস্তীর্ণ প্রদেশ সকলে ঐরূপ ফল উৎপন্ন হইবার কোন কারণই দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, ইহা জানা যাইতেছে যে, নরফোক্ দ্বীপসমূহে, ভারতবর্ষের টোডাদিগের মধ্যে, এবং স্কট্‌ল্যাণ্ডের কোন কোন পশ্চিম দ্বীপে, বর্ত্তমান অধিবাসিগণ সকলেই নিকট-কুটুম্ব; তথাপি তাহাদিগের মধ্যে জননশক্তির হ্রাস হওয়া বোধ হয় না। এ সকল অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্য কারণ, মানবেতর জীবের তুলনায় অনুমিত হইতে পারে। যে জীব যে অবস্থায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিলে দেহস্থ জনন-যন্ত্র সকল বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়, * ইহা প্রমাণ করা যায়; আর এই হেতুতে সুফল ও কুফল দুইই উৎপন্ন হইয়া থাকে। মৎপ্রণীত গৃহপালিত অবস্থায় উদ্ভিদ ও জন্তুগণের পরিবর্ত্তন (variation of animals and plants under domestication) নামকগ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ড অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই বিষয়ক অনেক উদাহরণ সংগৃহীত করা হইয়াছে। এস্থলে অতি সংক্ষেপে সেই সকলের উল্লেখ করিব। যাঁহারা এই বিষয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন,তাঁহারা ঐ গ্রন্থ দেখিবেন। কোন কোন অতীব সামান্য পরিবর্ত্তনে সমস্ত অথবা অধিকাংশ উদ্ভিদ ও জীবগণের স্বাস্থ্য, বীর্য্য ও জননশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; আবার, কোন কোন পরিবর্ত্তনে অনেক জন্তুর বন্ধ্যাত্ব আনয়ন করে। ইহার একটী বিশেষ পরিজ্ঞাত উদাহরণ ভারতবর্ষের হস্তীজাতি; ইহাদিগের গৃহপালিত অবস্থায় অপত্য জন্মে না। * আভাতে ইহাদিগের

---

* প্রণিধান করুন।

গৃহপালিত অবস্থাতেও অপত্য উৎপন্ন হয়। সেখানে তাহাদিগকে জঙ্গল মধ্যে কতকটা স্বচ্ছন্দ ভাবে ভ্রমণ করিতে দেওয়া হইয়া থাকে; এ নিমিত্ত স্বাভাবিক স্বাধীন হস্তীর মতই ইহাদিগের অবস্থা। আমেরিকার বানরগণ মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয়দিগকেই তাহাদিগের আপন দেশেও "পোষা" করিয়া রাখিলে দেখা গিয়াছে যে, তাহাদিগের সন্তান জন্মেই নাই, অথবা অতি অল্প সংখ্যক জন্মে। ইহাদিগের সহিত মানবের নৈকট্য বশতঃ ইহাদিগের জনন-হীনতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জঙ্গলের স্বাধীন জন্তুকে ধরিয়া আনিলে অতি অল্প পরিমাণ অবস্থা পরিবর্ত্তনেও কেমন জননহীনতা উৎপন্ন হয়, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিবার স্থল। ইহা আরও বিস্ময়কর, কারণ, স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা গৃহপালিত অবস্থাতে সকল পালিত-পশুই অধিকতর জননশীল হইয়াছে, আর কোন কোন পালিতপশু জননশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও নিতান্ত অস্বাভাবিক অবস্থা সহ্য করিতে সক্ষম হয়। জঙ্গল হইতে ধরিয়া আনিলে কোন কোন শ্রেণীস্থ জীবের বেশী, কাহারও বা কম পরিমাণে জনন-শক্তির হ্রাস হয় এবং মোটের উপর এক শ্রেণীস্থ জীব সকলেই তুল্যরূপে আক্রান্ত হয়। কিন্তু কখন কখন কোন শ্রেণীর মধ্যে একটী মাত্র জাতিই বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্যে সেরূপ হয় না। পক্ষান্তরে এমতও হইয়া থাকে, যে কোন শ্রেণীর মধ্যে একটী ভিন্ন সকলেই ঐ অবস্থায় বন্ধ্যাত্ব পাইল; কিন্তু ঐটী জননক্ষম রহিয়া গেল। কোন কোন পুরুষ ও স্ত্রীগণকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে কিম্বা প্রায় মুক্ত অবস্থায় রাখিলেও উহারা আপন দেশেও পরস্পরের সহিত সঙ্গত হয় না; আবার কোন কোন জাতীয়গণ ঐরূপ অবস্থায় সংগত হয়, কিন্তু তাহাতে অপত্য জন্মে না; আবার কোন কোন গুলির অপত্য জন্মে, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় যে পরিমাণ জন্মে, তদপেক্ষা অল্প সংখ্যক জাত হয়। এস্থলে ইহা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য যে, এই সকল অপত্য দুর্ব্বল, ও পীড়াগ্রস্ত অথবা বিকৃত আকারের হইয়া থাকে, আর তাহারা শিশুকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উপরে যে সকল মানবের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের অবস্থা বিবেচনা করিতে ইহাদিগের কথা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।

অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত জনন-শক্তির যেরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়, বিশেষতঃ বানর-শ্রেণীর মধ্যে এই পরিবর্ত্তনের ক্রিয়া যেরূপ লক্ষিত

---

* রাজসাহী জেলার পুঁটিয়া গ্রামে দুই বার পালিতা হস্তিনীর প্রসব হইতে দেখা গিয়াছে।

হইয়া থাকে, তাহাতে আদিম অবস্থায় মানবও যে অবস্থার পরিবর্ত্তনবশতঃ বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইত, সে বিষয় সন্দেহ করা যায় না। সুতরাং যে কোন জাতীয় মানবই হউক, অসভ্যাবস্থায় তাহার আচার ব্যবহার, চাল চলন পরিবর্ত্তন করিলে সে ন্যূনাধিক বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদিগের শিশুগণেরও স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইবে। স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অন্যত্র লইলে ভারতবর্ষে যেমন হস্তীর ও চিতাব্যাঘ্রের, আমেরিকায় যেমন কোন কোন শ্রেণীর বানরের এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক জন্তুর হইয়া থাকে, অসভ্য মানবেরও তেমনই হয়।

এইরূপ বিবেচনা করিলে ইহা বুঝা যাইতে পারে যে, অসভ্য মানব দীর্ঘ-কাল এক অবস্থার মধ্যে থাকিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে, কি যেন কারণ-বশতঃ, বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। অসভ্যগণ অপেক্ষা সভ্য মানব সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তন অধিকতর সহ্য করিতে পারে। এই বিষয়ে সভ্যমানব গৃহপালিত পশুর ন্যায়; কারণ ভারতবর্ষীয় কুকুর ভিন্ন অন্যান্য পশুগণের পরি-বর্ত্তিত অবস্থায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলেও, তাহারা বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয় না। এইরূপ হইবার অত্যল্প সংখ্যক উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইলেও, ইহারা প্রায়ই বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয় না। সভ্য মানব ও গৃহপালিত পশু পরিবর্ত্তিত অবস্থাতেও যে জনন-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হয়, তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তাহারা জঙ্গলা পশু অপেক্ষা অনেক অধিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে জীবন যাপন করে এবং সেই হেতু পরিবর্ত্তিত অবস্থাতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। আর তাহারা পূর্ব্বকালে একদেশ হইতে অন্য দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিল, কিম্বা এক স্থান হইতে অন্যত্র নীত হইয়াছিল, অথবা তাহাদিগের বিভিন্ন শাখা ও বংশীয়গণ পরস্পরের সংযোগে অপত্য উৎপাদন করিয়াছিল,—এ সকল কারণবশতঃও ঐরূপ ঘটিয়া থাকিতে পারে। সভ্য মানবের সহিত অসভ্য মানবের সংযোগে অপত্যজাত হইলে, সেই অপত্য পরিবর্ত্তিত অবস্থার কুফল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। ইংরাজ ও টাহিটিয়ানদিগের সংযোগে সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহাদিগকে পিট্‌কেরণ দ্বীপে আবাস দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে এত শীঘ্র উঁহাদিগের বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, অল্পকাল মধ্যেই ঐ দ্বীপ জনপূর্ণ হইয়া উঠিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তাহাদিগকে নরফোকদ্বীপে স্থানান্তরিত করা হয়; তখন তাহাদিগের সংখ্যা, বিবাহিত ৬০ জন এবং শিশু ১৩৪ জন, মোটে ১৯৪ জন মাত্র। কিন্তু এত শীঘ্র ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি হইয়া উঠিল যে, ১৮৫৯ খ্রীঃ, ১৬ জন পিট্‌কেরণ দ্বীপে ফিরিয়া আসা সত্ত্বেও, ১৮৬৮ খ্রীঃ উহাদিগের সংখ্যা ৩০০

জন হইয়াছিল। তন্মধ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষের সংখ্যা সমান ছিল। ট্যাস্‌ম্যানিয়ানদিগের সহিত তুলনায় ইহাদিগের অবস্থা কিরূপ বিপরীত ভাবাপন্ন দেখা যায়। নরফোপ দ্বীপবাসিগণ সার্দ্ধ দ্বাদশ বর্ষে ১৯৪ জন হইতে ৩০০ শত হইয়া উঠিল; আর ট্যাস্‌মেনিয়ানগণ পঞ্চদশ বর্ষে ১২০ জন স্থলে মাত্র ৬০টীতে পরিণত হইলে, আর তাহার মধ্যেও কেবল ১২টী মাত্র শিশু।

তেমনই ১৮৬৬ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের খাঁটি অধিবাসিগণ গণনায় ৮০৮১ জন কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু শঙ্করবর্ণগণ সংখ্যায় ৮৪৭ জন বাড়িয়া উঠিয়াছিল, আর তাহারা অধিকতর সুস্থকায় ছিল। কিন্তু এই ৮৪৭ জন মধ্যে শঙ্কর জাতীয়গণের অপত্যকেও গণনা করা হইয়াছিল, কি কেবল প্রাথমিক শঙ্করজাতিদিগকেই গণনা হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।

এই স্থলে যে সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম, উহারা সকলেই তত্তৎদেশের আদিম-নিবাসী; আর সকলেই সভ্য মানবগণের আগমন হেতু অবস্থা পরিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু যদি যুদ্ধবিগ্রহে পরাজিত হইয়া, অথবা অন্য কোন কারণে অসভ্যগণ আপন আবাস পরিত্যাগ করতঃ অন্যবিধ আচার আচরণ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইত, তবে সম্ভবতঃ উহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্তি হইত। অবস্থা পরিবর্ত্তন এবং বন্ধ্যাত্ব-হেতুই জঙ্গলা জন্তুকে গৃহপালিত করার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, কারণ গৃহপালিত করিতে হইলেই ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক, আর অসভ্য মানবকেও সভ্যতার সংসর্গে আনিয়া সভ্যজাতি গঠিত করিবার পক্ষেও ঐ একই বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়; কারণ ইহারাও অবস্থা পরিবর্ত্তনে জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, যদিও মানবীয় জাতি সমূহের ক্রমে ক্রমে সংখ্যা হ্রাস ও পরিণামে বিলোপ হওয়ার বিষয় সম্যকৃরূপে বোধগম্য করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, কারণ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে বহু কারণ মিলিত হইয়া এই ফল উৎপাদন করে,—তথাপি, এই বিষয়টী এবং উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুগণের বিলুপ্তি প্রকৃতপক্ষে একই প্রকার বিষয় বলিয়া বিবেচনা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার সেই প্রাচীন অশ্বজাতি বিলুপ্ত হইয়া গেল; কিন্তু অনতিবিলম্বেই তত্তৎ প্রদেশে স্পেনদেশীয় অশ্বজাতি বহু বিস্তৃত হইয়া উঠিল। নিউজিল্যাণ্ডারগণ এই কথা অনুভব করে ও বুঝিতে পারে; কারণ তাহারা আপন ভাগ্য তদ্দেশীয় প্রাচীন ইঁদুরের সহিত তুলনা করে। ঐ সকল ইঁদুরকে ইউরোপীয়

ইন্দুরে প্রায় নির্ব্বংশ ও বিলোপ করিয়া দিয়াছে। এ বিষম সমস্যা; এই বিলোপের প্রকৃত কারণ ও তাহার ক্রিয়া প্রণালী কল্পনা করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। তথাপি আমরা জ্ঞানে বুঝিতেছি যে, প্রত্যেক জীবশাখা নানাবিধ কারণ বশতঃই বংশবৃদ্ধি করিতে প্রতিহত হইতেছে; তাহার উপর যদি কোন কারণ নূতন আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে উহাদিগের সংখ্যা হ্রাস হইবেই; এবং হ্রাস হইতে হইতে অগ্রপশ্চাৎ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অধিকাংশ স্থলেই এক জাতি অপরজাতিকে পরাজিত করিয়া অচিরেই পরাজিতের ধ্বংস সাধন করে, তাই সে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ভাব ও কর্ম্ম।

মানবীয় কর্ম্ম প্রধানতঃ ভাবজ। প্রথমে ভাব, তৎপর কর্ম্ম। সকলেই জানেন, আমাদিগের ভাব মস্তিষ্কে। ভাব-তরঙ্গ মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ু (১) যোগে পেশীতে আসিয়া উপস্থিত হয়; তাহাতেই হস্ত-পদাদি-সঞ্চালনে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অভ্যাসবশতঃ এই প্রক্রিয়া এত দ্রুত বেগে ও অনায়াসে সাধিত হইতে পারে যে, মনে হয়, যেন কর্ম্ম আপনা হইতেই হইতেছে। ভাব ও কর্ম্মের সমন্বয় করিয়া কত পরিশ্রমে শিশু লিখিতে শিখে; কিন্তু আমরা অভ্যাসবশতঃ অনায়াসেই লিখিতে পারি; প্রত্যেক অক্ষর আর ভাবিয়া গণিয়া লিখিতে হয় না। যেন আপনা হইতেই লেখা বাহির হয়। দেহ-যন্ত্র অভ্যাসবশতঃ প্রবণতা (Pre-disposition) প্রাপ্ত হয়। তখন ভাবের উদ্গমমাত্রেই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যথাযোগ্যরূপে আন্দোলিত হয়; এবং কর্ম্ম তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হয়। যাহা হউক, মানবীয় কর্ম্ম মূলে ভাবজ; তবে অভ্যাসবশতঃ অনায়াসসিদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

এতদ্দেশে পুরাকাল হইতে দুই মত প্রচলিত আছে। এক মতে কর্ম্ম পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট; উহা অদৃষ্টের ফলে উৎপন্ন হয়; মানবের বর্ত্তমান ভাব হইতে নহে। অন্য মতে, কর্ম্ম অদৃষ্ট ও পুরুষকার উভয়েরই অপেক্ষা করে; এবং পুরুষকার বর্ত্তমান ভাব হইতে উৎপন্ন হয়।* আমরা এই দ্বিতীয় মত অনুসারে ভাব ও কর্ম্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইলাম। আমাদিগের অদ্যকার আলোচ্য বিষয় ভাবজ কর্ম্ম। যাহা ভাবজ, তাহা কিরূপে নিষ্পন্ন

---

(১) প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে Nerve অর্থে স্নায়ু শব্দই প্রযুক্ত হইল।

* We now know that each act of the will is as fatally determined by the organisation of the individual and as dependent on the momentary condition of his environment as every other psychic activity. The character of the inclination was determined long ago by heredity from parents and ancestors; the determination to each particuler act is an instance of adaptation to the circumstances of the moment wherein the strongest motive prevails, according to the laws which govern the statics of sensation. Haeckel—The Riddle of the Universe. ch VII p 47.

হয়? এই বিষয়েই আপনাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। বিষয়টি অতীব গুরুতর, কিন্তু কর্ম্মী অথবা কর্ম্মেচ্ছুগণের অবশ্য আলোচ্য। এই গুরুতর বিষয়ের যথাযোগ্য আলোচনা করিতে পারি, এরূপ উপযোগিতা আমার নাই; তথাপি দুই একটী কথা আপনাদির সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি। আপনারা কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ ও মনন করিলে কৃতার্থ হইব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভাবজ কর্ম্মের মূল ভাব; এবং মস্তিষ্ক পদার্থই ভাবের আধার। মানবের মস্তিষ্ক এতই জটিল যে, উহার স্বরূপ নির্ণয় করা অতীব কঠিন। তবে এ কথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, উহার প্রত্যেক অংশই প্রত্যেক ভাবের আধার নহে। যে সকল মস্তিষ্ক-কোষের ক্রিয়া একরূপ জানা যাইতেছে, তাহাতে অনুমান হয় যে, উহার বিভিন্ন কোষগুচ্ছ ও তৎসংলগ্ন স্নায়ু তন্তু সকল যেন বিভিন্ন ভাবের আধার। এইরূপ কোষ-গুচ্ছকে আমি কেন্দ্র নামে অভিহিত করিব। মোটামুটী বলিতে গেলে মস্তিষ্ক পদার্থ যেন কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিভক্ত; আর এই সকল বিভিন্ন কেন্দ্র বিভিন্ন ভাবের উৎপত্তি স্থান। এক কেন্দ্র পীড়িত অথবা নষ্ট হইলে, অন্য কেন্দ্র তাহার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারে। এই মত অদ্যাপি সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই; কিন্তু নিত্যই ইহা অধিকতর সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, "মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশ যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আধার, এ কথা কোন শরীরতত্ত্বজ্ঞই অধিকক্ষণ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। (২) এই সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়। যদি তাহাই হইল, তবে যেভাব যে কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সেই ভাবের মূলীভূত কেন্দ্রকে যথাযোগ্যরূপে উত্তেজিত করিতে পারিলেই সেই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবার পথ পরিষ্কৃত হইবে। কিন্তু মানবের মনে যুগবৎ বিরোধী ভাব সকল অনেক সময় উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ বিরোধী ভাবকে রোধ করিতে না পারিলে, কর্ম্ম প্রতিরুদ্ধ হইবে। সুতরাং যেমন উপযুক্ত ভাবের উত্তেজনা আবশ্যক, তেমনই বিরোধী ভাবের উত্তেজনাও রোধ করা প্রয়োজন। নচেৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে পারে না। একটি জলমগ্ন

---

(2) No physiologist can long resist the conviction that different parts of the cerebrum subserve different kind of mental action.

Ency. Brit vol. 18. p. 847.

ব্যক্তিকে উদ্ধার করিব,—এই ভাবে উত্তেজিত হইলাম। স্বয়ং জলে ঝাঁপ না দিলে ঐ কর্ম্ম হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষা-বৃত্তি আসিয়া ঐ ভাবের গতি রোধ করিল। তখন ভাবিলাম,—জলে ঝাঁপ দিলে নিজে মারা যাইতে পারি। এরূপ অবস্থায় জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হইল না। সুতরাং উপযোগী ভাবের অনুশীলন ও বিরোধী ভাবের গতিরোধ—এতদুভয় যুগপৎ সাধিত না হইলে, কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে পারে না। বিরোধী ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে যে ভাব প্রবল হয়, কর্ম্ম তাহাকেই অনুসরণ করে।

বিরোধী ভাব নানা প্রকার; কিন্তু সে সকলের সাধারণ লক্ষণ—দুঃখাশঙ্কা। "দুঃখং মে মা ভূয়াৎ" ইহাই জীবের আকাঙ্ক্ষা। বর্ত্তমান অথবা ভবিষ্যৎ দুঃখ আশঙ্কা করিলেই কর্ম্মও প্রতিহত হয়। সে দুঃখ বাস্তবিকও হইতে পারে, কাল্পনিকও হইতে পারে। ব্যক্তিগত, অথবা পারিবারিক অথবা সামাজিক, সর্ব্ব স্থলেই আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক, আধিভৌতিক দুঃখাশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। এই সকল দুঃখ একত্র অথবা পৃথক-রূপে বিরোধী কারণস্বরূপ কল্পিত হয়। তখনই মূল ভাব বাধা প্রাপ্ত হয়। আর ঐ ভাব ও বাধার মধ্যে যেটি প্রবল হয়, কর্ম্ম তাহাকেই আশ্রয় করে। বাধা কর্ম্মারম্ভে, অথবা তৎপরেও উপস্থিত পারে। যখনই উপস্থিত হউক, উহার প্রতিক্রিয়াবশতঃ মূল ভাব আচ্ছন্ন হইলে কর্ম্ম রূদ্ধ হয়। কিন্তু যদি উহা মূল ভাবকে আরও উত্তেজিত করে, তবে উহার সংঘর্ষ লাভ করিয়া কর্ম্ম দৃঢ়রূপে অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল স্থলে বাধাই কর্ম্মের সহায়। যেমন দুঃখাশঙ্কা কর্ম্মের বাধক, তেমনই সুখের আশা কর্ম্মের সহায়। "সুখং মে ভূয়াৎ"—সুখ সকলেই ইচ্ছা করে। কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে যে সুখ হইবে, সেই সুখে দৃঢ় প্রত্যয় ও মতি থাকিলে, মানব ভবিষ্যৎ-নেত্রে সে সুখের চিত্র দর্শন করে; সিদ্ধির সুখ কল্পনা করিয়া মানব উৎসাহিত হয়, (৩) তখনই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, সমাজের পক্ষেও তেমনই।

কর্ম্মকে ব্যক্তিগত ও জাতিগত হিসাবে দুই দিক হইতে বিবেচনা করা যাইতে পারে। যে কর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনীয়, তাহা জাতীয় প্রয়োজনের অনুকূল হইতেও পারে, নাও পারে। জীবগণ: কেহ বা স্বতন্ত্ররূপে

(৩) রামকৃষ্ণ-কথামৃত।

যীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সমাজবদ্ধ হয় নাই, আর কেহ বা সমাজবদ্ধ হইয়া নিজের ও সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। সামাজিক জীব স্বার্থ ও পরার্থ,—এই উভয়বিধ ভাবে পরিচালিত হয়। পিপীলিকা-শ্রেণীর কর্ম্মিগণ পরার্থের চরম উদাহরণ। ইহারা স্ত্রী-জাতীয়, কিন্তু ডিম্ব প্রসব করে না। যিনি এ সমাজের মাতৃরূপা, ডিম্বপ্রসবিনী, তিনি ডিম্ব প্রসব করিয়া জাতীয় উদ্দেশ্য সাধন করেন। কিন্তু যাহারা কর্ম্মী, তাহারাই ঐ ডিম্ব সকলকে প্রতিপালন করে; মাতৃরূপিণীকে আহার দেয়; দলে দলে বিভক্ত হইয়া সমাজকে শত্রু হইতে রক্ষা করে। ইহারা কেবল পরার্থেই জীবন ঢালিয়া দিয়াছে। সমাজ-বদ্ধ জীব সম্পূর্ণ স্বার্থ-সেবী হইতেই পারে না। হইলে সমাজ কিছুতেই টিকিতে পারিবে না। অ-সমাজ-বদ্ধ জীবেরা সর্ব্ব বিষয়ে অন্যের নিরপেক্ষ। কেবল বংশ-রক্ষণ ব্যাপারে পরের সহায়তা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যাহারা স্ত্রী-পুং-ভেদযুক্ত অথচ সমাজ-বদ্ধ নহে, আমি তাহাদিগের কথাই বলিতেছি। এই এক কর্ম্ম, অর্থাৎ বংশ-রক্ষণ ব্যতীত অন্য কোনও কর্ম্মে ইহারা পরার্থের অনুসরণ করে না। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব স্বার্থ ও পরার্থ উভয়ই সাধন করিয়া থাকে। ইহারা (প্রধানতঃ মানব) সমাজ-রক্ষার্থ সামাজিক নিয়ম সকল রচনা ও পালন করে এবং কালক্রমে সমাজের পরি-বর্ত্তনের সহিত ঐ সকল নিয়মের পরিবর্ত্তন ও নূতন নিয়ম প্রচলিত করে। কিন্তু সমাজ যখন ভগ্নদশায় উপস্থিত হয়, তখন এ শক্তি প্রায় সজীব থাকে না; সুতরাং স্বার্থই প্রবল হইয়া উঠে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই উভয়বিধ কর্ম্মই পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল। চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার প্রতিক্রিয়া বংশানুগত হওয়াতে, জীব উত্থান পতনের মধ্য দিয়া নিম্ন হইতে উচ্চ পদবীতে উন্নত হইয়াছে। যদিও ইহাই একমাত্র কারণ নহে, তথাপি দেহ ও মন উভয়ই আদি কাল হইতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীনতা করিতেছে। নিম্ন জীবগণ এই অবস্থার সম্পূর্ণ অধীন। কিন্তু মানব এক দিকে যেমন অবস্থার দাস, অন্যদিকে তেমনই অবস্থার প্রভু। পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানবকে এক দিকে যেমন পরিচালিত করিতেছে, অন্য দিকে সেও বুদ্ধিবলে ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করিতেছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ রে লাঙ্কেষ্টার সত্যই বলিয়াছেন, Man is nature's rebel * * * Her insurgent son (৫)"—মানব, প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান। এই মহাবাক্যের মর্ম্ম এরূপ

নহে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্থির থাকিলেও মানব তাহার নিয়ম সকল লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়; তাহা কখনই হইতে পারে না। প্রকৃতি অলঙ্ঘ্য প্রভাবে আপন কঠোর নিয়ম জীব-নির্ব্বিশেষে সকলের উপরই পরিচালন করেন। মানবকে অব্যাহতি দেন না। কিন্তু মানব স্বীয় বুদ্ধিবলে উদ্দেশ্যের উপযোগী ভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সক্ষম হয়; তাই সে প্রকৃতিকে পরাজয় করে। মানবীয় উন্নতির প্রধান উপায়ই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করা এবং তাহার ফল বংশানুগত করা। ইহাই তাহার বিদ্রোহ, ইহাই তাহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা। এই স্থলেই মানবীয় ভাবের প্রাধান্য, মানবীয় ইচ্ছার আধিপত্য। নিম্ন জীবগণের এ ভাব নাই, তাই তাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং ঐ অবস্থার উপযোগী হইলে বাঁচিল, নচেৎ নির্ম্মূল হইয়া গেল। যোগ্যতমের জয়,—এ নিয়মের ইহাই প্রকৃত রহস্য। প্রকৃতি অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, যে তাহার উপযোগী, সেই বাঁচিবে;—অন্যে নহে। নিম্ন জীবগণ প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না; তাই তাহারা এই কঠোর নিয়মের দাসত্ব করে। বিদ্রোহী মানব কালক্রমে এ নিয়ম হইতে এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে যে, (৬) এখন সে প্রকৃতির প্রভু। যে দিন এই প্রভুত্ব হইতে মানব তিলমাত্র স্খলিত হইবে, সে দিন তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠাও শেষ হইবার সূত্রপাত হইবে। প্রভুত্ব ছাড়িলেই ক্রমে দাসত্ব উপস্থিত হইবে। তখন বিবিধ মানব-সমাজ মধ্যে অযোগ্যের স্থান থাকিবে না। সুতরাং মানবীয় ভাবের আধিপত্য, মানবীয় ইচ্ছার প্রাধান্য স্থির রাখিতেই হইবে। নতুবা কোনও নির্দ্দিষ্ট মানবসমাজই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। মানব আপন ইচ্ছার জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছে; (৭) সে পতাকা

---

(৫) Nature and Man p. 23—3.

(৬) At every step of his progress man has receded further and further from the ancient rule exercised by nature.

Ibid p. 22.

(৭) The standard raised by the rebel man * * is one of ideal comfort, prosperity and conscious joy in life—imposed by the will of man involving a control * * of nature's methods of dealing with life.

Ibid P. 23.

আর সে নামাইতে পারিবে না; সে পতাকা হস্ত হইতে স্খলিত হইলেই পরাজয় অনিবার্য্য। সুতরাং পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থাকে আপন বশে আনিতেই হইবে, নচেৎ মানবের আত্ম-প্রতিষ্ঠার অন্য উপায় নাই।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বিবিধ,—জড় ও জীব। এতদুভয়ে প্রকৃত প্রভেদ থাকুক আর নাই থাকুক, ব্যবহারে-ভেদ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। জড়-প্রকৃতি,—মৃত্তিকা, জল, বায়ু, শীত, তাপ ইত্যাদি; জীব-প্রকৃতি,—নিম্ন জীব হইতে মানব পর্য্যন্ত। এই উভয় প্রকৃতিই মানব-সমাজের শত্রুতা করিতে সক্ষম হয়। মৃত্তিকা, জল, বায়ু মানবের দেহ ও মনকে এত প্রপীড়িত ও বিধ্বস্ত করিতে পারে যে, মানব আত্ম-রক্ষা করিতে সক্ষম নাও হইতে পারে। তদ্রূপ স্থলে ঐ সকলকে স্বীয় উদ্দেশ্যের অনুকূলরূপে পরিবর্ত্তিত করিতেই হইবে। জড়-প্রকৃতি যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট মানবজাতিকে দুর্ব্বল ও প্রপীড়িত করিয়া ক্রমে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তন না করিলে, মানব কখনই আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। জীব-প্রকৃতি কীট, পতঙ্গ হইতে মানব পর্য্যন্ত যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট মানব-সমাজের প্রতিকূল ব্যবহার করে, তাহাকে আপনার আয়ত্ত করিতেই হইবে। বিবিধ কীটশ্রেণী নানা রূপ পীড়ার উৎপাদন করিতেছে; সিংহ ব্যাঘ্রাদি মানবকে বিনষ্ট করিতেছে; এক মানবসমাজ অন্য মানব-সমাজকে উৎপীড়িত করিতেছে; এ সকল অবস্থায় তাহাদিগকে নষ্ট, নিবৃত্ত, অথবা স্বীয় উদ্দেশ্যের অনুকূল করিতে না পারিলে, আত্মরক্ষা কখনই হইতে পারে না। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের আদিমনিবাসিগণ পারিপার্শ্বিক মানব-উৎপীড়নে একেবারেই বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তাহাদিগের গোষ্ঠী এক্ষণে লুপ্তপ্রায়। তাহারা ঐ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর জয়ী হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ দ্বিবিধ পারি-পার্শ্বিক অবস্থারই আধিপত্য স্বীকার করিয়া আসিতেছে; তাহার উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। এ নিমিত্ত তাহাদিগের, অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর, সংখ্যা ক্রমে ন্যূন হইয়া আসিতেছে। দেহ ও মন ক্রমেই অবসন্ন ও জীবন-ব্যাপারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িতেছে। গত ৫০ বৎসরে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে, এবং দেহ ও মন জীর্ণতার দিকে অনেক অগ্রসর হইয়াছে। (৮) এই ধ্বংসাভিমুখ গতি অপ্রতিহত

(৮) The experience of the last 50 years goes to shew that four or five

থাকিলে ইহার পরিণাম কি হইতে পারে, তাহা কল্পনার অবিষয় নহে। (৯) প্রাচীন গ্রীক্, রোমান্ ও ইজিপ্‌শিয়ান্‌গণের দৃষ্টান্ত ধ্বংসের পথ দেখাইয়া দিতেছে। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপ্রতিহত থাকিলে, এ পরিণাম অনিবার্য্য। জাতীয় জীবন রক্ষা করিতে হইলে, পারিপার্শ্বিক জড় ও জীব প্রকৃতিকে পরাস্ত করিতে হইবে। এতদ্দেশের জল, বায়ু ও মৃত্তিকা; পীড়ার বীজ স্বরূপ কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিদাদি; প্রতিকূল মানব পীড়ন,—এ সকল হইতে আত্মরক্ষা করিতেই হইবে, ইহাতে গত্যন্তর নাই।

কেবল তাহাই নহে। সমাজ-বদ্ধ মানব সমাজ-রক্ষার্থ এক সময়ে যে সকল নিয়ম পালন করে, কালক্রমে তাহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়। এতদ্দেশীয় স্মৃতিশাস্ত্র ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ। কিন্তু যদি সমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থাতেও ঐ সকল নিয়ম অসংস্কৃতরূপে প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে সমাজ ক্রমে অবনতির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। এ স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দিব। উপরে বলিয়াছি, এতদ্দেশীয় হিন্দুগণের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। ১৯০৫ সালে জন্মের সংখ্যা প্রতি সহস্র জনে প্রায় ৪০টি ছিল; কিন্তু ১৯০৬ সালে উহা প্রায় ৩৭ এবং ১৯০৭ সালে প্রায় ৩৩টী মাত্র হইয়া গিয়াছে। তবেই জন্মের সংখ্যা কমিতেছে। মৃত্যুর সংখ্যা ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালে প্রতি সহস্র জনে প্রায় ৩৬টা ছিল। কিন্তু ১৯০৭ সালে উহা প্রায় ৩৮ হইয়াছে। তবেই মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িতেছে। সুতরাং বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে জন্মের, অন্ততঃ জীবিতের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে এবং মৃতের সংখ্যা কমাইতে হইবে। বিজ্ঞান বলিতেছে,—বাল্যবিবাহ অপেক্ষা অধিক বয়সের বিবাহেই অপত্য জন্মেও অধিক, বাঁচেও অধিক। (১০) এক্ষণে কি কর্ত্তব্য? পুত্র কন্যাকে অধিক বয়সে বিবাহ দিবার সেই প্রাচীন প্রথা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে হইবে কি না? বাল্যবিবাহ পরিত্যাগ করিতে হইবে কি না?

---

decades more and very few of the higher and lower classes of Hindus will live to say that there was such a nation as the Bengalee Hindus.

A. B. Patrika—20. 7. 07.

(৯) Brahmin, Vaidyas, Kaisthas, Navasaks, Syeds and Pathans, these classes sooner or later must be wiped off from the face of the country. Ibid.

(১০) Late marriages are more prolific than early ones.

Stark Wheather—Law of Sex p. 75.

জনসংখ্যা বৃদ্ধি করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে এই ক্ষয়শীল সমাজে বিজ্ঞানানুমোদিত নিয়ম প্রতিপালন করিতেই হইবে। জড়-প্রকৃতির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা হইলেও জীব-বিজ্ঞানের নিয়ম লঙ্ঘন করা যায় না; করিলে বংশক্ষয় নিবৃত্ত করিবার উপায় নাই। নিম্ন শ্রেণীস্থ হিন্দু জাতির মধ্যে অনেকে বাধ্য হইয়া চির-কুমার-ব্রত অবলম্বন করে; অনেকে আবাল্য চির-বৈধব্য পালন করে। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয়, কি করিতে হইবে? এ সকল স্থলে বিবাহ-বিধির সংস্কার অত্যাবশ্যক। নতুবা আত্মরক্ষার উপায়ান্তর কি? কল্পিত আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যেমন জড় ও জীব প্রকৃতিকে পরাজয় করা আবশ্যক, তেমনই সামাজিক নিয়মাবলীও তদনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। আমার মনে হয়, এই শেষোক্ত বিষয় পূর্ব্বোক্তেরই অন্তর্গত।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—জড় ও জীব প্রকৃতিকে পরাজয় করিবার উপায় কি? এবং কি করিলে সেই উপায় কার্য্যে পরিণত হইতে পারে? জড় প্রকৃতি বিজ্ঞানানুমোদিত বুদ্ধিবলে পরাজিত হয়। মানবেতর জীব-প্রকৃতিও তাহাই। এ নিমিত্ত মানব এতদুভয়ের নিয়ম সকল অবগত হইয়া বিজ্ঞানবলে ক্রমশঃ স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইতেছে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট মানব-সমাজ অপর মানব-সমাজ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে কি করিবে? ইহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। বিবিধ বিজ্ঞান, ইতিহাস ও পুরাবৃত্তাদি শাস্ত্র-সম্মত উপায়ের নিকট মানবও পরাভূত হয়। কিন্তু এ বিষয় সম্যক্‌রূপে আলোচিত হইতে পারে না; হইতে পারিলেও আপনাদিগের নিয়মানুসারে নিষিদ্ধ হইত। বাহুবল, চরিত্রবল, মনের বল, এ সকলের সম্মিলন অতীব দুরূহ ব্যাপার। যাহা হউক, আমি উপায় অবধারণ করিতে বিরত হইলাম। উপায় যাহাই হউক, কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে কি প্রকারে? ইহাই আমাদিগের প্রশ্নের দ্বিতীয় বিভাগ। কর্ম্মই আমাদিগের আলোচ্য, সুতরাং সেই বিষয়ে আপনাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

বলিয়াছি,—কর্ম্মের মূলে ভাব। ভাব যে সকল স্থলে কর্ম্মে পরিণত হয় না, তথায় নিশ্চয়ই প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ বিরোধী কারণ কল্পনা করিতে হয়। এ স্থলে একটি নির্দ্দিষ্ট সমাজ মানস-পটে অঙ্কিত করুন। বিবেচনা করুন, কোনও নির্দ্দিষ্ট মানব-সমাজ জড় ও জৈব, পারিপার্শ্বিক অবস্থাধীনে ক্রমে দুর্ব্বল, ভীরু, উদ্ভাবনী-শক্তিহীন ও অকর্ম্মণ্য হইতেছে। তাহাদিগের সংখ্যা দিন দিন

হ্রাস হইতেছে। বিবেচনা করুন, সে সমাজ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং চতুষ্পার্শ্বে প্রতিকূল সমাজে বেষ্টিত; কিন্তু সেই ক্ষুদ্র সমাজের কতিপয় ব্যক্তি অল্লাধিক ভাব বিশিষ্ট; আর সেই প্রতিকূল সমাজ নিজের ও অপরের প্রবল শক্তিতে শক্তিমান্। এরূপ স্থলে ঐ ক্ষুদ্র সমাজ আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবে কি প্রকারে? উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে না। কর্ম্ম কিরূপে অনুষ্ঠিত হইবে, এবং কিরূপেই বা তাহা স্থায়িরূপে অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই বিবেচ্য।

যখন ভাবজ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই, হয় ত সম্যক্‌রূপে ভাব উত্তেজিত হয় নাই; অথবা সিদ্ধির উপায় অপরিজ্ঞাত; নচেৎ বিরোধী কারণ বাধা দিতেছে। সম্যক্‌রূপে ভাব উত্তেজিত হইলে, ভাবজ কর্ম্ম সহস্র বাধা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবেই। বিরোধী ভাব হইতে মূল ভাবের শক্তি অধিক হইলে, বিরোধী ভাব পরাস্ত হইবেই। ভাব জিহ্বাগ্রে থাকিবার বিষয় নহে; উহা মস্তিষ্কের কেন্দ্র-নিহিত। একাগ্র ভাব অদমনীয়। আমি অন্যত্র বলিয়াছি,—

ভাবে মত্ত হৃদি যার, সুখ-দুঃখ-জ্ঞান
সকলই নিমেষে তার হয় অন্তর্ধান।
চেষ্টামাত্র সার হয়; একাগ্র হৃদয়
আপনি সুসিদ্ধি আনি' অমনি মিলায়।
* * * * * *
* * * * * *
* * * 'ভাবের অভাবে
দ্বৈধ, চিন্তা, অসাহস, অলস প্রভাবে
হৃদয় ছাইয়া ফেলে; দূরে যায় চলি'
সাহস উদ্যম চেষ্টা; অমনি সকলি,
নিতান্ত নিষ্ফল হয় চিরদিন তরে;
তাই অধঃপাতে জীব যায় এ সংসারে। (১১)

বিরোধী কারণ উপস্থিত থাকিলেই বুঝিতে হইবে, একাগ্র ভাবের অভাব। যদি তাহাই হইল, তবে ভাবের স্ফুরণ করিতে হইবে; আবাল্য সেই ভাবে গড়িয়া উঠিতে হইবে। মস্তিষ্কের উপযুক্ত কেন্দ্র যথোচিতরূপে আন্দোলিত করিতে হইবে। বাল্যকাল হইতে বাঞ্ছিত ভাবের অনু-

(১১) প্রশ্ন; পৃঃ ৯—১৩।

স্থূল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কর্ম্ম নীরবে করিয়া যাইতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম করিতে করিতেই ভাবের স্ফুরণ ও কর্ম্মের প্রবণতা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন ভাব ও কর্ম্ম পরস্পর পরস্পরকে উত্তেজিত করে; তখন একের সহায়তায় অন্যে পরিপুষ্ট হয়; এবং সিদ্ধির উপায় অপরিজ্ঞাত থাকিলেও, ক্রমেই তাহা আবিষ্কৃত ও স্বতঃপ্রকটিত হইতে আরম্ভ করে। বাঞ্ছিত ভাবের উপদেশের শ্রবণ, মনন ও ধ্যান; তদ্ভাবপূর্ণ-গ্রন্থাধ্যয়ন; চরিত্রবান ভাবুকগণের সঙ্গ ও তাঁহাদিগের কর্ম্ম দর্শন;—এ সকলই ভাবোদ্গমের ও উপায়-উদ্ভাবনের অনুকূল। সৎসঙ্গ অশেষ ফলপ্রদ; এ নিমিত্ত সভা সমিতির আবশ্যকতা আছে। কিন্তু সে কেবলই ভাবে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য, ভাব ও কর্ম্মে সমন্বয় করিবার নিমিত্ত; অন্য কারণে নহে। কিন্তু যখন সভা সমিতিতে বিরোধী শক্তির ঈপ্সিত পথে লইয়া যায়, তখন সঙ্গ অন্বেষণ করিতে অন্য উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

তার পর ভাবের উত্তেজনা যাহাতে ক্ষণিক না হইয়া স্থায়ী হইতে পারে, তদ্বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। ভাবের ব্যক্তিগত স্থায়িত্ব, সেই ব্যক্তির চরিত্রের উপর নির্ভর করে। আমার মনে হয়, যাহার চরিত্রে গাম্ভীর্য্য নাই, হৃদয়ে প্রকৃত বেদনানুভূতি নাই, যে চটুল ও বাচাল, তাহার ভাব স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। যাহার চরিত্র বিশুদ্ধ, যে ঐশী শক্তিতে আস্থাবান, স্থায়িত্ব তাহার হৃদয়কেই আশ্রয় করে। জগতে কর্ম্মবীরগণের জীবন-চরিত মুক্তকণ্ঠে ইহাই বলিতেছে। ব্যক্তিগত ভাবের স্থায়িত্ব চরিত্রের সহচর। কিন্তু ভাবকে বংশগত স্থায়িত্বও দেওয়া আবশ্যক। মানবের দেহ ও মন উভয়ই বংশানুক্রমের নিয়ম সকলের অনুসরণ করে। যাঁহাদিগের দেহ ও মন বাঞ্ছিত ভাবের অনুকূল, তাঁহারা পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হইলে ঐ ভাব অপত্যে জন্মগত হইবার আশা করা যায়; আর তাহা হইলে সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গের গুণে ঐ ভাব হইতে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হওয়াও সম্ভব। ক্ষণিক উত্তেজনামাত্রই সার হইলে বিশেষ কোনও ফল নাই। ভাবকে বংশানুগত স্থায়িত্ব দিতেই হইবে। নতুবা ভাব কখনই সমাজের অঙ্গীভূত হইবে না; উহা কেবল ব্যক্তিবিশেষের ক্রীড়ণকমাত্র হইতে পারে, আর কিছুই নহে। একাগ্র ভাব মস্তিষ্কের ভাব-কেন্দ্র সকলকে উত্তেজিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া, অবশেষে নর নারীগণের শুক্র শোণিতেও এরূপ কৌষিক পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে যে, ঐ ভাব বংশানুক্রমের নিয়ম-

অনুসারে অপত্যে সংক্রমিত হয়। ইহাতে ভাব বংশানুগত স্থায়িত্ব লাভ করে।*

সমাজ সম্বন্ধে বলিতে আর একটী কথা মনে হয়। ভাব ও কর্ম্মে যোগ করিতে হইলে, সমাজের দিকে লক্ষ্য থাকা চাই। ব্যক্তিকে ভুলিতে পারিলেই ভাল হয়; অন্ততঃ তাহাকে সমাজের অধীন করিতেই হইবে। ব্যক্তি চরিত্রগুণে সমাজের অনুগত হয়, ভালই; অন্যথা নিন্দা, প্রশংসা ও দণ্ড পুরস্কারের দ্বারা এই কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইবে। এ সকলের অসীম শক্তি; যে কর্ম্মের দশ জনে নিন্দা করে, তাহা না করিবার এবং যে কর্ম্মের দশ জনে প্রশংসা করে, তাহা করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। দশের প্রশংসা কর্ম্মের বিশেষ প্রবর্ত্তক। (১২) সমাজস্থ লোকের প্রশংসা লাভ করিবার নিমিত্ত আত্ম-স্বার্থ ত্যাগ করিয়াও মানব কর্ম্ম করিতে উদ্যত হয়। তখন ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা করিবার ইচ্ছা হয়। সমাজ-বদ্ধ মানবের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ব্যক্তিগত স্বার্থকে এইরূপে সামাজিক স্বার্থে মিশাইয়া দেওয়া আবশ্যক। স্বার্থকে পরার্থের অনুগত ও অন্তর্গত করিতেই হইবে। কেবল নিজের ভাবিব, অন্যের ভাবিবই না, ইহা হইলে সমাজ হইতেও পারে না, থাকিতেও পারে না। ইহারও প্রধান সাধন আবাল্যের ব্যবহার ও আচরণ, সৎসঙ্গ ইত্যাদি, যাহা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে এবং সে সাধনাকে বংশগত করিতে নর নারী উভয়েরই সহায়তা আবশ্যক। বংশ উভয়ের কর্ম্ম, একের নহে। সুতরাং ইহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে যে, দম্পতীর মধ্যে একের ভাবশূন্যতায় অপত্যের মস্তিষ্কে অল্লাধিক জড়তা আসিবার বিশেষ সম্ভাবনা। দম্পতীর মধ্যে এক জন অথবা দুইই যদি ভাবহীন হয়, অপত্যের কি দশা হইবে? সে জাতি কত দিন টিকিবে? যাহার নিজের মস্তিষ্কের

---

* I am convinced that the great laws of progressive heredity and of the correlative functional adaptation apply to the soul as well as to the body. The new characteristics which the individuals has acquired during life may react to some extent on the molecular texture of the germplasm in the egg cell and sperm cell, and may thus he transferred to the next generation by heredity in certain conditions (naturally, only in the form of latent energy), Haeckel The Riddle of the Universe, ch. VIII p. 50.

(১২) Whenever public opinion is roused, it will lead to action.
Nature, June. 13, 1907.

কেন্দ্র সকল নিদ্রিত রহিয়াছে, সুশিক্ষা, সৎসঙ্গ, বহুদর্শিতা প্রভৃতি গুণে যাহার মস্তিষ্কের স্ফুরণ হয় নাই, চরিত্র সুগঠিত হইবার পথে অগ্রসর হয় নাই, বাহ্য জগতের উত্থান পতনের সংঘর্ষ আজীবন যাহার হৃদয়কে আন্দোলিত করে নাই, এমন নারীর এমন নরের অপত্য হইতে আমরা কি প্রত্যাশা করিতে পারি? অধঃপতনের গতি নিবৃত্ত করিতে হইলে, জাতিকে হাত ধরিয়া তুলিতে হইলে, দম্পতীর মধ্যে কাহাকেও লোক-লোচনের অন্তরালে আজীবন লুকাইয়া রাখিলে চলিবে না। ইহা নিশ্চিত যে, যে জাতির অর্দ্ধাংশ মৃতপ্রায় সে জাতি মৃত্যুর পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এ স্থলে আবার সেই পূর্ব্বকথা স্মরণ করুন। জীব ও জড় প্রকৃতির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেও, মানবসমাজের বিধি ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে কি না, তাহা বিবেচনা করুন।

আমি বলিয়াছি,—ভাবের একাগ্রতায়, ভাবের মত্ততায়, বাধা পরাস্ত হয়। কিন্তু সর্ব্বত্র তদ্রূপ একাগ্রতা উৎপন্ন হইতে পারে না। বহু ক্ষেত্রে বিরোধী কারণ আসিয়া উপস্থিত হইবেই। আমরা যেরূপ সমাজের কথা কল্পনা করিয়াছি, তাহাতে বিরোধী ভাবের প্রবলতা অনেক সময় লক্ষিত হইবে। ঐ সমাজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়াবশতঃ যেরূপ হীন দশায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে বহু বাধা লক্ষিত হইবেই। জড় প্রকৃতি, জীব-প্রকৃতি, উভয়ই তাহাকে অবসন্ন করিবে। এ ক্ষেত্রে জড় প্রকৃতিকে শাসন ও আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত অকঠিন। যদি তাহা পারা যায় ভালই; নচেৎ সে স্থানই ত্যাগ করা শ্রেয়। জীব-প্রকৃতির অধীনতায় দেহ ও মন যে ভাবে অবনত ও ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা অতীব শোচনীয়। এ স্থলে পরিপুষ্ট কীটের কথা স্মরণ করুন। পারিপার্শ্বিক জৈব অবস্থার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে যে দুর্দ্দশা হয়, পরনির্ভরতা যে বিষময় ফল উৎপন্ন করে, তাহার চরম দৃষ্টান্ত পরপুষ্ট কীট। উহারা নিজের চেষ্টায় জীবনব্যাপার সম্পন্ন করে না। এ নিমিত্ত উহাদিগের দেহ ও মন ক্রমে অধঃপাতে যায়। অনেক পরপুষ্ট কীট মুখ ও উদর পর্য্যন্ত এই কারণেই হারাইয়াছে। স্বচেষ্টায় আহার করিতে হয় না, তাই মুখ ও উদর লুপ্ত হইয়াছে। যখন স্বাবলম্বনপরায়ণ ছিল, তখন মুখও ছিল, উদরও ছিল; কেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল। যে অবধি পরপ্রত্যাশী হইল, তখন হইতে কেবল ডিম্বাধারে পরিণত হইয়াছে। জীবতত্ত্ববিৎ উইস্‌ম্যান্ স্বীয় Heridity নামক গ্রন্থে

বিস্তৃতরূপে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। (১৩) অধ্যাপক রে ল্যাঙ্কেষ্টার বলিয়াছেন,—"স্বাবলম্বন ত্যাগ কর; অমনই হস্ত, পদ, চক্ষু কর্ণ সকলই যাইবে; পরিশ্রমী উচ্চভাবাপন্ন পতঙ্গ প্রভৃতিও এ বৃত্তির অভাবে কেবলমাত্র ডিম্বাধারে পরিণত হয়। মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র ও অস্ফুট হইয়া যায়; জীব যেন মোহনিদ্রায় অভিভূত হয়।" (১৪) অধ্যাপকবর ভিন্ন ভিন্ন পরপুষ্ট জীবের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহা জীবতত্ত্বের বহু-প্রমাণিত সত্য। পরতন্ত্রতা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই ভুলাইয়া দেয়। পক্ষী জাতির সমস্ত দেহ ও মন উড়িবার উপযোগিরূপেই গঠিত; কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ হইলে স্বচেষ্টায় জীবনব্যাপার সম্পন্ন করিতে হয় না; তখন সে উড়াও ভুলিয়া যায়। আমি যখন জীবতত্ত্ববিৎ Weir সাহেবের Dawn of Reason গ্রন্থে প্রথম সেই লাল পিপীলিকার বৃত্তান্ত পড়ি, তখন অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই। তিনি লিখিয়াছেন, (১৫) "এক শ্রেণীর লাল পিপড়ার নিকটে, ঠিক্ তাহার মুখের নীচে, প্রচুর খাদ্য রাখিয়াছিলাম; কিন্তু সে স্বাবলম্বন-বৃত্তি এতই হারাইয়াছে যে, খাদ্য নিকটে থাকিতেও খাইতে পারিল না। তখন একটি কাল পিপড়া তাহার নিকটে দিলাম; সেটি লাল পিপড়ার ভৃত্য। সে গিয়া লালকে খাওয়াইয়া দিল। তাহা না করিলে লাল মরিয়া যাইন,

(১৩) Heredity vol. II p 10—13.

(১৪) If the parasetic life be once secured, away go legs, jaws, eyes and ears * * *. The brain remains quite small and undeveloped * * * in fact has gone permanently asleep, and actually relapsed into a primitive stage. Ray Lankestar, Degeneration P. P. 39—46.

Sedgwik Life P. P. 91—93.

(১৫) I put some of these red slave-owners (ants) into a glass jar in which I placed au abundance of food. Notwithstanding the fact that this food was easy of access, being in fact immediately beneath their jaws they would not touch it. I then placed a black slave in the jar; she at once went to her masters, and after thoroughly cleaning them with her tongue, gave them food. These red ants would have starved to death in the midst of plenty if they had been left to themselves.

Dawn of Reason p. 155.

তথাপি আপন চেষ্টায় খাইত না।” প্রভু হও, দাস হও, স্বাবলম্বন-বৃত্তি হারাইলে এই দশাই উপস্থিত হইবে, ইহা নিশ্চিত। জড় ও জীবপ্রকৃতির প্রতিকূল শক্তিপ্রভাবে ক্রমে এই অবস্থাই উৎপন্ন হয়। পরতন্ত্রতায় দেহ, সুতরাং মনও একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। (১৬) সুতরাং কর্ম্ম সুদূরপরাহত হয়। পরপ্রত্যাশী লাল পিপীলিকা আহার্য্য গ্রহণ করে নাই কেন? আহার ত নিকটেই ছিল, ক্ষুধাও ছিল। আহার পরিপার্শ্বিক অবস্থা; ক্ষুধা দেহের অভাব। কেবল মস্তিষ্কের জড়তাবশতঃ এই দুই-এ সংযোগ করিবার ভাব ছিল না। তাই কর্ম্ম হইল না। (১৭) জড়তা দূর করিবার উহার নিজের সাধ্য নাই। কিন্তু তাঃপুরুষ কর্ম্মী পিপীলিকার সংযোগে অপত্য উৎপন্ন হওয়া যদি সম্ভব হইত, তবে উহার নিশ্চেষ্টতা বিদূরিত হওয়াও সম্ভব হইত। ভীরু, দুর্ব্বল, অকর্ম্মা কুকুরের সহিত সাহসী ও সবল ‘ডালকুত্তা’র সংযোগে যে কুকুর জন্মে, তাহার ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা অনেক দূরীভূত হয়। নির্জীব গরু ও সবল ‘বোগ্দা’ গরুর সংযোগে যে বাছুর হয়, তাহা সবল হয়। অশ্ব, মেষ, মহিষাদি সমস্ত জীবেই এইরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানব জীবরাজ্যের বহির্ভূত নহে; জীব-রাজ্যের নিয়ম সকল মানবেও প্রয়োজ্য। এ স্থলে ইংলণ্ডের আদিমনিবাসিগণের কথা স্মরণ করুন। রোমানগণের ছায়া-তলে উহারা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইত। সকল কর্ম্মই রোমানগণ করিত, উহারা সম্পূর্ণ পরপ্রত্যাশী হইয়া বসিয়া থাকিত। পরে যখন রোমানগণ আপনা হইতেই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রোম রাজ্যে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, তখন উহারা ঊর্দ্ধে বাহু তুলিয়া কাঁদিয়া বলিল, “আপনারা যাইবেন না, আমাদিগের কি দশা হইবে।” রোমানেরা শুনিল না; তাহারা চলিয়া গেল। এই সময় হইতে নানাদেশীয় লোক ইংলণ্ডীয়গণকে পরাজিত করিয়া প্রভু হইল। কালক্রমে আদিমনিবাসিগণের সহিত তাহাদিগের সংমিশ্রণে নূতন এক জাতি উৎপন্ন হইল। ইহারাই বর্ত্তমান ইংরেজ জাতি। ইহারা

---

(১৬) Mental and physical degeneration rather go hand in hand.
Heredity vol. II P. 22.

(১৭) এ দেশে এখনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, ইংরাজেরা অযোধ্যা রাজ্য অধিকৃত করিবার সময়ে তাহার স্বাবলম্বনশূন্য অকর্ম্মণ্য স্থূলোদর অধিপতি ওয়াজেদ আলি তাঁহার পাদুকা ঘুরাইয়া দিবার ভৃত্যকে নিকটে না পাইয়া, পলায়ন করিতে না পারায় চিরজীবন বন্দীভাবে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন!

কেমন আত্মনির্ভরপরায়ণ! আমি হিন্দু জাতিকে ঠিক এরূপ করিতে বলিতেছি না। কিন্তু বলসঞ্চয় করিতে হইল, বিবাহ-ক্ষেত্রের প্রসার-বৃদ্ধি করিতেই হইবে। বর্ণভেদ রক্ষা করিয়াও বিবাহ-ক্ষেত্র বিস্তৃত করা যাইতে পারে। কর্ম্মী, বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদি জাতির সহিত দুর্ব্বল অলসভাবাপন্ন তত্তৎ-জাতীয়ের বিবাহ বন্ধন হওয়া অত্যাবশ্যক হইয়াছে। ব্যবসায়িগণ গো, মেষ, মহিষ, কুক্কুর অশ্বাদি পশুগণকে ও বাজ, পারাবত, বুল্‌বুল্ প্রভৃতি পক্ষিগণকে এইরূপেই উন্নত অবনত করে। ইহাতে দেহ ও মন, উভয়েরই অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। যে মানব-সমাজ দিন দিন অবনত হইতেছে, এ উপায় তাহাদিগের সর্ব্বতোভাবে বিবেচ্য। জীব-বিজ্ঞানের নিয়ম অলঙ্ঘ্য। নিয়ম সকল অবগত হইয়া পালন করিলেই প্রকৃতি আপনা হইতে পরাজয় স্বীকার করেন। প্রকৃতিকে জয় করিতেই হইবে; ইহাতে ঐকান্তিক ভাবের একাগ্রতা আবশ্যক। যে ভাবের স্ফুরণ করিতে হইবে, আবাল্য তাহা অনুশীলনীয়। যে দেশে এক জনও ভাবুক আছেন, যাঁহার শিরায় শিরায়, অস্থি-মজ্জায় ভাব-তরঙ্গ নিয়ত আন্দোলিত, সে দেশে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবেই। ধর্ম্ম-জগতে, রাজনৈতিক জগতে, বৈজ্ঞানিক জগতে—ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রকৃত ভাবুক কর্ম্ম করিবেনই; পরে তাঁহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া অনুষ্ঠানকে পূর্ণ করিয়া তুলিবে। দৃষ্টান্ত সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর শিক্ষক; তাহার ন্যায় শিক্ষক জগতে আর নাই। কর্ম্ম করিতেছি না; করিবার উপায় কি? কর্ম্ম করাই একমাত্র উপায়। নিষ্কর্ম্ম-রোগের একমাত্র মহৌষধ কর্ম্ম করা। কর্ম্ম করিতে করিতেই ভাব উত্তেজিত হয়, সিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হয়। কিন্তু সে কর্ম্ম করিবে কে? পথ-প্রদর্শক কে হইবে? যিনি একাগ্র, যিনি ভাবুক, যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই হইবেন; অন্যে তাঁহার পদানুসরণ করিবে। ভগবান বলিয়াছেন,—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।—গীতা।

শ্রেষ্ঠ যেরূপ আচরণ করেন, জনসাধারণও তদ্রূপই করে। যে দেশে পথ-প্রদর্শক নাই, সে দেশের আশা কোথায়? এ সকল স্থলে স্বার্থ-পরার্থের মহামিলন অত্যাবশ্যক। চির-কুমার সুতরাং স্বার্থ-শূন্য ভাবোন্মত্ত দণ্ডীর অত্যন্ত আবশ্যক। সকলকেই বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বরং ভাবে ও কর্ম্মে সমন্বয় করিতে হইলে, অনাসক্ত এক শ্রেণীর মহাজন অধঃপতিত সমাজের নিতান্ত প্রয়োজন।

আপনারা পূর্ব্বে যে সমাজের কথা কল্পনা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার কথা পুনরায় স্মরণ করুন। সেই ক্ষুদ্র সমাজ, চতুষ্পার্শ্বে বৃহত্তর প্রতিকূল সমাজে বেষ্টিত; আর সেই প্রতিকূল সমাজ নিজের ও অপরের প্রবল শক্তিতে শক্তিমান। এরূপ স্থলে ভাবকে কর্ম্মে পরিণত করিতে হইলে, কি করিতে হইবে? জগতের ইতিহাসে কয়েকবার এইরূপ হইয়াছিল। তন্মধ্যে একবারের কথা আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। মহাত্মা যীশু দ্বাদশটি শিষ্য ও মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া ভাবে মত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র সমাজ বৃহত্তর প্রতিকূল সমাজে বেষ্টিত ছিল। আর তাহারা নিজের ও অপরের শক্তিতে বিপুল শক্তিমান ছিল। তখন যীশু স্বীয় মুষ্টিমেয় শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, "Go not into the way of the gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. * * * Provide neither gold nor silver, nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat." এই মহাবাক্য হইতে আমরা কি শিক্ষা পাই? জগতের কোটী কোটী নর নারী যাঁহার পদতলে মস্তক অবনত করিতেছে, তিনি মহাপুরুষ সন্দেহ নাই; তিনি কর্ম্মী, এবং সফল কর্ম্মী। তিনি বলিতেছেন,—"ঐ বৃহত্তর প্রতিকূল সমাজের দিকে যাইও না। Gentiles এবং Samaritansদিগের সহিত মিশিও না। তাহাদিগের নগরে প্রবেশ করিও না। আপন Israel সমাজের পতিত জনসাধারণের নিকট যাও, বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" আমি এই মহাবাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইতে অপারগ। আপনারা বিবেচনা করিবেন, মহাত্মার উপদেশ আত্মশক্তিকে কেন্দ্রীভূত হইতে বলিতেছে কি না? বিরোধী সমাজে শক্তিকে বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করিলে, প্রথমতঃ শক্তি প্রতিহত হয়। তাহাতে কর্ম্ম নিরুদ্ধ হইতে পারে। তাই যীশু বলিতেছেন—"ভাব-প্রচার আত্মসমাজে সীমাবদ্ধ কর।" সে সমাজ মুষ্টিমেয়, সুতরাং প্রথমে ভাবের বিস্তৃতি হইবে না; কিন্তু বিস্তৃতি অল্প হইলেও ভাবের গাম্ভীর্য্য ও প্রবলতা অধিক হইবে। সুতরাং যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী এক সুরে বাঁধা, তদ্রূপ মুষ্টিমেয় লোক লইয়া সমাজে কর্ম্ম যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, বহু-বিস্তৃত হট্টরোলে তাহা হইতেই পারে না। তার পর, "Neither two coats

neither shoes, not yet staves" ইহাতে বুঝিলাম যে, প্রকৃত ভাবোন্মত্ত সন্ন্যাসী চাই; আর প্রতিকূল সমাজ তাহাদিগকে চিনিতে না পারে, তাহাদিগের মন্ত্রোদ্‌ঘাটন করিতে অসমর্থ হয়, সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিরোধী পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর জয়ী হইতে হইলে একাগ্রতার সহিত আত্মসমাজে ভাব ও কর্ম্মে মিলাইয়া দিতে হয়; আর তাহার প্রধান উপায় মন্ত্র-গুপ্তি। এই বিস্তীর্ণ ধরাতলে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মন আদিকাল হইতে বিভিন্ন ভাবে গঠিত হইয়াছে। তাহাদিগের স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিষ্ককেন্দ্র সকল কালক্রমে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। যে জাতি যে ভাবে গঠিত, তাহাকে তদনুরূপ ভাবে পরিপূর্ণ করিতে হয়, সেই ভাবে উত্তেজিত করিতে হয়। সে জাতির নর-নারীর শিক্ষা ও সঙ্গ, কর্ম্ম ও অনুষ্ঠান আবাল্য তাহারই অনুকূল হইয়া থাকে। ইহাতে ভাবের পূর্ণতা হয়, চরিত্রে বল সঞ্চয় হয়। তখন কর্ম্ম অপ্রতিহতবেগে অনুষ্ঠিত হয়। যদি কর্ম্ম চাও কর্ম্ম কর। একাকীই কর, অত্যল্পসংখ্যক অনুচর লইয়াই আরম্ভ কর; কারণ জনসাধারণ তোমার পশ্চাতে আসিবে। "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি।" গীতায় এই বাক্য যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে অর্থে না হইলেও, "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি"। ভগবানে আস্থা চাই। তাঁহার নাম লইয়া, পরিণামে বিশ্বাসী হইয়া বিশুদ্ধ-একাগ্রহৃদয়ে, নির্ম্মলচরিত্রে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া চাই। নতুবা সিদ্ধির আশা করা বাতুলতার নামান্তর মাত্র। একাগ্রতা বিঘ্নচিন্তায় দমিত হয় না; বিঘ্ন-চিন্তা ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিচায়ক।

প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্ননিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানা
প্রারব্ধমুত্তমগুণা স্তমিবোদ্‌বহন্তি॥—মুদ্রারাক্ষস।

যিনি একলক্ষ্য ভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, বিঘ্ন তাঁহার প্রধান সহায়; বিঘ্ন তাঁহাকে দ্রুতপদে সফলতার দিকে লইয়া যায়! শত ব্যর্থতার মধ্য দিয়া বিঘ্নই সফলতা আনয়ন করে। প্রাথমিক ব্যর্থতা কর্ম্মীর ও অবশিষ্ট জনগণের হৃদয়ে যে আঘাত দেয়, তাহাই সফলতার পিতৃপুরুষ। সুতরাং বিঘ্ন-চিন্তা অকিঞ্চিৎকর। কর্ম্মেই মানবের অধিকার; সুতরাং অনন্যমনে কর্ম্মই করিতে হইবে। ফল ভগবানের হস্তে। বারংবার বলিয়াছি, ইহাতে একাগ্রতা চাই; মনের প্রকৃত বল চাই; বিশুদ্ধি চাই; এক কথায়, মনের

উৎকর্ষ চাই; এখন মনেরই দিন, ভাবেরই রাজ্য। (১৮) সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে মনকেই, ভাবকেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; নতুবা গত্যন্তর নাই। ভাব মস্তিষ্কগত; উহা শুক্র শোণিতগত উত্তেজনা উৎপন্ন করে; সুতরাং কর্ম্ম, আজি হউক কালি হউক, এক পুরুষে হউক অথবা পরবংশে হউক, হইবেই, তাহাতে অনুমাত্র * সন্দেহ নাই।

এই আলোচনাতে যে সকল কথা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা প্রধানতঃ এই,—

(১) জড় ও জৈব পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন।

(২) প্রতিকূল সমাজ-বিধির সংস্কার।

(৩) মস্তিষ্কের উপযুক্ত ভাব-কেন্দ্র উত্তেজিত করা। নরনারী উভয়ের পক্ষেই।

(৪) অনুকূল শিক্ষা ও সৎসঙ্গ। নর-নারী উভয়ের পক্ষেই।

(৫) দেহকে বংশানুক্রমিক উপযোগিতা দেওয়া; ভাবকেও বংশানুগত ও সমাজবদ্ধ করা। ভাব সমাজ-বদ্ধ হইলে, ব্যক্তি সমাজের প্রশংসা-লাভার্থ তদনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে।

(৬) প্রথমে অনুষ্ঠান স্ব-সমাজ-বদ্ধ হইবে; শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে।

(৭) বিঘ্ন-চিন্তার দমন।

অতি সংক্ষেপে এই গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। ইহাকে বিস্তৃতি দিতে হইলে প্রত্যেকেই আপন আপন বিবেচনা অনুসারে উপায়-উদ্ভাবন করিতে পারিবেন। কিন্তু যিনি যে পথেরই অনুসরণ করুন, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার উত্তেজনায় আত্মশক্তিকে বিকশিত করাই ইহার মূলমন্ত্র। স্বাবলম্বন ইহার আদি, মধ্য ও শেষ। ইহা কালসাপেক্ষ, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাই একমাত্র উপায়। এই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে, নচেৎ কোনও ফলেরই আশা করা সঙ্গত হইবে না।

(১৮) The future struggles for supremacy * * will be contests between minds, and muscles will be at a discount. Nature. 9th May 1902. p 36.

* When public opinion is roused, it will lead to action. Nature, 1907 p 157.

দেহ ও কর্ম্ম।

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদিগের ইচ্ছা একরূপ, কার্য্য অন্যরূপ; আমরা আন্তরিক চেষ্টা করিতেছি এক ভাবে, কিন্তু কার্য্য করিতেছি বিপরীত ভাবে। অতি অসঙ্গত কার্য্য করিতেছি, তন্নিমিত্ত শত অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি। মনে হয়, অন্য কেহ আমাকে বলপূর্ব্বক নিবৃত্ত করুক; আমি স্বয়ং নিবৃত্ত হইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। মানবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কার্য্য, এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও নিশ্চেষ্টতা অথবা বিপরীত কার্য্য, নিত্যই দেখিতেছি। এই মহা রহস্যের সমাধান করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতগণ অদৃষ্টবাদ, কর্ম্মবাদ, পূর্ব্বজন্ম-বাদ প্রভৃতি অঙ্গীকার করেন। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মে আমাকে যে পথে লইয়া গেল, তাহা নিবারণ করিবার আমার সাধ্য হইল না। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে একটি অদৃষ্ট উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহার ভোগ অনিবার্য্য হইল। এইরূপ মত স্পষ্টতঃ এবং ভাবতঃ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতপক্ষেও জগতের, বিশেষতঃ মানবের নানারূপ কর্ম্ম ও ফল, সুখ ও দুঃখ, ব্যবহার ও নিশ্চেষ্টতা দেখিলে, এই প্রকার সিদ্ধান্তের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। প্রাচীন কাল হইতে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু জীবতত্ত্বের দিক্ হইতে এই দুরূহ বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত। মনোবিজ্ঞানের মতে এই বিষয়ে যতই আলোচনা হউক, কিন্তু শারীর-তত্ত্বও এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিবার অধিকারী। মন দেহ হইতে পৃথক্ সত্তা হউক, আর নাই হউক, মানবের কর্ম্ম বিবেচনা করিতে গেলে, দেহকে অগ্রাহ্য করা যায় না। আমরা এই প্রবন্ধে শারীর-তত্ত্বের দিক্ হইতে এই গুরুতর বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

কোন ব্যক্তির কথা একরূপ, কার্য্য অন্যরূপ দেখিলে, আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি যে, "লোকটা দো-মুখো।" এবং সেই নিমিত্ত তাহাকে ঘৃণাও করি। কিন্তু সে যে শত চেষ্টা করিয়াও তাহার আচরণে ও বাক্যে সমতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না, ইহা একবারও বিবেচনা করি না; করিলে তাহাকে ঘৃণা না করিয়া বরং দয়াই করিতাম। আর তাহার নিষ্ফল চেষ্টার জন্য তাহাকে সাধুবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। কিন্তু এই নিষ্ফলতার মূল কারণ কি?

যে কোনও কর্ম্মই হউক, প্রথমে ইচ্ছা, তৎপর ক্রিয়া-নিষ্পত্তি। অগ্রে কার্য্যটি করিবার অথবা না করিবার ইচ্ছা হয়, তৎপর তদনুরূপ চেষ্টা, অবশেষে কর্ম্মের উৎপত্তি, কিংবা অনুৎপত্তি। সুতরাং ইচ্ছাই পূর্ব্ববর্ত্তী। সকলেই জানেন যে, সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির ন্যায় ইচ্ছাও মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হয়। আর চেষ্টা বুদ্ধিসাপেক্ষ; সুতরাং তাহারও উপায় মস্তিষ্ক হইতেই উদ্ভাবিত হয়। এই নিমিত্ত মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে মস্তিষ্ক পদার্থের উপর লক্ষ্য করিতে হয়। ইচ্ছা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, কিম্বা পরাধীন ও পর-তন্ত্র—সে প্রশ্নের এখন আবশ্যক নাই। এক্ষণে কেবল মস্তিষ্কের ক্রমিক বিবর্ত্তন ও ক্রিয়া-বিকাশমাত্রই বিবেচ্য। নিম্ন প্রাণিগণের মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র; এমন কি, গরিলা অথবা সিম্পাঞ্জি, যাহারা মানবের সহিত দেহগঠনে প্রায় তুল্যরূপ, তাহাদিগেরও দেহের আয়তনের অনুপাতে মস্তিষ্ক নিতান্ত ছোট। মানবের দেহের অনুপাতে মস্তিষ্ক অনেক বড়। মস্তিষ্ক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে তাহার কোষগুলি বহু বিভক্ত হইয়াছে; এবং প্রত্যেক খণ্ড-কোষ আবার বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ব্বাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে; উহা পুনরায় বিভক্ত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। এইরূপে নিম্ন প্রাণিগণের মস্তিষ্ক চিরাতীত কাল হইতে ক্রমে বহুবার বিভক্ত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। অবশেষে জন্তুযুগের প্রায় শেষভাগে বৃদ্ধির পরিমাণ একবারে অতিরিক্ত হইয়া উঠিল, এবং সেই বর্দ্ধিত মস্তিষ্ক লইয়াই মানব ধরাতলে অবতীর্ণ হইল। নিম্ন প্রাণিগণের মস্তিষ্ক-পদার্থের উপর আরও বহুসংখ্যক কোষ-যুক্ত হইয়া গিয়াছে। মানব এই বর্দ্ধিত ও যুক্ত-মস্তিষ্কের অধিকারী। সুতরাং মানবের মস্তিষ্কে অধস্তন প্রাণীদিগের মস্তিষ্কের কোষগুলির অনুরূপ কোষ তো আছেই, তাহার উপর অতিরিক্ত কোষ বিদ্যমান আছে। এই নিমিত্তই মানবের ইচ্ছা নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণীদিগের ন্যায় থাকিবেই, তাহার উপর অন্যান্য ভাব ও বৃত্তিও মানবকে চালিত করিবে। মানবের মস্তিষ্ক-লগ্ন শিরাতন্ত সকলের ইতিহাসও এইরূপ। এই হেতুবশতঃই মানব অনেক অংশে পশুদিগের সহিত সমভাবাপন্ন। আর সভ্য মানবও এই কারণেই আদিম অসভ্য মানবের ন্যায় অনেক অংশে চালিত হয়। অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্যাবস্থা পর্য্যন্ত মানব-মস্তিষ্কের আয়তন যদিও বড় একটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি উহার ক্রিয়াশক্তির ক্রমবিকাশ হইয়াছে। যদিও এই বিকাশ অতীব অধিক এবং বিস্ময়কর, কিন্তু অসভ্যাবস্থার মস্তিষ্ক এই বিকাশের মূলভূমি। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, সভ্য মানবের বৃত্তি অনেক

পরিমাণে পশু ও অসভ্যের ন্যায় হইবেই। তবে শিক্ষা ও অভ্যাসের গুণে মানব নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত রাখিতে সমর্থ হয়। মানব-মস্তিষ্কের শিক্ষার উপযোগিতাই মানবকে ক্রমে উন্নতচরিত্র করিতেছে। কিন্তু তাহার শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে মৌলিক প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিয়া ফেলিয়া দিতে পারে নাই; তাহার সেই মৌলিক পশু-প্রবৃত্তি একেবারে ধ্বংস করিতে পারে নাই। সংযত করা প্রযত্নসাধ্য, এবং অভ্যাসের ফল। সুতরাং যেখানেই প্রযত্নের অভাব, সেইখানেই মানবের পশুত্ব আসিয়া দেখা দেয়।

তা'র পর, নিম্নতম প্রাণী হইতে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া মানব উদ্ভূত হইয়াছে। এ কথা প্রকৃত হইলে মানব সর্ব্বপ্রাণীর উত্তরাধিকারী ও সকলের বৃত্তি উত্তরাধিকারিসূত্রে অল্পাধিক প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং মানব যে ন্যূনাধিক সকল প্রাণীরই স্বভাব প্রাপ্ত হইবে, ইহা প্রতীয়মান হয়। তবে মানবের শিক্ষা ও সংযম তাহাকে নিম্নতর প্রাণী অপেক্ষা শান্ত ও সুধীর করিয়াছে। যেমন মস্তিষ্কের উন্নতিবশতঃ মানবের বিচারশক্তি উন্নত হইয়াছে, এবং মানব বিবিধ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে; তেমনই সংযম-বশতঃই তাহার চরিত্রও নির্ম্মল হইয়াছে। কিন্তু সে মূলতঃ নিম্ন প্রাণিগণের উত্তরাধিকারী, ইহা তাহার দেহে ও মনে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই হেতু সময় সময় তাহার পশুভাব প্রকাশ পায়। যে মানব কিংবা মানবজাতি (Race) যত অসংযত ও অধীর, সে তত পশুভাবাপন্ন। নিম্ন প্রাণিগণ পরস্পরকে আক্রমণ করে; অপরের খাদ্য ও বাসস্থান বলপূর্ব্বক অপহরণ করে; মানবও তাহাই করে। মানব যতই চেষ্টা করুক, পূর্ব্বানুবৃত্তির প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ তাহার পক্ষে সহজ হয় না। মানবীয় ভাব, তাহার মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধতন অংশ; ইহাই তাহাকে অপেক্ষাকৃত সৎপথে চালিত করে। এবং পশুভাব তাহার মস্তিষ্কের অধস্তন অংশ; ইহা তাহাকে কু পথে লইয়া যায়। আর মস্তিষ্ক পদার্থের অধস্তন অংশ আদিম, সুতরাং তাহাতে যুগযুগান্তরের নিম্ন জীবগণের বৃত্তি সকল নিহিত থাকায়, সে সকলের উত্তেজনা অসংযত মানবের পক্ষে রোধ করা কঠিন। ঊর্দ্ধতন অংশের কোষ সকল অভ্যাস ব্যতীত ঐ উত্তেজনা সম্যক্ নিবৃত্ত করিতে পারে না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মস্তিষ্কের বিভিন্ন ভাগ বিভিন্ন বৃত্তির আধার। সেই হেতু উহার একাংশকে সংযত করিয়া অপর অংশকে স্ফূর্ত্তি প্রদান করা যাইতে পারে। এই কার্য্য

প্রযত্নসাধ্য। দীর্ঘকালব্যাপী (১) চেষ্টায় এ ফল লাভ করা অসম্ভব নহে, বরং সম্পূর্ণ সম্ভব। এই চেষ্টা সফল হইবার পক্ষে শিক্ষা, সংযম ও ধীরতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। সংযমের অর্থ,—এক মনোবৃত্তিকে অন্য বৃত্তি দ্বারা রোধ করা। এই কার্য্যও অভ্যাসবশতঃ স্নায়ু ও স্নায়ু-কেন্দ্র সকলের সহায়তায় সিদ্ধ হইতে পারে। কথাটা কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করা আবশ্যক। মস্তিষ্ক পদার্থই মনোবৃত্তির আধার, তাহা বলিয়াছি। এই পদার্থের মধ্যে স্থানে স্থানে স্নায়ু-কেন্দ্র (২) সকল নিহিত আছে। তৎপর মেরুদণ্ডের মধ্যে মেরুতন্তুতে (৩) ঊর্দ্ধ হইতে অধোদেশে ক্রমে কটির নিম্নভাগ পর্য্যন্ত কতিপয় স্নায়ু-কেন্দ্র বর্ত্তমান আছে। মনোবৃত্তি মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ু-যোগে এই সকল কেন্দ্র দিয়া পেশীমণ্ডলে তরঙ্গরূপে উপস্থিত হয়, তাহাতেই ক্রিয়া নিষ্পত্তি হয়। বিবিধ বৃত্তি এইরূপে বিভিন্ন তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া স্নায়ু সকলকে উত্তেজিত করে। বৃত্তি সকল ক্রমিক অথবা যুগপৎ হইলে উত্তেজনাও ক্রমিক অথবা যুগপৎ হইয়া থাকে। কিন্তু দেহ-যন্ত্রের এমনই গঠন যে, ঊর্দ্ধতন স্নায়ু-কেন্দ্র সকল নিম্নতম স্নায়ু-কেন্দ্রের ক্রিয়া আংশিক অথবা সম্পূর্ণ রূপে রোধ করিতে পারে। ঊর্দ্ধতন (অর্থাৎ মস্তিষ্ক-নিহিত অথবা মেরুতন্তুর ঊর্দ্ধভাগস্থ) স্নায়ু-কেন্দ্র সকল যখন দুর্ব্বল অথবা অক্ষম হয়, তখনই তাহারা নিম্নস্থ স্নায়ু-কেন্দ্রের ক্রিয়া রোধ করিতে পারে না; নচেৎ ঊর্দ্ধতন কেন্দ্র সর্ব্বদাই নিম্নস্থ কেন্দ্রের ক্রিয়া নিবৃত্ত কিংবা রোধ করিয়া থাকে। মস্তিষ্কের অথবা মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধতন অংশের কেন্দ্র সকল মানবীয় উন্নত বৃত্তির আধার; ঐ কেন্দ্র সকল যতই নিম্নদেশস্থিত, ততই তাহারা নীচ ও পশু-বৃত্তির আধার। সুতরাং ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, উচ্চবৃত্তি সকলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, নীচ ভাবগুলিকে সংযত করিতে হইবে; ঊর্দ্ধতন স্নায়ু-কেন্দ্র সকল যাহাতে অধস্তন কেন্দ্র সকলের উপর বিশেষ ক্রিয়াবান্ হয়, তদ্রূপ চেষ্টা ও অভ্যাস করা আবশ্যক। ঊর্দ্ধতন কেন্দ্র সকলের যে শক্তির বলে উহারা নিম্নস্থ কেন্দ্রগুলির ক্রিয়া রুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেই শক্তির প্রবলতা সম্পাদন করিতে হইবে। স্বভাবতঃই প্রথমোক্ত কেন্দ্র সকল শেষোক্তের ক্রিয়ারোধ করিতে সমর্থ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার

(১) বংশপরম্পরাগত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২) Nervous centre.

(৩) Spinal chord.

পর যদি দীর্ঘ কালের অভ্যাস দ্বারা উহাদিগের ক্রিয়া আরও সবল করা যায়, তবে মানবীয় উচ্চভাব সকলের আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এবং নিম্নভাব সকল চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যাইতে পারে। ঊর্দ্ধস্থ স্নায়ু-কেন্দ্র উন্নত ভাবের আধার, এবং তাহারা যখন অধস্থ কেন্দ্রগুলির রোধ করিতে স্বভাবতঃই সমর্থ, তখন অবশ্যই অভ্যাসবশতঃ আরও সমর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? (১) এই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইলেই মানব ইচ্ছানুরূপ মনোবৃত্তি সকলকে পরিচালিত অথবা নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবে। অন্যান্য বিরোধী বৃত্তি তাহাকে উত্তেজিত করিয়া বি-পথে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে না। তাহাকেও অনিচ্ছা সত্ত্বে কুকার্য্য করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে না। মানব-নামের উপযুক্ত হইতে হইলে এই চেষ্টাই তাহার পক্ষে একমাত্র চেষ্টা, এই শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা, এই অনুষ্ঠানই একমাত্র অনুষ্ঠান। অন্য অনুষ্ঠান বাহ্য-চাকচিক্যসম্পন্ন হইলেও প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিরোধী; সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। সু-শিক্ষা, সংযম ও ধীরতা হইতেই মানব উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া দেবত্বে উপনীত হইবে; এবং অবশেষে যে, নিত্য শান্ত একমাত্র বস্তু হইতে জীব জড় সকলই উদ্ভূত হইয়াছে, আবার তাহাতেই লীন হইয়া, সর্ব্ব দুঃখের অবসানে নিত্যানন্দ উপভোগ করিবে। ইহাই তাহার মানব-জন্মের সফলতা। সে চেষ্টা কি? এ প্রশ্নের উত্তর, যোগশাস্ত্রের অন্তর্গত; সুতরাং এ স্থলে বিস্তৃতরূপে উল্লেখযোগ্য নহে। তবে, সৎসঙ্গ, ধৈর্য্য, ও একনিষ্ঠতা যে এই চেষ্টার প্রধান সাধান, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

---

(১) (There are) different levels in the nervous system. * * At the level of the lower end of the spinal chord are certain centres which can act reflexly. * * At a higher level in the nervous system are other centres which can control these and prevent or inhibit these customary reflexes * * * Now this power of inhibitation is the ultimate expression of nearly all that is most admirable in man. It is the germ of self control, of restraint, of the power to say no.

Saleby's Evolution the master Key p. 192 to 198.

যোগ্যতমের জয়।

মহাত্মা ডারুইনের সময় হইতে 'যোগ্যতমের জয়" (Survival of the fittest) কথাটী বিশেষ প্রচলিত হইয়াছে। এখন প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই এই বাক্যটী পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইয়া থাকে। যখন প্রবল, দুর্ব্বলকে পীড়ন করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে, তখন সে এই বাক্যের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়াই মনে করে যে, সে নৈসর্গিক নিয়ম-ই প্রতিপালন করিতেছে। ইহাতে তাহার যেমন আত্ম-প্রসাদ জন্মে, তেমনই পাপ-বোধেরও খর্ব্বতা হয়। অনেকেই এইরূপ বুঝিয়া বসিয়া আছেন যে, দুই-এর সংঘাতে যে প্রবল, সে জয়ী হইবে; আর যে দুর্ব্বল সে পরাজিত হইবে;—ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। সুতরাং এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া, দুর্ব্বলকে পদ-দলিত করিলে যদি নিজে জয়ী হওয়া যায়, তবে তাহাতে অধর্ম্ম নাই। এই নিষ্ঠুর দুর্নীতি পাশ্চাত্য প্রদেশকে এক্ষণে এক প্রকাণ্ড রণক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে; এবং ইউরোপীয়গণকে অন্য ভূ-ভাগের অধিবাসীদিগের নিষ্পীড়ন-কল্পে একবারে নির্ম্মম করিয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমরাও এই নীতি অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা ইহার নাম দিয়াছি, জীবন-সংগ্রাম; এবং এই সংগ্রামে একান্ত অনুরক্ত হইতেছি। এই সংগ্রামের প্রবর্ত্তক কারণ, প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক কার্য্যের অধিকারী হইলেই প্রতিযোগিতা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। এই হেতু এতদ্দেশীয় সমাজ, প্রাচীন কাল হইতেই সেরূপ বিধানে চালিত হয় নাই। এতদ্দেশীয় সমাজে, কর্ম্ম বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়া, প্রতিযোগিতা এবং জীবন-সংগ্রামকে যথাসাধ্য দূর রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, এই কর্ম্মবিভাগ-ই ক্রমে কর্ম্মের উৎকর্ষতা আনয়ন করিয়াছিল। কিন্তু এখন জীবন-সংগ্রাম-মন্ত্র অভ্যস্ত হওয়ায়, সে সকলই বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছে। এখন সমাজের যুগ নহে, এখন ব্যক্তির যুগ। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীনভাবে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে, এবং সেই সংগ্রামে জয়ী হইতে ইচ্ছা করে। ইহাতে, মানব যেন নিম্ন প্রাণিগণের আদর্শে গঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সুতরাং এই "জীবন-সংগ্রাম" বাক্যটী কি, "যোগ্যতমের জয়" কথাটীর প্রকৃত ব্যাপ্তি কতদূর; ইহা আলোচনা করা

সঙ্গত বোধ হইতেছে। এ প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

জীবতত্ত্বে "জীবন-সংগ্রাম" এবং যোগ্যতমের জয়" কথা দুইটী এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঐ বাক্যদ্বয়ের অর্থ এমন নহে যে, যে কোন প্রাণীদ্বয় পরস্পরের প্রতিযোগিতা করত একে অন্যকে পরাস্ত করিল এবং সেই সূত্রে বিজয়ী প্রাণী লাভবান হইল। জীব-তত্ত্বে কেবল এইরূপ অর্থে এতদুভয় বাক্য ব্যবহৃত হয় না। যখন দুইটী কেরাণি-পদপ্রার্থী এক-ই পদের জন্য প্রার্থনা করে এবং এবং একটী অধিকতর শিক্ষিত বিধায় সেই ব্যক্তিই ঐ পদ প্রাপ্ত হয়, অপর ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় না; তখন তাহাকে ডারুইন-প্রচলিত "যোগ্যতমের জয়" বলা যাইতে পারে না। জীব-রাজ্যে যোগ্যতমের জয় এইরূপ :—প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রকারে * কোন বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থার অধিকতর উপযোগী সেই জীবিত থাকিয়া বংশবৃদ্ধি করিবে; যে তাদৃশ উপযোগী নহে, সে মরিয়া যাইবে। কোন নির্দ্দিষ্ট ভূভাগের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই স্থানের প্রাণিগণের অবস্থাও উপযুক্ত রূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে তাহারা ঐ পরিবর্ত্তিত অবস্থাতে জীবিত থাকিবার যোগ্য হইল। কিন্তু তাহাদিগের স্ব-শ্রেণীর মধ্যে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহার্থ প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইলে কি হইবে? হইবে, যোগ্যতমের জয়, আর অপরের মৃত্যু। যোগ্যতমের জয় অর্থেই অযোগ্যের মৃত্যু বোধ করে। জীব-রাজ্যে জীবন সংগ্রামের ফলে পরাজিতের মৃত্যু ভিন্ন অন্য পরিণাম নাই। ‡ কিন্তু এই জীবন-সংগ্রাম, বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত জীবগণের মধ্যে হয় না; উহা এক বংশীয়গণের মধ্যেই হইয়া থাকে। গরু ও মেষের সংগ্রাম জীবতত্ত্বের জীবন সংগ্রাম নহে; এক বংশজ ভ্রাতা ভগিনী ও নিকট কুটুম্বগণের মধ্যে যে জীবন সংগ্রাম, তাহাই জীবতত্ত্বের প্রতিপন্ন প্রকৃত জীবন-সংগ্রাম *। এই সংগ্রামে যে

---

*কেবল দেহের বলে নহে।

† In Nature's struggle for existence, death, immediate obliteration, is the fate of the vanquished. Whilst the only reward to the victors * * * is to carry on by heridity to another generation the specific qualities by which they triumphed. Nature and Man p. 15.

* The sruggle for existence takes place, not between different species, but between individuals of the same species, brothers and sisters and cousins. ibid p 14.

জয়ী হয় সে জীবিত থাকিয়া বংশ বৃদ্ধি করে, আর যে পরাজিত হয় সে মরিয়া যায়। ইহাই জীব-রাজ্যের নৈসর্গিক বিধান, এই বিধান অনুসারেই জীব ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রকৃতি এই নির্ম্মম, কঠোর, এবং ধ্বংসাত্মক বিধান মতেই প্রাচীনতম কাল হইতে জীবরাজ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

কিন্তু জীবরাজ্য অর্থে কি সমস্ত জীবরাজ্যই বুঝিতে হইবে? মানবও কি এই নিয়মের বশবর্ত্তী? তবে এই গৌরবান্বিত জীবের বিশেষত্ব কোথায়? মানব যে চিরদিন এই ধরাপৃষ্ঠে বিদ্যমান ছিল না, ইহা নিশ্চিত। যদি তিন লক্ষ বৎসর মানবের আবির্ভাব ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বেশী ভ্রম করা হইবে না। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যে কঠোর বিধান অনুসারে প্রকৃতি মানবেতর জীবরাজ্য এতদিন নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছিলেন, মানবের আবির্ভাবের পরেও কি ঠিক সেই বিধানই অব্যাহতরূপে কার্য্য করিতেছে? মানবও কি সেই নিয়মই নতশিরে পালন করিতেছে? এই নিয়ম পালন করিলে ত তাহার শেষ পরিণতি অযোগ্যের মৃত্যুতে; মানব কি সেই পথেই অগ্রসর হইতেছে? এই প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়া মানব কখনই স্থির থাকিতে পারে না।

আদ্রতা শুষ্কতা, শৈত্য উষ্ণতা, আলোক অন্ধকার—এই সকল লইয়াই প্রকৃতি চিরদিন খেলা করিতেছে। এই সকলের সাহায্যেই প্রকৃতি প্রাচীনতম কাল হইতে স্বকার্য্য-সাধন করিয়া আসিতেছে। সেই প্রাচীন কাল হইতেই জীব এই সকলের অধীনতা করিতেছে। কখনও দুরন্ত শীত, কখন বা অসহ্য গ্রীষ্ম, এই সকল সহ্য করিয়া যে জীব আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিল, এবং শত্রু-হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হইল, সে বাঁচিল। যে জীব তাহা পারিল না, সে মরিয়া গেল। এরূপ মৃত জীবের দেহ, অথবা দেহাংশ পৃথিবীর স্তরে স্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারা কেহই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে নাই। কিন্তু মানবের ইতিহাস এরূপ নহে। মানব দারুণ শীতে অথবা অত্যুষ্ণ তাপেও আত্মরক্ষা করিতে এবং আহার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। দেহের উপযুক্ত পরিবর্ত্তন না হইলে এই সকল সময়ে মানবেতর জীব বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু মানব—দৈহিক পরিবর্ত্তন না হইলেও বুদ্ধিবলে আত্মরক্ষা করিতে পারে। চিরতুষারাবৃত মেরু প্রদেশে মানবেতর জন্তু দৈহিক পরিবর্ত্তন দ্বারা বিশেষরূপে সুরক্ষিত না হইলে বাসই করিতে

পারে না। কিন্তু মানবের দেহ ঐরূপে পরিবর্ত্তিত না হইলেও ঐ সকল দেশে মানব বুদ্ধিবলে আত্মরক্ষা করিতেছে। মানব কখনই প্রকৃতির তাড়না নতশীরে সহ্য করিতে সম্মত হয় না। প্রকৃতি যদি বলেন, "তুমি মর," মানব বলে "আমি মরিব না।" মানব প্রকৃতির অবাধ্য পুত্র *। সে সহজে অধীনতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হয় না; বরং প্রকৃতিকে পরাজিত করিয়া, আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করে। আর, মানব যদিও পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিয়া সময় সময় যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই, তথাপি তাহাতে পরাজিত পক্ষ একবারে সকলেই মরিয়া যায় না। অতি প্রাথমিক অবস্থাতেও, বোধ হয়, "অযোগ্যের পরাজয়ে" একবারে মৃত্যু ঘটে নাই। এখনকার উন্নত অবস্থায় ত তাহা হইতেই পারে না। প্রতিদ্বন্দ্বী মানব সমাজে, জয়ী ও জিত হয়ত পরস্পরের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়, নতুবা পরাজিত পক্ষ স্থানান্তর আশ্রয় করে, নচেৎ ঐ পরাজয়ের ফলে জিতের দেহ ও মন এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হয় যে, হয় ত সে একবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়, নচেৎ উহার মধ্য দিয়াই ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। পরাজিতের অবনতি নির্দ্দিষ্ট সীমা প্রাপ্ত হইলে, তাহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ উন্নতি অসম্ভব নহে, কারণ সভ্যতায় কিঞ্চিন্মাত্র অগ্রসর হইয়া থাকিলেও, সে নির্ম্মূল হইতে কখনই সহজে স্বীকার করে না। এই রূপে, মানব প্রকৃতির চিরন্তন বিধানকে পদে পদে বিপর্য্যস্ত করে। প্রকৃতি, অন্য জীব জন্তুর বিবর্জ্জনে যে কঠোর নিয়মানুসারে যুগ যুগান্তর হইতে কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা মানবের নিকট প্রতি পদে ব্যর্থ হইতেছে। এই বিদ্রোহী সন্তান স্বীয় বুদ্ধি বলে প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম অব্যাহত রাখিতে দেয় নাই। সে, প্রকৃতিকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত, প্রথম হইতে চেষ্টা করিতেছে। তাহার ফলে এখন এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, সে আর সেই চিরন্তন নিয়মের অধীনে ফিরিয়া যাইতে পারে না। সে, যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে, তাহাতে সে চিরাতীত কাল হইতে জয়ী হইয়াই আসিতেছে। এই দিগ্বিজয় কার্য্যে তাহার প্রধান সহায় মস্তিষ্ক। এই পদার্থ Tertiary যুগে জীবরাজ্যে অতি অল্পই ছিল। সে যুগে সম্ভবতঃ মানব ছিল না। মানবেতর জীবগণের মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র ছিল। কিন্তু, এই যুগের শেষ ভাগে অথবা

---

* Man is Nature's rebel * * * Her insurgent son. Nature and Man p 22-3.

Miocene যুগের প্রথম ভাগে অন্যান্য জন্তুর সহিত মানবের পূর্ব্ব পুরুষগণেরও মস্তিষ্ক যুগপৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে অনেক স্তন্যপায়ী জীব যুগপৎ বর্দ্ধিতমস্তিষ্ক হইয়া গেল। ইহার কারণ যাহাই হউক, কিন্তু এই অবস্থার ফলেই মানবের আবির্ভাব। সে বর্দ্ধিতমস্তিষ্ক লইয়াই অবতীর্ণ হইল। সুতরাং প্রকৃতির অসহনীয় শীত-তাপের অধীনতা করিতে সে প্রথম হইতেই ন্যূনাধিক অস্বীকার করিতে লাগিল। এইরূপে সে কেবল যে জীবিত আছে, তাহা নহে; উত্তরোত্তর বংশ বৃদ্ধি করত ধরাতলে বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃতির অবাধ্যতা করিয়া মানব অনেক বিপদ আপনি ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহা সত্য; কিন্তু সে যে আর কোন কালেই প্রকৃতির চিরন্তন বিধান স্বেচ্ছায় স্বীকার করিবে, তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। যে অযোগ্য, তাহাকে সে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করে। তাহার আত্মরক্ষা বৃত্তি ক্রমে পরিবারে, স্বদেশে ও সমস্ত ধরাতলে প্রসারিত হইয়া তাহাকে বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত করিয়াছে। দয়া, ধর্ম্ম প্রভৃতি উচ্চতম গুণে মানব অলঙ্কৃত হইয়াছে। ইহাই তাহার প্রধান গৌরব, ইহা সে কখনই সহজে পরিত্যাগ করিবে না। তাহার মস্তিষ্কের বৃদ্ধি এক্ষণে নিবৃত্ত হইয়াছে, সত্য। (১) প্রাথমিক অবস্থায় তাহার মস্তিষ্ক যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা আর হইতেছে না, সত্য। কিন্তু মানব স্বীয় জীবন ব্যাপারের সুবিধার জন্য এবং অন্যান্য উচ্চতর কারণে, মস্তিষ্কের ক্রিয়া শক্তির এতই উৎকর্ষ সাধন করিতেছে যে, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। মানবের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমে উৎকর্ষতা-সাধন হইতে হইতে, তাহার চিৎ-শক্তির এত উন্নতি হওয়া সম্ভব যে, অবশেষে তাহা অচিন্ত্যনীয় বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে। তখন মানব অনন্ত উন্নতির অধিকারী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই উপায়—সর্ব্ব প্রযত্নে প্রকৃতিকে পরাজয় করিবার চেষ্টা—প্রকৃতির অবাধ্যতা। কিন্তু প্রকৃতির অনুসরণ করাই যথার্থ অবাধ্যতা। শীত তাপ প্রভৃতি যে সকল দ্বন্দ্ব শক্তি লইয়া প্রকৃতি

(১) Man, it would seem, at a very remote period attained the extraordinary development of brain which marked him off from the rest of the animal world; but has ever since been developing the powers and qualities of this organ without increasing its size. * * * Man and Nature P. 20.

কার্য্য করেন, তন্মধ্যে একের অনুসরণ করত অন্যকে পরাজয় করাই একমাত্র পন্থা। প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করিলেই প্রকৃতি আপনা হইতে পরাজয় স্বীকার করেন। প্রকৃতির পরাজয়েই মানবের উন্নতি। যে মানব উন্নতি ইচ্ছা করে, সে সর্ব্বাগ্রে প্রকৃতিকে পরাজিত করিতে যত্নবান হইবে। ইহাতে গত্যন্তর নাই। উন্নতি নানাবিধ, সুতরাং যে প্রকার উন্নতি লক্ষ্য করা হয়, তদনুরূপ যত্ন করাই সঙ্গত। যদিও মানবজীবনের যে কোন বিভাগেই উন্নতি হউক, অন্য বিভাগেও তাহার প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই; তথাপি ঈপ্সিত পথে একাগ্র চেষ্টাই উন্নতির প্রধান উপায়। দৈহিক ও মানসিক উন্নতি ইচ্ছা করিলে, যাহার উপর এতদুভয় নির্ভর করে, তৎপ্রতি মনোযোগ করা উচিত। জীবরাজ্যে দ্বিবিধ কারণ পরিবর্ত্তন সিদ্ধ করিয়া থাকে। ১ম পারিপার্শ্বিক অবস্থা; ২য় বংশানুক্রম। পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে যে পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হয়, বংশ পরংপরাগত হইলে তাহার স্থায়ীত্ব বিধান হইয়া থাকে। সুতরাং মানব কোন নির্দ্দিষ্ট পথে উন্নতি ইচ্ছা করিলে, এই দুই উপায়ের আশ্রয় লওয়া অত্যাবশ্যক। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাহাতে বাঞ্ছিত ফলের অনুকূল হয়, এবং যাহাতে সেই অনুকূলতা বংশানুক্রমে রক্ষিত হয়, তাহা করিতেই হইবে। নচেৎ, মানব কখনই সফল হইতে পারে না। এইরূপে প্রকৃতিকে জয় করিতে সময়ের আবশ্যক হইলেও, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, সর্ব্ব প্রকার উন্নতিরই এই একমাত্র পথ। প্রকৃতিকে পরাজিত করিতেই হইবে। কিন্তু কথায় বলে "বড় হবি ত ছোট হ।" তাই প্রকৃতির অনুগত হইয়াই তাহাকে পরাজয় করিতে হইবে। প্রকৃতির বিবিধ বিধান সমূহ যথাসম্ভব আয়ত্ব করিতে হইবে, তৎপরে একের অনুসরণ করত, অন্যকে প্রতিরোধ করিতে হইবে। প্রকৃতিকে বুঝিলেই তিনি আপনা হইতে পরাজয় স্বীকার করেন। তাঁহার এই মহত্ব থাকাতেই মানব ক্রমে মানবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং পরিণামে অমরত্ব লাভ করিবে, তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

নবসমাগম।

যুদ্ধ বিগ্রহ সেকালেও হইত, একালেও হয়। এক দেশের লোক অন্য দেশে গিয়া বল পূর্ব্বক তাহার স্বাধীনতা হরণ করে,—ইহা পূর্ব্বেও ছিল, এখনও হয়। কিন্তু এ সকল পূর্ব্বে এত মারাত্মক ছিল না; এখন তদপেক্ষা অতীব সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে। তখনকার বিজেতৃগণ অপেক্ষা এখনকার বিজেতৃগণ অধিকতর ধ্বংস ক্রিয়ার অভিনয় করিতেছেন। তখন অধিকাংশ স্থলেই শক্তি পরীক্ষা, বিজয় গৌরব—এই সকলই প্রধান লক্ষ্য থাকিত। এখন তাহা প্রায় নাই। একালে বাণিজ্যই যুদ্ধ বিগ্রহ ও দেশ জয়ের প্রধান কারণ। প্রধানতঃ এই উপলক্ষেই এখন এক দেশের লোক অন্য দেশে যাইতেছে। তথায় বাণিজ্য-ব্যপদেশে স্থানীয় লোকের সহিত নানা প্রকার সংসর্গে আসিতেছে; তাহাদিগের অন্ন মারিবার জন্য নানারূপ নিষ্ঠুর আসুরিক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতেছে। অবশেষে ছলে বলে কৌশলে তাহাদিগের রাজ্য অপহরণ করতঃ ঐ সকল আসুরিক ব্যাপার দ্বিগুণ বাড়াইবার সুবিধা করিয়া লইতেছে। ঐ সকল স্থলে বাণিজ্যই মূল লক্ষ্য। এই উপলক্ষে বিভিন্ন জাতীয় মানবের যে সংসর্গ হইয়া থাকে, তাহার ফল জীব-বিজ্ঞানের দিক হইতে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

বিভিন্ন জাতীয় মানবগণের প্রথম সম্মিলনে পরস্পরের মনেই কৌতুহল, বি[illegible] ইত্যাদি ভাবের উদয় হয়। কিন্তু যাহারা দূরদেশ হইতে আগত, তাহারা নূতন স্থানে আসিয়া, নূতন চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকায় ঐ সব ভাব-স্রোতে নিশ্চেষ্ট ভাবে ভাসিয়া যাইবার অবসর পায় না। বিশেষতঃ তাহারা উদ্যোগী, সাহসী ও কর্ম্মী, নচেৎ দূরদেশে আসিতই না। তাহারা অর্থ লাভের নানা চেষ্টায় নানা কর্ম্ম করিতে থাকে। যে পরিমাণে তাহাদিগের কর্ম্ম-ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়, সেই পরিমাণে তদ্দেশবাসিগণের কর্ম্মক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া যায়। নবাগতেরা আদিমবাসীদিগের শ্রম লাঘব করিয়াই উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া লয়। এই হেতু আদিমবাসীদিগের কর্ম্মক্ষেত্র সংকীর্ণ হইতে হইতে ক্রমে তাহাদিগের মধ্যে অলসতা আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা নবাগতদিগের উদ্যম ও কর্ম্মশীলতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়, এবং ক্রমে আত্মনির্ভরতা হারাইতে

থাকে; তখনই তাহাদিগের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। * কর্ম্ম দেহ ও মনকে প্রফুল্ল, বলিষ্ঠ ও সতেজ রাখে। অধ্যবসায় এবং শ্রমশীলতা ব্যতীত বাণিজ্য হয় না। এ নিমিত্ত নবাগতগণ উত্তরোত্তর অধিক কর্ম্মী ও উদ্যমশীল হইয়া উঠে। তারপর, দূরদেশে আসিয়া উহারা একতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়। নচেৎ অল্প সংখ্যক ব্যক্তি বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্যে আত্মরক্ষা করিতেই সমর্থ হয় না। একতা, সাহস, অধ্যবসায়, উচ্চাশা—এ সকল তাহাদিগের ক্রমেই বাড়িয়া উঠে। আর সেই পরিমাণে যদি আদিমবাসিগণের চেষ্টা ও উদ্যোগ কমিয়া যায়, তবে অল্প কাল মধ্যেই তাহারা নবাগতদিশের নিকট পরাস্ত হয়। নবাগতগণ যদি সাত্তিক ভাবে অনুন্নত এবং পশুভাবে অধিকতর উত্তেজিত হয়, তাহারা যদি ন্যায়, নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান বর্জ্জিত হয়, তবে অচিরে এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার সকল অনুষ্ঠিত করিয়া তুলে যে, আদিমবাসিগণ ভীত, এস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। নবাগতগণ বাণিজ্যের জন্য যতদূর পশুভাবাপন্ন হইতে পারে, তাহার চরম দৃষ্টান্ত ইংরাজ কর্ত্তৃক ট্যাস্‌ম্যানিয়ায় মানুষ শিকার! ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে উহারা ট্যাস্‌ম্যানিয়ার আদিম নিবাসীদিগকে পশুবৎ শিকার করিয়াছিল! তাহাতে ১২০ জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল, আর সকলকেই উহারা গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল! † হা বিধাতঃ, এই অমানুষিক ঘটনা সত্য না হইলে, কেহ কি কল্পনাও করিতে পারিত যে মানুষে মানুষ শিকার করে! সে বেশী দিনের কথা নহে, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে। ইহাদিগের অসাধ্য কর্ম্মই নাই।

ভিন্ন দেশে আসিয়া অর্থ লোভে এবং উদারান্নের নিমিত্ত নবাগতগণ বিবিধ নীচ বৃত্তির আধার হয়। সে সকল দেখিয়া শুনিয়া আদিমনিবাসিগণ ভগ্নপ্রাণ হইয়া যায়। ইহারা যদি ন্যায় ও ধর্ম্মে উন্নত অবস্থাপন্ন হয়, তবে ইহারা দুর্ব্বিনীত মানব-চরিত্র দর্শনে একেবারে ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। মহাত্মা ডারউইনের ভাষায় বলিতে গেলে ইহাকেই “depression of spirits” বলা যায়। ইহাই মানসিক অবসাদ। নবাগতগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে যে সকল নিষ্ঠুর কর্ম্ম সাধন করে রাজশক্তি প্রাপ্ত হইলেও সেই বৈশ্য বৃত্তির হ্রাস হয় না।

---

* মহাত্মা ডারউইন বলিয়াছেন, এ অবস্থায় Natives become bewildered and dull by the new life around them ; they lose the motives for exertion and get no new ones in their place. Descent of Man. (1906) p 283.

† Ibid p 284.

কারণ তদ্রূপ স্থলে রাজশক্তিও বৈশ্যবৃত্তিরই পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুরাকালে বৈশ্যত্ব ধর্ম্মমূলক ছিল; বর্ত্তমান যুগে প্রায় কোন স্থলেই সে ভাব দৃষ্ট হয় না। সুতরাং নবাগতগণের অর্থ লোভ ও অর্জ্জন-স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইলে দেশীয়গণের হস্ত হইতে অন্নমুষ্টি খসিয়া পড়ে। অবশেষে তাহাদিগের উদারান্নের সংস্থানও চলিয়া যায়। তখন তাহারা শীর্ণ, রুগ্ন ও অবসন্ন হইয়া ক্ষুধায় পীড়ায় ও নৈরাশ্যে দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই হৃদয়-বিদারক ধ্বংসলীলা এ যুগের বাণিজ্যনীতির সহচর বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

যে দেহ অন্নহীন, ক্ষুধার্ত্ত, শীর্ণ, সে নানা পীড়ার আবাসভূমি। পুষ্ট ও সবল দেহে পীড়ার বীজ বিশেষ অনিষ্ট করিতে সক্ষম হয় না। সবল রক্ত কীটগণ * পীড়ার বীজ বিতাড়িত করে ও দূষিত অংশ সকল আত্মসাৎ করতঃ সংশোধিত করিয়া লয়। তাই পীড়া মারাত্মক হইতে পারে না। কিন্তু অন্নহীন শীর্ণ-দেহে, রক্তশূন্য কঙ্কালে সে সম্ভাবনা কোথায়? তাই দলে দলে মৃত্যু ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। যাহারা মরে, তাহারা ত বাঁচে; কিন্তু যাহারা জীবিত থাকে, তাহারা অপত্যোৎপাদন করিতে ক্রমেই অক্ষম হইয়া পড়ে। যে সকল অপত্য জন্মগ্রহণ করে, তাহারাও অনেকেই বাল্যাবস্থায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই মানবলীলা সংবরণ করে। এ অবস্থার পরিণাম যাহা, তাহা আধুনিক বাণিজ্য-নীতির বিষময় শেষ ফল।

নবসমাগমের অপরিহার্য্য ফল।

দূরবর্ত্তী বিভিন্ন জাতীয় মানব সমাগমের অপরিহার্য্য ফল পীড়া। যখন বিভিন্ন জাতীয় মানবগণের প্রথম সমাগম হয়, তখন তাহাদিগের সংস্রবজনিত কি জানি কি এক অজ্ঞাত কারণে আদিম-নিবাসিগণের মধ্যে নূতন নূতন পীড়া আসিয়া উপস্থিত হয়। † ঐ পীড়া সকলের পরিণাম অতি মারাত্মক হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল এতদ্দেশের ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কলেরা ইত্যাদি। আয়ুর্ব্বেদে এ সকলের উল্লেখ নাই। এই নবসমাগম-জনিত পীড়ায় অসংখ্য লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জগতের প্রধান প্রধান যুদ্ধ-বিগ্রহেও এত অধিক লোকক্ষয় হয় না। ইহাতে আদিম-নিবাসিগণের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। জন্ম সংখ্যা দ্বারা তাহার পূরণ হয় না। কারণ এ

---

* Phagocytes.

† It further appears, mysterious as is the fact, that the first meeting of distinct and separated people generates disease. Ibid P. 283.

অবস্থায় শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা অনেক অধিক হইয়া উঠে। রুগ্ন ও নির্জীব লোকের সন্তান বাঁচিবে কেমন করিয়া? তাই একদিকে যেমন মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া যায়, অন্যদিকে জন্ম-সংখ্যা দ্বারা তাহার পূরণ হয় না। আর ক্রমে, এই জন্মসংখ্যাও হ্রাস হইতে থাকে।

নবসমাগমের আর একটী গুণ, জননহীনতা। ইহাতে জনন-শক্তিরই হানি করে। জীবরাজ্যে এই নিয়ম অল্পাধিক পরিমাণে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য। মানবে এইরূপ হইবার প্রধান কারণ খাদ্য, পরিচ্ছদ, আচার, ব্যবহার ইত্যাদির পরিবর্ত্তন। মানব সমাজে সর্ব্বত্রই দেখা যায়, একজাতীয় মানব বিভিন্ন জাতীয় মানবের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে পরস্পরের সংসর্গ বশতঃ পরস্পরের মধ্যে ঐ সকল বিষয়ে অল্পাধিক পবিবর্ত্তন সাধিত হয়। আপনা হইতেই অনুকরণ-বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। এই বৃত্তি মনুষ্যের যেমন অশেষ কল্যাণকর, তেমনই অনিষ্টজনক। শিশু এই বৃত্তি হইতেই যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা করে। এই অতি স্বাভাবিক বৃত্তি, বিভিন্ন জাতীয় মানবের সংসর্গ হইলে, পরস্পরের আচার ব্যবহার পরস্পরের মধ্যে অল্পাধিক প্রচলিত করে। ভাল মন্দ, ইষ্টজনক অনিষ্টজনক বিবেচনা করিবার অবসর দেয় না। নবব্যবহার সকল নূতনত্ব বশতঃই এক হইতে অপর কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। তাহাতে খাদ্য, পরিচ্ছদ, আচার, আচরণ, চলা ফেরা কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু আদিম-নিবাসীদিগের যে পরিমাণ পরিবর্ত্তন ত হয়, অধিকাংশ স্থলেই নবাগতদিগের তদ্রূপ হয় না। বিশেষতঃ নবাগতগণ শক্তিশালী হইলে, অথবা রাজশক্তি লাভ করিলে, তাহাদিগের ব্যবহার অতিমাত্রায় আদিমনিবাসীদিগকে পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলে। এ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু ইহার ফল কি? প্রাচীন আচার ব্যবহারের, খাদ্য পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন হইলে কি ফল উৎপন্ন হয়? ফল জননশক্তির খর্ব্বতা। ইহাতে জনন-শক্তি ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে বংশলোপ হইয়া উঠে। মানব বহু প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে। চির-তুষারময় দেশ হইতে অগ্নিকুণ্ড তুল্য স্থানেও মানব বাস এবং বংশবৃদ্ধি করিতেছে। কিন্তু খাদ্যাদির পরিবর্ত্তন মানব সহ্য করিতে অক্ষম। ইহাদিগের জনন-যন্ত্রাদি এতই সহজে আক্রান্ত হয় যে, ঐ সকল বিষয়ে সামান্য পরিবর্ত্তন হইলেও মানব তাহা সহ্য করিতে সক্ষম হয় না। কোন জীবের জনন-যন্ত্রই এই সকল পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না। মানব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় অক্ষম হয়। আচার ব্যবহারের সামান্য পরিবর্ত্তনেই মানবের জননহীনতা উপস্থিত হয়; ও শিশুগণের

মৃত্যু সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। সেই সকল নবাগত আচার ব্যবহার সাক্ষাৎ স্বরূপে অনিষ্টজনক অথবা অস্বাস্থ্যকর না হইলেও উহার ফল অতীব মারাত্মক। (১) উহা হইতে জনন-হীনতা, পীড়া এবং অবশেষে জাতীয় বিলোপ আসিয়া উপস্থিত হয়। এ তত্ত্ব এখন পণ্ডিতমণ্ডলীতে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে। যে জাতি চিরাতীত কাল হইতে বংশ পরম্পরায় যেরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে, সে জাতি তাহার পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে অক্ষম। অসভ্য মানব ত সম্পূর্ণ রূপেই অক্ষম, সভ্য মানবও অনেকাংশে অপারক। যে দেশে যে জাতির যেরূপ খাদ্য, পরিচ্ছদ, ব্যবসায়, আচার আচরণ বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহার পরিবর্ত্তন করা সহজও নহে, করাও বিপজ্জনক।

তাহার পর, আর একটী কথা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। নবসমাগমের ফলে যদি এক জাতি আর এক জাতির অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিষময় ফল আরও সত্বর উৎপন্ন হয়। অধীন জাতি প্রভুগণের আচার ব্যবহার, খাদ্য পরিচ্ছদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, সুতরাং জনন-হীনতা ও পীড়া অতি সত্বর আসিয়া উপস্থিত হয়। একেত অধীনতার স্বাভাবিক ফলই জনন-হীনতা ও পীড়া; তাহার পর আচারাদি পরিবর্ত্তনে ঐ ফল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে। সমস্ত জীব রাজ্য পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অধীনতা, অর্থাৎ পরপুষ্টতা, গৃহপালিতাবস্থা এবং অবরোধ—এ সকল অনেক স্থলেই জনন-হীনতা উৎপাদন করে। মানবেও এ ফল বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। সুতরাং এসকল হইতেও মানব যথেষ্ট পরিমাণে আক্রান্ত হয়। অধীনতা আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সাধিত করে এবং তদ্ধেতু জনন-হীনতার পীড়া ও অবশেষে জাতীয় বিলোপ উৎপন্ন করিয়া নিবৃত্ত হয়।

নবসমাগম কি সর্ব্বনাশকর! আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্তন কি মারাত্মক!

---

(১) The most potent causes of extinction appear in many cases to be lessened fertility and ill-health especially amongst children arising from changed conditions of life, notwithstanding that the new conditions may not be injurious in themselves. * * * The births have been few and the deaths numerous. This may have been in a great measure owing to their change of living and food......and depression of spirits.

Ibid P 287—5,

ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় কি? উপায় স্বাবলম্বন ও স্বভাব যাহা নিজের তাহা রক্ষণীয়, যাহা পরের তাহা বর্জ্জনীয়। অমর কবি মধুসূদন এই মহা শিক্ষা দিবার নিমিত্তই বলিয়াছেন।

নির্গুণ স্ব-জন শ্রেয়ঃ পর পর সদা।

এই সকল কথা বলা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তেমন নহে। বুঝিলাম, নব সমাগমের ফল অতীব শোচনীয়; কিন্তু চীনের ন্যায় সমস্ত দেশ প্রাচীর-বেষ্টিত করিয়া রাখিলেও ত দূরবর্ত্তী বিভিন্ন জাতীয় মানবগণের আগমন প্রতিরোধ করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান যুগে মানবগণ দেশ দেশান্তরে গতায়াত করিবেই, ইহা নিবৃত্ত হইবার নহে। শিক্ষা, বাণিজ্য অথবা রাজ্য-লোভ ইত্যাদি মানবকে ধরাতলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা কাহারও নিবারণ করিবার সাধ্য নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, আফগানস্থান, তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশবাসিগণ অপর জাতীয় মানবকে স্ব স্ব দেশ মধ্যে প্রবেশাধিকার দিতেছেন না, সত্য। কিন্তু তাঁহারা দীর্ঘকাল ঐরূপ করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। যদি প্রকৃতই তাঁহারা সক্ষম হন, তাহা হইলেও বহু আয়াস ব্যতীত কৃতকার্য্য হইবেন না। তাঁহারা স্বাধীন, তাঁহাদিগেরই যদি এত আয়াস আবশ্যক হয়, তবে পরাধীন জাতিগণের সম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে? ইহারা নব সমাগম রোধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যতদিন ইহারা অধীন থাকিবে, ততদিন অপরের গতায়াত নিবারণ করিতে কখনই পারিবে না; সুতরাং নব-সমাগমের বিষময় ফল হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিবার কোনই উপায় ইহাদিগের নাই। তথাপি এরূপস্থলেও আত্মরক্ষা একবারে অসম্ভব নহে। আমরা দেখিয়াছি, নব-সমাগম-জনিত শোচনীয় পরিণামের মূল কারণ কি? মূল কারণ পীড়া ও জনন-হীনতা। ইহারা কিরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা এখনও বুঝা যায় নাই। কিন্তু ইহারা উপস্থিত হইলেই বুঝিতে হইবে যে, আক্রান্ত জাতির পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং বাঁচিতে চাহিলে ইহাদিগকে রোধ করিতে হইবে। পীড়া ও জনন-হীনতার কারণ সম্যক্‌রূপে আলোচিত হয় নাই; বিজ্ঞান এখনও এই বিষয় যথোচিতভাবে অনুশীলন করিতে সমর্থ নহে। তথাপি ইহা একরূপ বুঝা যাইতে পারে যে, সংমিশ্রণই কোনরূপে ঐ কারণদ্বয়কে আনয়ন করে। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ হইতে পীড়ার উদ্ভব হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কিন্তু ইহা হইতে কিরূপে জনন-হীনতা উৎপন্ন হয়, তাহা এখনও বুঝা যায় নাই। ডারুইন স্বয়ং ইহাকে mysterious অর্থাৎ অবোধগম্য বলিয়াছেন। যাহা হউক, সংমিশ্রণকেই ইহাদিগের কারণ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন।

যদি তাহাই হইল, যদি বিভিন্ন জাতীয় মানবের সংমিশ্রণই পীড়া ও জনন-হীনতার কারণ বলিয়া বিবেচিত হইল, যদি উহারাই জাতীয় বিলোপের অন্তর কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তবে বিলোপের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করা কঠিন নহে। সংমিশ্রণ ত্যাগ কর, তাহা হইলেই কারণের অভাব হইল; সুতরাং কার্য্যোৎপত্তিও অসম্ভব। অপর জাতীয়ের সহিত সংমিশ্রণ ত্যাগ করিলেই পীড়া ও জনন-হীনতা নিবৃত্ত হইল; সুতরাং জাতীয় বিলোপও সিদ্ধ হইল না। নব সমাগম যে উপায়ে ধ্বংসক্রিয়া সাধন করে, সেই উপায় রহিত হইলেই ক্রিয়াও রহিত হইবে। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয়-গণের সমাগম হইবে, অথচ সংশ্রব কিম্বা সংমিশ্রণ হইবে না,—ইহা কি সম্ভব? আমি বলি, সম্পূর্ণ সম্ভব না হইলেও ইচ্ছা থাকিলে একবারে অসম্ভব নহে।

নবাগতগণের সহিত সংশ্রব প্রধানতঃ কি কি কারণে হইয়া থাকে? বাণিজ্য, দাস্য ও শিক্ষা। যদি নবাগতগণ রাজপদ লাভ করে, তাহা হইলে তদুপলক্ষেও আদিমবাসীদিগের সহিত সংশ্রব হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত হেতু অর্থাৎ বাণিজ্য, দাস্য ও শিক্ষা, সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। ঐ সকল হেতুমূলকসংশ্রব ত্যাগ করা কঠিন নহে। উহা জাতীয় ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে। জাতীয় ইচ্ছা হিতাহিত বিবেচনা দ্বারা নিয়মিত হয়। সুতরাং যথোপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা হিতাহিত-বোধ জাত হইলেই এই শ্রেণীর সংশ্রব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইতে পারে, নব সমাগমের কুফল সকল হৃদয়ঙ্গম হইলে এ সংশ্রব ত্যাগ করা কঠিন হয় না। ইহা নবাগতগণের প্রতি বিদ্বেষমূলক ভাব নহে। ইহা কেবল উক্ত কুফল হইতে আত্মরক্ষা মাত্র। কিন্তু যে সংশ্রব রাজা-প্রজা সম্বন্ধ মূলক, তাঁহা ত্যাগ করা সহজ নহে; সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা অসম্ভব; অর্থাৎ যতদিন ঐ সম্বন্ধ অক্ষুন্ন থাকিবে, ততদিন অসম্ভব। তথাপি ঐ সম্বন্ধের অপলাপ না করিয়াও এপক্ষে আংশিক চেষ্টা করা যাইতে পারে। তাহাতে রাজবিধি লঙ্ঘন করা আবশ্যক হয় না। সকল মানব সমাজের পক্ষেই এ কথা প্রযোজ্য; বিশেষতঃ যেরূপ সমাজে রাজা কেবল দেশরক্ষক মাত্র, তদ্রূপ সমাজে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। এস্থলে আর্য্যজাতির কথা

স্মরণ করা যাইতে পারে। আর্য্যগণের রাজা বিধি প্রণয়নে অক্ষম। জনসাধারণের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, তাঁহারাই বিধিপ্রণেতা। রাজা প্রজা উভয়েই তাহা নতশিরে পালন করিতে বাধ্য। জাতীয় শিক্ষাও বিদ্বৎ-মণ্ডলীর হস্তে, রাজার সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই। দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষার ন্যায় গুরুতর কার্য্যও আর্য্য জনসমাজের স্বায়ত্ত, রাজাকে তন্নিমিত্ত কোন প্রয়াস স্বীকার করিতে হয় না। দেশীয় সমাজে পরস্পরের মধ্যে শান্তিরক্ষার কার্য্যও দেশবাসিগণের; রাজকীয় সৈন্যগণের উপর সে ভার ন্যস্ত নহে। অর্থী প্রত্যর্থীদিগের বাদ প্রতিবাদের মীমাংসা করা যদিও বিধি অনুসারে রাজার কর্ত্তব্য, তথাপি ঐ কার্য্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দেশীয় প্রধানবর্গের হস্তেই ন্যস্ত। কারণ অসংখ্য বাদ-প্রতিবাদ মীমাংসা করা রাজার সাধ্যাতীত। সর্ব্বকালেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সর্ব্বকালেই রাজকর্ম্ম-চারিগণ যে সংখ্যক বাদ প্রতিবাদ মীমাংসা করিয়া থাকেন, দেশীয় জনসাধারণ তাহার শত গুণ অধিক মীমাংসা করিয়া থাকেন। সুতরাং বিধি-প্রণয়ন, শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য ও শান্তিরক্ষা, মীমাংসা প্রভৃতি সকল কার্য্যই জনসাধা-রণের আয়ত্ত; রাজার তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। ইহাই আর্য্য-সমাজের রাজা প্রজা সম্বন্ধের বিশেষত্ব। অপর সমাজের আদর্শ ভিন্ন রূপ। তাহাদিগের মধ্যে রাজাই সব; জনসাধারণ প্রায় কিছুই নহে। রাজ-সম্মতি অথবা রাজাজ্ঞা না হইলে উল্লিখিত কোন কার্য্যই ঐ সকল সমাজে সিদ্ধ হয় না। কিন্তু আর্য্য সমাজে উহা প্রায় রাজার নিরপেক্ষ ভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাই যদি আর্য্য-সমাজের আদর্শ হইল, তবে কর গ্রহণ ও দেশরক্ষা, অর্থাৎ বিভিন্ন সমাজস্থ জনগণের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করা,—এই উভয় কার্য্যই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। অপরা-পর কার্য্যের সহিত রাজার বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকিতেছে না। এই সনাতন আদর্শ অঙ্গীকার করিলে রাজা প্রজা সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও অপরাপর বিষয়ে রাজসংশ্রব ত্যাগ করা অসম্ভব নহে। কেবলমাত্র কর-প্রদান ও দেশরক্ষার সহায়তা করিলেই প্রজাভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। তদ্ভিন্ন সামাজিক ও রাজ-নৈতিক সমস্ত কার্য্যই রাজার নিরপেক্ষ ভাবে অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে; এবং তদ্রূপ করাই সঙ্গত। নতুবা জনসাধারণ ক্রমে রাজপ্রত্যাশী হইতে হইতে স্বাবলম্বন শূন্য হইয়া অধঃপাতে যাইবার বিশেষ আশঙ্কা উপস্থিত হয়। এই হেতু নবাগতগণ রাজপদ প্রাপ্ত হইলেও আদিমবাসিগণ উল্লিখিত দ্বিবিধ

প্রজাধর্ম্ম পালন করিলেই যথেষ্ট হয়; অন্যান্য বিষয়ে তাহাদিগের সংশ্রব ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ কল্প। নব সমাগমের শোচনীয় ফল হইতে আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায়ই, সংশ্রব-ত্যাগ। সুতরাং যতদূর সম্ভব, নবাগতগণের সংশ্রব ত্যাগ করাই প্রশস্ত। ইহা রাজা প্রজা সম্বন্ধের বিরোধী নহে; ইহা বিদ্বেষমূলকও নহে; কর দান ও দেশ রক্ষার সহায়তা করিলেই প্রজাধর্ম্ম স্থির থাকিল; অন্য বিষয়ে সংশ্রব ত্যাগ করা কেবল জাতীয় বিলোপ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা মাত্র। সেই সকল বিষয় স্বায়ত্ত হইলেই যে সংশ্রব ত্যাগ করা হইল, তাহা নহে; অপরের নিয়োগ মত অর্থাৎ জনসাধারণ ব্যতীত অন্যের বিধানানুসারে ঐ সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেও সংশ্রব রহিয়া গেল। তাহা হইলেই আত্মরক্ষা হইল না। সুতরাং অন্য বিষয়ে সংশ্রব ত্যাগ করার অর্থই এই যে, সেই সকল বিষয় জনসাধারণের নিয়োগানুসারে জনসাধারণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক; অথবা ঐ ভাবেই তাহাদিগের মধ্য হইতে নির্দ্দিষ্ট জনগণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য।

এইরূপে বাণিজ্য, দাস্য, (বৈতনিক হউক অথবা অবৈতনিক হউক) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শান্তিরক্ষা, মীমাংসা, বিধি প্রণয়ন ইত্যাদি সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্য্যে নবাগতগণের সংশ্রব পরিত্যাগ করাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। নচেৎ পীড়া ও জননহীনতার হস্ত হইতে, নিরুদ্যম ও অবসাদের গ্রাস হইতে, অবশেষে জাতীয় বিলোপের যমদণ্ড হইতে, আত্মরক্ষা করা অতীব অসম্ভব। নানা দেশীয়, নানা জাতীয় মানব সমাজ এই বৈজ্ঞানিক তথ্য যত শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, ততই মঙ্গল। ইহাকে যে নাম দিতে হয় দাও; কিন্তু ইহা মানবের মঙ্গলবিধান, মানবের অনিষ্ট সাধন নহে।

আত্মরক্ষা।

বোধ হয় সকল জীবেরই, বিশেষতঃ উচ্চ শ্রেণীস্থ জীব মাত্রেরই আত্মরক্ষা বৃত্তি আছে। অদ্য এই বৃত্তির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সম্ভবতঃ উদ্ভিদই এই পৃথিবীর আদিম অধিবাসী। উহারা ধরাতলে বংশ বৃদ্ধি করতঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; এবং সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে-ছিল। ইতি মধ্যে কোথা হইতে জন্তু আসিয়া উপস্থিত হইল। জন্তুগণ আসিয়া উহাদিগের মূল, কাণ্ড, ফল, পত্র সকলই আহার করিতে আরম্ভ করিল। প্রাথমিক জন্তুগণ উহাদিগের বিশেষ অনিষ্ট করে নাই। পরে জন্তুগণ যখন বংশ পরম্পরায় ধরাতল ছাইয়া ফেলিল, তখন ক্রমেই উদ্ভিদের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল। ক্রমে উহারা উদ্ভিদের সকলই খাইতে আরম্ভ করিল। কেবল তাহাই নহে, কাজে অ-কাজে উহাদিগকে কাটিয়া ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া —নানাবিধ রূপে উৎপীড়িত করিয়া তুলিল। এরূপ অবস্থায় উদ্ভিদের আত্ম-রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিত; উহারা আগন্তুক জন্তুগণের অত্যাচারে নির্ব্বংশ হইয়া যাইত, ধরাতলে উহাদিগের নাম মাত্রও থাকিত না। কিন্তু বিধাতার বিস্তীর্ণ জগতে উহাদিগের আবশ্যকতা আছে। তাই উহারা বিনষ্ট হইবে কেন?

উহাদিগের আত্মরক্ষা বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। জন্তুর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক হইল। যেখানেই আত্মরক্ষার চেষ্টা, তাহার মূলে অল্লাধিক অত্যাচার থাকিবেই। অপরে অত্যাচার না করিলে জীবের আত্ম-রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি বিশেষ রূপে জাগ্রত হয় না। তাই সে আত্মশক্তি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতেও পায় না; আপনাকে পূর্ণ মাত্রায় চিনিতেও পায় না। আর আপনাকে চিনিতে না পারিলেও জীবের মুক্তি নাই, বন্ধচ্ছেদ অসম্ভব। "তজ্জলানিতি" *—যাহাতে উদ্ভব, আবার তাহাতেই লয়। জীব ব্রহ্মে লীন হইবে। সুতরাং আপনাকে চিনিবেই। আত্মানং বিদ্ধি † এই মহোপদেশ

---

* ছান্দোগ্য।

† গীতা।

সফল হইবেই। সকল জীবই আপনাকে চিনিবে; বন্ধমুক্ত হইবে; দু'দিন অগ্র পশ্চাৎ এই মাত্র প্রভেদ।

আপনাকে প্রকৃত রূপে চিনিবার প্রধান—বোধ হয় এক মাত্র হেতু আত্ম-রক্ষা বৃত্তি।

উদ্ভিদ যখন বুঝিল,সে জন্তুগণ কর্তৃক অশেষ প্রকারে নির্ম্মূল হইতে চলিল, তখন সে কি করিল? আত্মরক্ষার নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল; কেহবা কণ্টকাবৃত হইতে লাগিল, কেহ বা তিক্তরস উৎপাদন করিল, কেহ বিষ প্রস্তুত করিয়া তুলিল। এইরূপে বিবিধ উপায়ে উহারা আত্মরক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। বিবর্ত্তনবাদিগণ জীবকোষের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন স্বীকার করেন। জীবকোষ, তাঁহাদিগের মতে চিরাতীত কাল হইতে স্বভাবতঃই অল্লাধিক পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাহা অবস্থানু-সারে উপকারজনক তাহাই বংশানুক্রমে রক্ষিত হয়; অন্যবিধ পরিবর্ত্তন রক্ষিত হয় না। যে জীব, অবস্থার উপযোগী পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইল, সে বংশ বৃদ্ধি করতঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িল; আর যে জীব, ঐরূপ প্রাপ্ত হইল না, সে ক্রমে ক্রমে জীবন-ব্যাপারের অনুপযোগী হইয়া পড়িল; অবশেষে মরিয়া নির্ম্মূল হইয়া গেল। সংক্ষেপতঃ ইহাই বিবর্ত্তনবাদ। এই বাদ অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, উদ্ভিদদিগের মধ্যে যাহারা জন্তু হইতে আত্মরক্ষার উপ-যোগী রূপে পরিবর্ত্তিত হইল এবং দেশকালের যোগ্য হইল, তাহারাই জীবিত থাকিয়া বংশ বিস্তার করিতেছে; যাহারা তদ্রূপ হইতে পারে নাই, তাহারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে সকল উদ্ভিদের দেহ-কোষে তিক্তরস অথবা বিষ কিম্বা প্রদাহ-উৎপাদক পদার্থ সঞ্চিত হইতে লাগিল, তাহাদিগকে জন্তুগণ আর উদরস্থ করিতে পারিল না। জন্তুগণের মধ্যে যাহারা অল্পবয়স্ক, অন-ভিজ্ঞ ও বিচারহীন, তাহারা ঐরূপ উদ্ভিদ আহার করিয়া মরিতে আরম্ভ করিল, অথবা অন্য প্রকারে কষ্ট পাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অপর জন্তু-গণের শিক্ষা হইল। উহারা আর উদ্ভিদকে উৎপীড়িত করিতে সাহসী হইল না। তাই উদ্ভিদ নিরাপদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইল। মিঠা বিষ, কুচিলা, মান, কচু, ওল,ব্যাঙ্গের ছাতা প্রভৃতি উদ্ভিদ বিষ, অথবা বিষবৎ পদার্থ উৎপন্ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। ইহারা অতি নিরীহ ছিল,এখনও মান, কচু, ওল, ব্যাঙ্গের ছাতা দিগের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ নিরীহই আছে। তাহারা বিষ প্রস্তুত করিতে শিক্ষাই করে নাই; সুতরাং

জন্তুগণ তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিতেছে। উদ্ভিদের শিশুদিগকেই অধিক ভক্ষণ করে। আর তাহারাই আত্মরক্ষার নিমিত্ত বিষ, অথবা বিষবৎ পদার্থ অধিক প্রস্তুত করতঃ নিজের এবং অপরের রক্ষা বিধান করে। উদ্ভিদ শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে, অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলেই এই সকল মারাত্মক পদার্থ সঞ্চয় করতঃ আত্মরক্ষা করিতে উদ্যত হয়। * অধিকাংশ উদ্ভিদই পত্রে ফলে অথবা অন্য প্রকাশ্য স্থানে এই সকল পদার্থ সঞ্চয় করে; কিন্তু আলু, ওল প্রভৃতি নিরীহ ও উপকারী উদ্ভিদ সকল নিভৃতে মাটীর নীচে বিষবৎ পদার্থ সঞ্চয় করতঃ তদ্দ্বারা বংশবৃদ্ধি সাধন ও আত্মরক্ষা উভয় কার্য্যই করে।

কিন্তু উদ্ভিদের ও ইতর জন্তুগণের দৈহিক পরিবর্ত্তন দ্বারাই আত্মরক্ষা সিদ্ধ হয়। উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুগণ দৈহিক ও মানসিক, উভয়বিধ পরিবর্ত্তন দ্বারাই আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। উদ্ভিদের দেহ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী না হইলে উহারা জীবিত থাকিতেই পারেনা, ইতর জন্তুদিগেরও তাহাই। বিছা, বোল্‌তা, মধুমাছি, মাকোড়সা, সর্প প্রভৃতি জন্তুগণ নানাবিধ বিষ অথবা বিষবৎ পদার্থ দেহমধ্যে উৎপন্ন করে; তদ্বারাই তাহাদিগের আত্মরক্ষা হয়। ইহাদিগের মধ্যে কোন শ্রেণীস্থ জীব নিরীহ; তাহাদিগকে অপরে মারিয়া ফেলে। কিন্তু কোন কোন শ্রেণী বিষযুক্ত, তাহাদিগকে অপরে সহজে কিছুই করিতে পারে না। এমন যে বিষধর সর্প, তাহারাও সহজে এবং সকলে বিষ সঞ্চয় করে নাই। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিষহীন; কিন্তু তাহারাও বিষযুক্ত সর্পের জ্ঞাতি বিধায় অত্যাচারের হস্ত হইতে প্রায় নিরাপদ হইয়াছে। ইহাদিগের প্রথমে বিষ ছিল না বলিয়াই অনুমান হয়; পরে ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীতে বিষপদার্থ জাত হইলে তাহাদিগের আত্মরক্ষার অধিক সম্ভাবনা হইয়াছে। মানবের প্রায় নিকটবর্ত্তী জন্তু বানর; সে বুদ্ধিবৃত্তিতে অপরাপর জন্তু হইতে উন্নত। সুতরাং সে অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছে। অন্যের দৈহিক পরিবর্ত্তনই আত্মরক্ষার একমাত্র সম্বল; কিন্তু

---

* These objectionable substances are found most abundant in adult plants, so that they must have reference to flowering and seeding. * * They also indicate that such poisonous defences have been acquired. Cattle often partake of objectionable young plants.—Sagacity aud Morality of plants, p 122.

ইহারা যে পরিমাণে হীনবীর্য্য হইয়াছে, সেই পরিমাণেই অস্ত্র ব্যবহারে পটু হইতেছে। ঢিল, লাঠি, বৃক্ষশাখা প্রভৃতি অস্ত্র সাহায্যে ইহারা আত্মরক্ষা করিয়া থাকে।

কিন্তু উদ্ভিদের ও জন্তুর আত্মরক্ষা বৃত্তির মূল কারণ এক নহে। উদ্ভিদ প্রথমতঃ অত্যাচার ও উৎপীড়ন নিবারণ নিমিত্তই আত্মরক্ষার উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু জন্তুগণ ক্ষুধার তাড়নায় বিষ অথবা বিষবৎ পদার্থ প্রথমে সঞ্চয় করে; পরে তাহা আত্মরক্ষা কার্য্যে ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছে। সর্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, ইহারা শিকার পাইলে দংশন করতঃ তাহাদিগকে অজ্ঞান ও নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলে; পরে অবসর মত ভক্ষণ করে। অজ্ঞান করিবার উপায় বিষ-প্রয়োগ। উহারা আহারের নিমিত্তই চেষ্টিত হয়, পরে আত্মরক্ষার আবশ্যক হইলে তদ্রূপ কার্য্যে বিষ ব্যবহার করে।* উদ্ভিদের আত্মরক্ষার মূল প্রবর্ত্তক কারণ, অত্যাচার; জন্তুগণের ক্ষুন্নিবৃত্তি।

যখন আহারের অনাটন উপস্থিত হয়, তখন জন্তুগণ আহারের চেষ্টা করে। আহার দুষ্প্রাপ্য হইলে অথবা অন্য কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে উহারা মরিয়া যাইবে। এইরূপ সঙ্কটে আত্মরক্ষার বৃত্তির পরিচালন করিতে বাধ্য হইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় জন্তুগণ বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োগ করে। উহাদিগের মধ্যে যাহারা অল্পবুদ্ধি, তাহারা স্বভাবজ দৈহিক পরিবর্ত্তনের সাহায্যেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে; আর যাহারা বুদ্ধিবৃত্তিতে উন্নত, তাঁহারা নানারূপ কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। কেহ প্রকাশ্যে, কেহবা অপ্রকাশ্যে এইরূপ করিবেই। কার্য্য মাত্রেরই কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। এক জীব অপর জীবকে বধ করা স্বাভাবিক ক্রিয়া নহে। আক্রমণ আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। আত্মরক্ষা-বৃত্তির কারণ কি? অত্যাচার অথবা ক্ষুন্নিবৃত্তি। মূলতঃ ইহাদিগকেই কারণ বলিতে হয়।

উদ্ভিদ এবং ইতর জন্তুর পর এক্ষণে মানবের কথা সংক্ষেপে বিবেচনা করা আবশ্যক। জীবতত্ত্বের আলোচনায় ঐ সকলকে এবং মানবকে এক চক্ষুতেই দেখিতে হয়। মানব উক্ত দুই কারণকে একত্রিত করিয়া লইয়াছে।

* The primary function of poison-apparatus in the economy of snakes is without doubt to serve as the means of procuring their food. But like the weapons of other carnivorous animals, it has assumed the secondary function of an organ of defence. Ency. Brit. vol 22 p 191.

মানবের আত্মরক্ষা বৃত্তির মূলে অত্যাচার ও ক্ষুন্নিবৃত্তি, দুই-ই আছে। যখন অন্য জন্তু অথবা অপর মানব কর্ত্তৃক ইহারা উৎপীড়িত হয়, এবং বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আর কোন উপায় দেখিতে সক্ষম হয় না, তখন মানব বুদ্ধিবলে অস্ত্র উদ্ভাবন করতঃ আত্মরক্ষা করে। মানবের দৈহিক পরিবর্ত্তনে আত্মরক্ষার বিশেষ সুবিধা নাই; তাই বুদ্ধির আশ্রয় লইতে হয়। মানব প্রধানতঃ অথবা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিবলেই আত্মরক্ষা করে। তাহাতে অপর জন্তু অথবা অন্য মানবকে সময় সময় আক্রমণ ও বধ করা আবশ্যক হয়। ইহা দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। মানুষে মানুষ বধ করে, দয়াময়ের রাজ্যে ইহা অপেক্ষা নিষ্ঠুর কর্ম্ম আর নাই। কিন্তু মানব এখনও উচ্চ-শ্রেণীস্থ জন্তু মাত্র; তাহার উপরে উঠিতে এখনও সক্ষম নাই। সুতরাং এ অবস্থায় এই সকল হৃদয়বিদারক ঘটনা অত্যাচারের সঙ্গীরূপে বর্ত্তমান থাকিবেই। মানবকে এ নিমিত্ত দোষী করা যায় না। যদি কাহাকেও করা যায়, তবে সে অত্যাচারীকে। অত্যাচারই আক্রমণের মূল; আক্রমণ আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। যেখানে অত্যাচার নাই, যেখানে ক্ষুন্নিবৃত্তির ইচ্ছা প্রবল নহে, সেখানে আত্মরক্ষা বৃত্তি, বিশেষতঃ আক্রমণ-স্পৃহা, বিশেষভাবে জাগ্রত হয় না।

কিন্তু মানব সমাজের নেতৃগণ † এ তথ্য সর্ব্বদাই অবহেলা করিতেছেন। যে তথ্য জীবমাত্রেই প্রযোজ্য, তাহা মানবসমাজের পক্ষে নেতৃগণ বিস্মৃত হইয়া যান। মানবকে চিনিতে হইলে জীবতত্ত্ব যেরূপ ভাবে অবগত হওয়া উচিত, প্রায় সর্ব্ব সমাজেই নেতৃগণ তাহা জানেন না। তাই পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়া সমাজকে পথভ্রষ্ট করেন। অধ্যাপক রে ল্যাঙ্কেষ্টার মানব সমাজের নেতৃগণের ব্যবহার দৃষ্টে ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি তাহাদিগকে 'মূর্খ, বেউকুফ্ কেরাণির দল' বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।* তিনি ইংলণ্ডীয় রাজ কর্ম্মচারিগণকেও ঐরূপ আখ্যা হইতে বাদ দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। যদি ইংলণ্ডের সম্বন্ধেই এই কথা সত্য হয়, তবে অন্যান্য দেশেও হইবে। এতদ্দেশে ত বিশেষরূপেই হইবে, কারণ এখানে

† যাঁহারা রাজ্য পরিচালন করেন, তাঁহাদিগকেই এই শব্দে অভিহিত করিতেছি।

* A body of clerks without any pretence to an education in the knowledge of nature, headed by gentlemen of title equally ignorant.

Kingdom of Mans p 48.

ইংলণ্ডীয় উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক রাজকীয় কর্ম্মে প্রায় নাই বলিলেই হয়। সকল দেশেই নেতৃগণ জানেন না যে, অত্যাচারই আক্রমণের নিমিত্ত-কারণ। এই জ্ঞান থাকিলে আক্রমণকারীদিগকে দয়ার চক্ষে দেখিতেন; তাহা ত দেখেনই না, বরং তাহাদিগকে পদদলিত করিবার জন্য সতত চেষ্টা করেন। ইহাই মূর্খতা। বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ টম্‌সন্ বলিতেছেন, Are not criminals mere anachronisms ?—people out of time or out of place who require not incarceration or worse but only transplanting. ‡ Transplanting শব্দে উত্তম সংসর্গ যুক্ত দেশ ও কালকে লক্ষ্য করে। তিনি অন্যত্র ইহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতেছেন। আক্রমণকারিগণকে ক্ষমা করা অসম্ভব হইলে, অন্ততঃ তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করা উচিত। ¶ ইহারা কে? ইহারা অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা-প্রয়াসী। যে বৃত্তি সমস্ত জীবমণ্ডলীতে ক্রিয়া করিতেছে, ইহারা তদ্বারাই অণুপ্রাণিত। ইহারা উপায় বিষয়ে কখন কখন ভ্রমে পতিত হয়, সন্দেহ নাই, মনুষ্য মাত্রেই ভ্রমের আধার। কিন্তু ইহারা কৃপার পাত্র। যে অত্যাচার হইতে জীব আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত আক্রমণ অবলম্বন করে, তাহাই সংযত করা বিজ্ঞানানুমোদিত। কিন্তু যতদিন অধ্যাপক ল্যাঙ্কেষ্টারের উক্তি সত্য থাকিবে, ততদিন নেতৃগণ তাহা বুঝিবেন না।

আত্মরক্ষা-বৃত্তিই জীবের প্রধান ধন, ইহাই তাহার মূল সম্পৎ। এই বৃত্তিই জীবকে উত্তরোত্তর উন্নত করিয়াছে; নচেৎ জীব এতদিন ধরাতলে থাকিতেই পারিত না। এই বৃত্তি বিবিধ সদ্‌গুণের আধার। ইহা হইতেই সমাজ ও সামাজিক ধর্ম্ম উদ্ভব হইয়াছে। পরস্পরের রক্ষার নিমিত্তই জীব সমাজবদ্ধ হয়; এবং তাহা হইতেই সমাজ-ধর্ম্মের আবির্ভাব। এই সামাজিক বৃত্তি যিনি দলিত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি জীবের শত্রু। এই বৃত্তিই জীবকে উত্তরোত্তর দেব ভাবে পূর্ণ করিবে; ইহাই জীবের মুক্তির কারণ, বন্ধ-চ্ছেদর উপায়। নেতৃগণ যত শীঘ্র এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করেন, ততই জগতের মঙ্গল, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

---

‡ Heredity p 531.

¶ যাহাকে Reactionary কিম্বা "of the restless type" বলা হয়, if he cannot be pardoned when we know all, can at least be better dealt with the better he is under-stood. Ibid p 524.

মানবদেহের আবির্ভাব ও তিরোভাব।

পৃথিবীতে চিরদিন জীব বাস করে নাই; অন্ততঃ আমাদিগের ন্যায় জীব, চিরদিন বাস করিতে সক্ষম হয় নাই। যখন ইহা অত্যুষ্ণ ছিল, তখন বর্ত্তমান যুগের সমস্ত জীববাসের অনুপযোগী ছিল। ইহার জলময় অবস্থাও প্রথম সময়ে এ যুগের জীবগণের উপযুক্ত ছিল না। তৎকালে বায়ুর অবস্থাও আমাদিগের প্রাণনাশক ছিল। জলে চূণ, বায়ুতে অঙ্গারাম্ল এত অধিক ছিল যে, ইহা মানবের বাসোপযোগী ছিল না। ধরাপৃষ্ঠের নিম্নতম স্তর জীবচিহ্নবিরহিত। যে স্তরে প্রথম জীবচিহ্ন পাওয়া যায়, উহাতে চূণ ও অঙ্গারের ভাগ অত্যন্ত বেশি। চূণ ও অঙ্গারের সহিত কি জীবনের কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে? এখনও আমরা অঙ্গার-ই; আমাদিগের অস্থি সকল চূণ-অঙ্গার-মিশ্রিত।

জীব কিরূপে এই ধরাপৃষ্ঠে প্রথম আবির্ভূত হইল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কেহ একরূপে, কেহ অন্যরূপে, তাহার আবির্ভাবের রহস্যভেদ করিবার চেষ্টা করেন। আমরা সে কথা এস্থলে তুলিব না। কিন্তু জীব ধরাপৃষ্ঠে যেরূপেই আসিয়া থাকুক, তৎপরবর্ত্তী কালের ইতিহাস একেবারে দুর্ব্বোধ্য নহে। কীট হইতে আরম্ভ করিয়া মানব পর্য্যন্ত বিবেচনা করিতে গেলে, জীবের ঊর্দ্ধগতি অতি বিস্ময়জনক বোধ হয়। আর মনে হয়, যেন ধরিত্রী মানবের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; যেন তাহারই জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

সে সময়ে সমুদ্রে চূণ, বায়ুতে অঙ্গার, অত্যন্ত অধিক ছিল। সেকালের সমুদ্রবাসী জীবগণ ক্ষুদ্র হইতে অতি-বৃহৎ পর্য্যন্ত সকলেই, অল্পাধিক চূণ টানিয়া লইয়া জলকে পরিষ্কার করিতে পারিত। তাহাদিগের দেহ প্রায় চূণই। এই সকল জীবের সংখ্যা এত অধিক হইল যে, তাহাদিগের দেহগঠনকার্য্যে অনেক চূণ ব্যয়িত হইল। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেও অনেক চূণ সমুদ্রতলে পতিত হইয়া গেল; ইহাতেও জল অনেক বিশুদ্ধ হইল; ক্রমে সমুদ্রে চূণের আধিক্য গিয়া লবণের আধিক্য উপস্থিত হইল। বর্ত্তমানযুগে এই অবস্থাই বিদ্যমান, আর এই পদার্থ (লবণ) মানবের বিশেষ প্রয়োজনীয়। জল এইরূপে আদিমকাল হইতেই মানবের উপযোগী হইতেছিল। কিন্তু

বায়ু কিরূপে পরিষ্কৃত হয়? মানব যে অঙ্গারাম্ল সহ্য করিতে পারে না, মানবকে আনিতে হইলে এই পদার্থ বর্জ্জন করা আবশ্যক। তাই, সেকালের প্রকাণ্ড উদ্ভিদ সকল ঊর্দ্ধে কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত করতঃ বায়ু হইতে অঙ্গার টানিয়া লইয়াছিল। এই উপায়ে যেমন বায়ুও পরিষ্কৃত হইতেছিল, তেমনি সেই সকল উদ্ভিদের দেহে অঙ্গার সঞ্চিত হওয়ায় মানবের অগ্নি জ্বালাইবারও সদুপায় হইতেছিল। সে কালের উদ্ভিদ সকল এত বৃহৎ * এবং এত বিস্তৃত ছিল যে, ইহাদিগের দেহগঠন কার্য্যে অনেক অঙ্গার ব্যয়িত হইয়াছে; এবং বায়ুও ক্রমে পরিষ্কৃত হইয়াছে। সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া যেমন জলস্থ ক্ষার এবং অন্যান্য ভাসমান পদার্থকে তলদেশে পড়িয়া যাইবার সাহায্য করিয়াছে, তেমনই ঐ বাষ্প বৃষ্টিরূপে পতিত হইতে অনেক অঙ্গারাদি লইয়াই পড়িয়াছে; তাহাতে গন্ধক, অঙ্গারাদি পদার্থ সেই জলের সহিত মিশিয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইয়া, একদিকে ধরার বাসোপযোগিতা, অন্যদিকে বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়াছে। এইরূপ নানাবিধ উপায়ে প্রকৃতি জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। সে সকলই ভূপৃষ্ঠকে মানবের বাসোপযোগী করিবার জন্য।

ভূপৃষ্ঠের সম্বন্ধে অতীতকালকে তিনভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। (১) অজীবাবস্থা, (২) উদ্ভিদযুগ, (৩) জন্তুযুগ। "বলা বাহুল্য যে, উদ্ভিদযুগেও জন্তু ছিল এবং জন্তুযুগেও উদ্ভিদ আছে। গরিষ্ঠ লক্ষণকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ বিভাগ করা যায়। †" জন্তুযুগে জলে-স্থলে যে সকল অতিকায় ও ভয়ঙ্কর জন্তু সকল বাস করিত, তাহারা প্রায় মস্তিষ্কহীন ছিল। সে যুগে সকল জন্তুরই মস্তিষ্ক নিতান্ত অল্প ছিল। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিও যৎসামান্য ছিল। মানব তখনও ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয় নাই; হইলে তাহাদিগকে বশে আনিতে পারিত কিনা সন্দেহ। বরং ইহাই আশঙ্কা হয় যে, সে যুগে মানব বিদ্যমান থাকিলে, ঐ সকল পশুর পার্শ্বে আত্মরক্ষা করিতেই সমর্থ হইত না। তখনকার সামান্য একটী সরীসৃপ, এখনকার উষ্ট্রের ন্যায়। হস্তী, উষ্ট্র, সিংহাদি স্থলে, তিমি-আদি জলে সে সময়কার অনতিবৃহৎকায় জীব। সে অবস্থায়, তাদৃশ দুষ্ট, অস্ত্রবহুল, অশিষ্য, হিংস্রজন্তুর মধ্যে ক্ষীণ, নিরস্ত্র মানবের উপযুক্ত বাসস্থান হইতেই পারে না। সেইজন্য প্রকৃতি বিবিধ উপায়ে তাহাদিগকে

* এ যুগের বাঁশ সেকালের তৃণমাত্র, একরূপ ঘাসমাত্র।

† ভারতী ২০ ভাগ, ১১৫৩ পৃঃ।

সরাইয়া দিলেন। এই সকল উপায়ের মধ্যে শীত, গ্রীষ্ম, আদ্রতা ও শুষ্কতা আহারের অসদ্ভাব এবং অযোগ্যতা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জন্তুগণ এই সকল অস্ত্রধারিণী প্রকৃতির সহিত জীবনসংগ্রামে একে একে পরাজিত হইতে লাগিল। যে এই কঠোর জীবনসংগ্রামে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইল, সেই বাঁচিল; অন্যান্য চিরতরে বিলুপ্ত হইল। এইরূপে যাহারা বাঁচিল, তাহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় এবং অধিকতর মস্তিষ্কবান। তাহারা শিষ্ট এবং পূর্ব্ববৎ হিংস্র ও অস্ত্রবহুল নহে। এই সময়ই মানবের আবির্ভাবের উপযুক্ত সময়। বায়ু বিশুদ্ধ হইয়াছে; নিদারুণ উষ্ণতার যুগ অতীত হইয়াছে; অতিকায় হিংস্র বহু-অস্ত্রধারী পশুগণ একে একে ভূপৃষ্ঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এই সময়ের জন্যই ধরিত্রী অপেক্ষা করিতেছিলেন; যুগযুগান্তর হইতে প্রস্তুত হইতেছিলেন। শুভক্ষণে মানবের জন্ম হইল; প্রকৃতি কৃতার্থা ও পরিতৃপ্তা হইলেন।

সে কতকালের কথা, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। নানা জনে নানারূপ অনুমান করেন। সে কাল তিন লক্ষ বৎসরের ন্যূন হইতে পারে না; যাহাকে আমরা জন্তুযুগ বলিয়াছি, তাহারই শেষাংশে মানবের আবির্ভাব, এইমাত্র বলা যাইতে পারে।* এই সময়ে অতি অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রকৃতি নির্ব্বোধ ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক স্তন্যপায়ী জীবগুলিকে যুগপৎ বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী করিলেন। যেন নিজের হাতে সকলেরই মস্তিষ্ক বাড়াইয়া দিলেন। যে সকল অপেক্ষাকৃত কম হিংস্র জীব তখন থাকিল, তাহারা প্রায় সকলেই যুগপৎ মস্তিষ্কবান হইল। হস্তী অশ্ব গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎ পশুগণ আর ক্ষুদ্রকায় বানরগণ, সকলেরই মাথার খোল (কপালাস্থি) একসঙ্গে বাড়িয়া গেল; সকলেরই মস্তিষ্কের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী Tertiary সময়ে যেরূপ ছিল, তাহা হইতে অনেক বাড়িয়া গেল†। মুহূর্ত্তমধ্যে এই অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার

---

* এই সময়কে ভূতত্ত্ববিৎগণ Lower Miocene যুগ বলেন. The Romanes Lecture 1905, pp. 17-18.

† It is a very striking fact that it was not in the ancestors of Man alone that this increase in the size of the brain took place at this same period, viz. the Miocene.........Other great mammals of the earlier Tert period were in the same case.— Ibid P. 8.

কেন সংসাধিত হইল? যদিবা মুহূর্ত্তমধ্যেও না হউক, যাহা অতীতকালে যুগ-যুগান্তরেও হইতে পারে নাই, তাহা এই (Miocene) জন্তুযুগের শেষার্দ্ধে এত তাড়াতাড়ি হইয়া উঠিল কেন? আমি বলি, মানবের অভ্যর্থনার জন্য। মানব মানব-নাশের উপযুক্ত হইতে গেলে নখ, শৃঙ্গ ভীমদন্ত ইত্যাদি লইয়া আবির্ভূত হইতে পারে না। মানবের সুন্দর রূপ, দেবোপম গুণ সকল বিকশিত করিতে হইলে তাহাকে একদিকে যেরূপ ক্ষীণ দুর্ব্বল ও শান্ত করিতে হয়, অন্যদিকে তাহাকে তেমনি বুদ্ধিশালী করিতে হয়। তাই তাহার ক্ষুদ্রদেহে বিশাল মস্তিষ্ক। তাহাকে সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ করিতে হইলে সকলকে তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিতে হইলে, তাহাদিগেরও গৃহপালিত হইবার অথবা অন্যবিধ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। তাই তাহাদিগেরও নিতান্ত মস্তিষ্কহীন হইলে চলে না। এইজন্য যুগপৎ সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবই বর্দ্ধিতমস্তক এবং বর্দ্ধিত-মস্তিষ্ক হইয়া গেল। তখন হইতেই মানবের শ্রেষ্ঠত্বের বীজ উপ্ত হইল। এই মস্তিষ্ক পদার্থের নানা কোষের বিচিত্রতা, নানা আবর্ত্তের জটিলতা ইহাকে অসীম শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। ইহার আয়তন ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। মানবের দেহ ত ইহার পূর্ণবিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র নহেই। ইহার শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইলে মানবদেহ ত ইহার প্রয়োজনসাধনে অসমর্থ হইবেই। মানবের বর্ত্তমান মনও এই অসীম শক্তিসম্পন্ন পদার্থের সমস্ত সাধনা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবে না। এখনই মানবমন আংশিকরূপে ইহার নিকট পরাস্ত হইয়াছে। কিন্তু সে কথা কিছু বিস্তৃত, তাহা ক্রমে আলোচিত হইবে।

আমরা বলিলাম যে, মস্তিষ্কপদার্থের পূর্ণবিকাশে মানবের দেহ ও মন উভয়ই ইহার কার্য্যসাধনে অক্ষম হইবে। এখনই উহারা মস্তিষ্কের নিকট পরাস্ত হইয়াছে, ক্রমে আরও হইবে। এস্থলে মস্তিষ্কশব্দ বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়াছি। মানবের বুদ্ধি দেহ ও মনের ক্ষমতা অতিক্রম করিয়াছে; এবং উত্তরোত্তর আরও করিবে। দেহ নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ; মনের শক্তি যদিও দেহ অপেক্ষা অধিক, তথাপি মনও সীমাবদ্ধ; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব।* ইহার গতি অনন্তের দিকে, ইহার প্রসার অনন্ত। দেহ দেশ

---

* ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র জীব হইতে মানব পর্য্যন্ত বুদ্ধি সর্ব্বঘটেই আছে। কাহারও বুদ্ধি নাই, এরূপ বলা যায় না। জীবমাত্রেই, কি উদ্ভিদ, কি জন্তু, সকলেরই অল্পাধিক বুদ্ধি আছে। জীবাণুগণ (microbes) অতীব ক্ষুদ্র; উহাদিগের লক্ষ লক্ষ একত্রে একটী সূচের ছিদ্র দিয়া

কাল অতিক্রম করিতে অক্ষম; মন দেশকালের দ্বারা আবদ্ধ নহে। কিন্তু এখনই বুদ্ধি যাহা প্রতিপন্ন করিতেছে, মন তাহা ধারণাই করিতে সক্ষম হয় না। ক্রমে বুদ্ধির প্রসার এত বৃদ্ধি হইবে যে, মন সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া যাইবে। কথাটা অন্যরূপে দেখা যাউক।

জীবদেহ বহুল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান মানবাকারে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতি শীত, গ্রীষ্ম, আদ্রতা, শুষ্কতা, আহারের অসদ্ভাব ও অযোগ্যতা—এই সকল বিবিধ উপায়ে ঐ* পরিবর্ত্তন সিদ্ধি করিয়াছে। জীব এই সকলের সহিত প্রাচীনকাল হইতে নিয়ত সংগ্রাম করতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছে। যাহারা এই সংগ্রামে জয়ী হইয়াছে তাহারাই বাঁচিয়াছে, অন্যেরা বিলুপ্ত হইয়াছে। এই জীবন সংগ্রাম কি ? ইহারই ফলে বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করে নাই ত ? আমার মনে হয়,এই জীবন-সংগ্রামই ক্রমশঃ দেহ ও মনের উপর বুদ্ধির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টার নামই জীবন-সংগ্রাম। ধরাপৃষ্ঠে শীত গ্রীষ্মাদির আধিক্যহেতু, অথবা জীবনধারণোপযোগী আহারের অপ্রাচুর্য্য বশতঃ কিম্বা অন্যরূপে জীব যখন ক্লিষ্ট ও পীড়িত হয়, তখন আত্মরক্ষার চেষ্টা স্বভাবতঃই

গতায়াত করিতে পারে। ইহাদিগেরও বুদ্ধি থাকা প্রমাণিত হইয়াছে। "Microbes do not nourish themselves indiscriminately, nor do they feed blindly upon every substance that chances in their way. They exercise a choice ; and as Dr. G. J. Romanes, F. R. S. has observed the power of choice may be regarded as the criterion of psychical faculties. * * * Microbes are capable of discrimating between their own kind and other mircrobes, for they generally live in colonies."

Griffiths Micro Organism, p 120

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্য যেখানেই আছে, ক্ষুদ্র দেহই হউক আর বৃহৎ দেহই হউক, সেইখানেই বুদ্ধিও আছে। বুদ্ধি চৈতন্যের লক্ষণ। জগৎ চৈতন্যময়।

Prof. J. A. Thomas বলিয়াছেন, "The modern conception of matter tends to make the whole world alive."

সুতরাং বুদ্ধিও ব্রহ্মাণ্ডময় সর্ব্বত্র বিরাজমান, তবে ঘটে ঘটে বিভিন্নরূপ প্রকাশ এইমাত্র।

* The struggle for existence takes place not between different species, but between individuals of the same species.

Nature and Man, p 14.

আসিয়া উপস্থিত হয়। সে চেষ্টা সফল হইলেই জীবদেহ বাঁচিয়া যায়; নচেৎ বিলুপ্ত হয়। জীবন-সংগ্রামে একদিকে আত্মপ্রতিষ্ঠা, যাহার ফল বংশবিস্তৃতি; অন্যদিকে বিনাশ। ইহা ব্যতীত তৃতীয় পন্থা নাই। আহার্য্যের অপ্রাচুর্য্য ইত্যাদি বশতঃ যখন সমশ্রেণীস্থ * জীবগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা উপস্থিত হয়, তখন যে জয়ী হয়, তাহারই বংশ রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়; যে পরাজিত হয়, সে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। পরাজিতের নাশই এই কঠোর সংগ্রামের শেষ ফল।* এই সংগ্রামে জয়ী হইতে কেবল দৈহিক বলের আধিক্য থাকিলেই প্রচুর হয় না। অনেক সময় দুর্ব্বলতাও জয়ী হইবার সহায়তা করে; এবং সময়বিশেষে সবলতাই পরাজয়ের কারণ হয়। এ সংগ্রামে জয়লাভের নিয়ত চেষ্টায় বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রতিকূল অবস্থায় আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেই বুদ্ধির উৎকর্ষতা। একবংশে যে উৎকর্ষতা উৎপন্ন হইল, পরবংশে তাহা আরও মার্জ্জিত ও উন্নত হয়। এইরূপে জীবনসংগ্রামের ফলে পর পর বংশীয়গণের বুদ্ধি উত্তরোত্তর উন্নত হইতে থাকে। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই সংগ্রামে যাহারা জয়ী হয়, তাহারা কেবল যে বাঁচিয়া যায়, তাহা নহে, ক্রমশঃ বুদ্ধিবৃত্তিতেও উন্নত হইয়া উঠে।

আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, জীবদেহ জন্তুযুগের মধ্যাবস্থায় অথবা শেষভাগে (Lower miocene age) অতীব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল; তদবধি এপর্য্যন্ত দেহ ক্রমেই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। † কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমেই উৎকর্ষতা লাভ করিতেছে। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, মানবের বুদ্ধি দেহের ক্ষমতাকে অবশ্যই অতিক্রম করিবে। দেহ, অন্ততঃ স্থূলদেহ, বুদ্ধির কার্য্যসাধনে ক্রমেই অপটু হইবে। বুদ্ধিবলে আকাশমার্গে উড্ডীন হইবার যন্ত্র উদ্ভাবন করিলাম; কিন্তু কিয়দ্দূর উঠিতেই দেহ অবসন্ন হইয়া গেল; আর উঠা হইল না। জীব কি তখনই সে চেষ্টা হইতে বিরত হইবে? বোধ হয় না। ধ্বংসশীল দেহ যতই উন্নতজীবের কার্য্যসাধনে অপটু হইবে, ততই

---

* * * In nature's struggle for existence, death, immediate obliterations, is the fate of the vanquished ; whilst the only reward to the victors * * * is the permission to reproduce their kind, to carry on by heredity to another generation the specific qualities by which they triumphed.

Nature and Man, p 15.

† "মানব দেহের প্রকৃতি" দেখ।

উহা পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি হইবে। দেহ এত অকিঞ্চিৎকর ও সীমাবদ্ধ যে, উহা মন ও বুদ্ধির নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত। মন যাহা সঙ্কল্প করে বুদ্ধি তাহা সিদ্ধি করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু দেহ কত পশ্চাতে পড়িয়া থাকে! মন মঙ্গলগ্রহে যাইয়া কত তথ্য আবিষ্কার করিতে লালায়িত; কিন্তু দেহ তাহার কার্য্যসাধনে অক্ষম। এ দেহ পরিত্যক্ত হউক, তখন মনের এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আবার বুদ্ধি যাহা প্রতিপন্ন করিতেছে, মন তাহা ধারণা করিতেই সমর্থ হয় না। বুদ্ধিবলে প্রমাণ করিলাম যে, কোন বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত দুইটী রেখা ক্রমশঃ পরস্পরের নিকটস্থ হইবে, কিন্তু অনন্তকালেও মিলিত হইবে না। এ তত্ত্ব গণিতজ্ঞের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু তিনি ইহা কখনই ধারণা করিতে সক্ষম হইবেন না। এই যে "অনন্ত" কথাটা ব্যবহার করিলাম, মন ইহাকে কি ধারণা করিতে সমর্থ হয়? কখনই না। এইরূপে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মন বুদ্ধির বহুপশ্চাতে পড়িয়া থাকে, সুতরাং কালে মনকে বুদ্ধি এতদূর পরাস্ত করিবে যে, মন থাকা না থাকা সমান হইতে পারে। এইরূপে দেহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ মনের এবং মন বুদ্ধির নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলে, মানব উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।* জীবাত্মা অন্নময় কোষকে (দেহকে) স্বকার্য্যসাধনে অক্ষম জানিয়া তথা হইতে প্রাণময় ও তথা হইতে মনোময় কোষে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। পরে ইহাদিগকেও অকিঞ্চিৎকর এবং অসমর্থ জানিয়া জ্ঞানময় কোষে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। বিশেষ অবিশেষের প্রভেদ বুঝাই জ্ঞানের কার্য্য। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ স্ফুরণ প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানময়কোষের পূর্ণ সফলতা। সাধারণতঃ এই জ্ঞানের সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু যখন বিশেষ-অবিশেষ জ্ঞান একমাত্র মূলীভূত তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হইবে, তখনই

---

* ইন্দ্রিয় পশিলে মনে, বুদ্ধি মাঝে মন,
আত্মায় পশিলে বুদ্ধি; আত্মাও তেমন
প্রবেশিয়ে অব্যক্ত সু-সূক্ষ্ম কারণে
পরমাত্মরূপী যিনি; পরমাত্মা ক্রমে
বিরাটপুরুষে পশি হইলে বিলীন,
মুক্ত হবে দেহী, শান্ত স্থির গতিহীন।—উপনিষদ-গ্রন্থাবলী।
কঠ। ১ অধ্যায়, ৩ বল্লী।

জীবের অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি, তখনই আত্মা আনন্দময় কোষে নির্বিষয় ও ও নিরুপাধি হইয়া বিরাজ করিবেন।* পৃথিবীতে মানবের আগমন এই জন্যই। যিনি আসিলেন, তিনিই নানারূপে ভ্রমণকরতঃ আবার স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপনার লীলা পূর্ণ করিলেন। এ লীলার ইহাই উদ্দেশ্য, ইহাই সফলতা।

---

* উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী।

অনন্ত জীবন।

অতি প্রাথমিক জীবগণের (Protozoa) দেহ এক একটী জীবকোষে গঠিত হইয়াছে। ঐ জীব-কোষ জীব-বস্তুতে (Protoplasm) পূর্ণ থাকে। কোষের ভিন্ন ভিন্ন অংশস্থিত জীব-বস্তু প্রায় একই প্রকার, কারণ উহার জীবনব্যাপার জটিল নহে। তবে কোন কোন স্থানের জীব-বস্তু অপর স্থানের জীববস্তু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পৃথক্‌ ভাবাপন্ন। এইরূপ একটী কোষের দ্বারা যে জীব-দেহ গঠিত, তাহাকে এককৌষিক * জীব বলে। আর এইরূপ একাধিক জীবকোষে যে জীবদেহ গঠিত হয়, তাহাকে বহু-কৌষিক † জীব কহে। বহু কৌষিক জীবগণের দেহের প্রত্যেক কোষ এক কৌষিক জীবের অনুরূপ। কিন্তু উহাদিগের দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কোষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। কারণ উহাদিগের জীবনব্যাপার জটিল এবং দেহের পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রদেশ পৃথক্‌ পৃথক্‌ কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। ‡ এক-কৌষিক জীব বহু-কৌষিক জীবে উন্নত হইতে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অতি নিম্নশ্রেণীস্থ এক-কৌষিক জীব হইতে ক্রমে বহু-কৌষিক 'মানবদেহ পর্য্যন্ত গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও কোষস্থ জীব-বস্তুর এক ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র সূক্ষ্মাদপি-অংশ যেন নির্লিপ্ত ভাবে বসিয়া থাকে; সে কোন পরিবর্ত্তনেই যোগ দেয় না।

---

* Unicellular,

† Multi-cellular.

‡ Amoeba and Verticella are unicellular, each being made of one cell or morphological unit. These animals therefore possess diverse parts in virtue of the specialization, or differentiation, of the protoplasm of single cells. Hydra on the other hand, is multicellular, being made up of very numerous cells, each of which is morphologically equivalent to an Amoeba. These cells are modified in various ways, just as part of a single cell may be modified, for the performance of diverse function.—Davis Text Book of Biology, pp 139-40.

সেই অংশ একাবস্থই থাকিয়া যায়। এই কোষ অথবা কোষাংশই বংশরক্ষক কোষ(Reproductive cell) ।* পরিবর্ত্তন সময়ে মূলকোষ ইহাকে পৃথকরূপে একদিকে সরাইয়া রাখিয়া দেয়। বহু-কৌষিক জীবগণের দেহস্থ প্রত্যেক জীব-কোষ হইতে জীব-বস্তুর সূক্ষ্মাংশ ক্ষরিত হইয়া † একস্থানে সঞ্চিত ও বংশরক্ষক কোষে পরিণত হয়। তৎপর পুং-দেহস্থ কোষই যথাকালে স্ত্রী দেহস্থ কোষের সহিত মিলিত হইয়া অপত্যরূপে বর্দ্ধিত হয়। উভয় বংশরক্ষক কোষই নির্লিপ্ত ও অপরিবর্ত্তিত। জীব-দেহ, কালে কতই পরিবর্ত্তিত হইল, কিন্তু বংশরক্ষক কোষ এক ভাবেই (Unicellular) রহিয়া গেল। বহুদেহ বহুভাবে উৎপন্ন হইল, ও চলিয়া গেল, কিন্তু বংশরক্ষক কোষকে যুগযুগান্তর হইতে মূলতঃ এক ভাবেই রাখিয়া গেল। এই জন্যই দেহকে অকিঞ্চিৎকর ও পরিবর্ত্তনশীল বলে, আর বংশরক্ষক-কোষের বাহনমাত্র বিবেচনা করা যায়। ‡ এই বংশরক্ষক-কোষ পিতৃদেহ হইতে সিঞ্চিত হইয়া পুত্ররূপে এবং পুত্রদেহ হইতে পৌত্ররূপে, এইরূপ বংশানুক্রমে জীব-প্রবাহ স্থির রাখিতেছে। এক দেহ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে একাংশ দ্বারা অপর দেহ গঠিত করিয়া যাইতেছে। এ ধারা অনন্ত।

---

* At an early stage * * * reproductive cells are set apart. These remain simple and undifferentiated, preserving the structural and functional traditions of the original germ-cell. These cells and the results of their division are but little implicated in the differentiation which makes the multi-cellular organism what it is. Geddess and Thomson, The Evolution of Sex, pp. 261-2.

এই গ্রন্থকার অন্যত্র বলিয়াছেন, amidst all these differentiations they bear a charmed life.

† সর্ব্ব অঙ্গ হ'তে হইছে সঞ্চিত
রেতোরূপে আত্মা দেহে।
—উপনিষদ-গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ ; ১২৭ পৃঃ।

‡ "The bodies of the higher animals which die may from this point of view be regarded as something temporary and non-essential, destined merely to carry for a time and nourish the * * unicellular eggs"—[the egg cells and spremcells.] Ray Lankester.

এক্ষণে প্রাথমিক জীব হইতে বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথমজ (Protozoa) শ্রেণীস্থ জীবগণের দেহস্থ কোষ বিভক্ত হইয়া নূতন জীব-দেহ গঠিত করে। একটী কোষ দ্বিধা বিভক্ত হইল; ঐ বিভক্ত অংশ-দ্বয়ের প্রত্যেকটী আবার বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইল। উহার প্রত্যেকটী আবার বিভক্ত হইল এবং ঐ প্রত্যেক বিভক্তাংশ পুনরায় পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইল।* সুতরাং কোনটীই মরিল না। উহার দেহ যথাসময়ে বিভক্ত হইয়া অন্য জীব-দেহ গঠিত করিল, এইমাত্র। উহা কেবল বংশরক্ষক কোষ; উহার প্রত্যেক অংশই বংশ রক্ষা করে। ঐ কোষ বিভক্ত হইবার পর আয়তন যে পরিমাণ ক্ষুদ্র হয়, তাহা অচিরেই পূরণ হইয়া যায়। এমন স্থলে মৃত্যু কোথায়? কোন অংশই মরিল না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব জীবন ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছে। মৃত্যু তখনও জীবরাজ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই; অর্থাৎ ঐ সমস্ত প্রাথমিক জীবের স্বাভাবিক মৃত্যু নাই। তবে কেহ টিপিয়া মারিলে, কিম্বা অন্য কোন অস্বাভাবিক কারণে অবশ্যই তাহা-দিগের মৃত্যু হয়। মৃত্যু তাহাদিগের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নহে, আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। জীবনে ও মরণে তখনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় নাই। এক-কোষিক জীবগণের দেহ কেবল একটী বংশরক্ষক কোষ মাত্র। উহার প্রত্যেক অংশই বংশরক্ষা করে। তদ্ভিন্ন পৃথক দেহ নাই সুতরাং মরিবে কি? ক্রমে জীবদেহ যখন আরও উন্নত হইয়া উঠিল, তখন বংশবৃদ্ধির প্রণালী কিছু পরি-বর্ত্তিত হইল। তখন জীবকোষ আর বিভক্ত হয় না; উহার কোন অংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সেই অংশ পরিত্যক্ত হইয়া পৃথক জীবদেহে পরিণত হয়। মূল জীবকোষ যেমন তেমনই থাকে। এই সময় মৃত্যু জীবরাজ্যে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত অংশ পরিত্যাগ করতঃ নূতন জীবদেহ গঠিত করে, তাহা পুনঃপুনঃ ঐরূপ করিতে করিতে ক্রমে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া যায়। * এই অবস্থাকে মৃত্যু না বলিলেও মুমূর্ষু

---

* য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ। বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি। ইত্যাদি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ"—৪।১।

* প্রাথমিক জীবেরও পুনঃ পুনঃ কোষবিভাগবশতঃ শক্তিহীনতা উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কালক্রমে উহা আর বিভক্ত হয় না। তখন পুংকোষ ও স্ত্রীকোষ বিভাগ হয় নাই। তথাপি সমশ্রেণীস্থ দুইটী কোষই সংযুক্ত হইয়া পরস্পরের শক্তি বৃদ্ধি করে। তৎপর কোষ বিভাগ কার্য্য আবার চলিতে থাকে। এই সংযোগই পরবর্ত্তী কালের স্ত্রীসংসর্গের পূর্ব্বভাগ।

অবস্থা বলা যাইতে পারে। ঐ জীবন-মৃত অবস্থাতেই ইহারা দীর্ঘকাল থাকিতে পারে। অবশেষে উচ্চশ্রেণীস্থ প্রাণীগণের উপর মৃত্যু একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। ইহাদিগের দেহস্থ ক্ষুদ্র কোষ পরিত্যক্ত হইয়া * অপর জাতীয় † কোষের সহিত মিশ্রিত হইয়া অপত্যরূপে পরিণত হয়। কিন্তু বংশরক্ষণ কার্য্যে এতাদৃশ বলক্ষয় হয় যে, সেই সুযোগ পাইয়া মৃত্যু আসিয়া প্রবেশ লাভ করে। ইহাদিগের দেহ পৃথক, বংশরক্ষক-কোষ পৃথক। সুতরাং দেহ মরে; মৃত্যু দেহকেই আশ্রয় করে। বংশরক্ষক-কোষ অমর। জীবরাজ্যে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে অর্থাৎ কীট-পতঙ্গ শ্রেণীতে বংশরক্ষণ কার্য্যে এত অধিক শক্তি ব্যয়িত হয় যে, উহারা অনেকেই ঐ কার্য্য অন্তেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বংশরক্ষা করিয়া উহারা আর জীবিত থাকিতে পারে না। উহাদিগের পুং জাতীয়গণের এই অবস্থা বিশেষ বিবেচ্য। আর স্ত্রীজাতীয়গণের অবস্থা বিবেচনা করিতে কর্কট শ্রেণীর কথা সহজেই মনে উদয় হয়। কর্কটী স্বীয় দেহের রসাদি দ্বারা অপত্য পোষণ করিতে নিজে এতই শক্তিহীনা হইয়া যায় যে, আর জীবিত থাকিতে পারে না। বংশবৃদ্ধি কার্য্যে পিতার ও অপত্য পোষণকার্য্যে মাতার অত্যন্ত শক্তিহীনতা উপস্থিত হয়। মৃত্যুও সেই অবসরে জীবরাজ্যে সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন করে। নতুবা পারিত কিনা সন্দেহ। যতদিন ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কোষ বহুবিভক্ত হইয়া জীবরাজ্যে বংশবৃদ্ধি করিত, ততদিন মৃত্যু (স্বাভাবিক মৃত্যু) প্রবেশ করিতে পারে নাই। শেষে জীবগণ এক-কোষিক অবস্থা হইতে ক্রমে উন্নত হইয়া বহু-কোষিক হইলে এবং উহাদিগের আবশ্যকীয় ক্রিয়াসকল দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশগত হইলে দেহের শক্তি সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই। একের শ্রমাধিক্যের ক্লান্তি অন্য কোষকে আক্রমণ করিয়াছে; একের শক্তিহীনতা অন্যকে অভিভূত করিয়াছে। তাহাতেই কালক্রমে বার্দ্ধক্য, জরা ও মৃত্যু জীবরাজ্যের সহচর হইয়া উঠিয়াছে। বহু-কোষিক জীবের দেহ মরে কিন্তু এক-কোষিক জীবের পৃথক দেহ না থাকায় উহার মৃত্যু নাই। ‡ যাহা হউক, বহু-কোষক জীবের দেহকেও মৃত্যু সম্পূর্ণ-

* পুং-কোষ।

† স্ত্রী-কোষ।

‡ If death do not naturally occur in the Protozoa, it is evident that it cannot be an inherent characteristic of living matter. Yet it is universal among the multicellular animals. Death, we may thus say, is the

রূপে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। যে দেহকে মারিল, তাহাকে সম্পূর্ণ মারিতে পারিল কৈ? সে মরিবার পূর্ব্বেই একাংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অপত্য-রূপে রাখিয়া গেল। সুতরাং জীবপ্রবাহ এবং দেহপ্রবাহ অক্ষুণ্ণই রহিয়া গেল। মৃত্যু বাস্তবিক জীবদেহকে কিছুই করিতে পারিল না। আর আত্মা? সে ত পিতৃরূপে গিয়া পুত্ররূপে আগত হইল মাত্র। কেবল এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্যদেহ অবলম্বন করিল মাত্র। সুতরাং এ প্রবাহ অনন্ত। মৃত্যুর এস্থলে কোনই আধিপত্য নাই।

আমরা দেখিয়াছি যে, জীবদেহের এককোষিক (Unicellular) অবস্থায় মৃত্যু জীবরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। পরে, জীবদেহ বহুকোষিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বিভিন্ন কোষসমূহের শক্তিসামঞ্জস্য রক্ষা হইল না। তখন বংশ-রক্ষণ কার্য্যেও অত্যন্ত অধিক শক্তি ব্যয়িত হইতে আরম্ভ হইল। এই অবসরে মৃত্যু জীব রাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিল।

কিন্তু জীব-কোষের স্বভাব অবগত না হইলে মৃত্যুর স্বরূপ বুঝা যাইবে না। জীবকোষ যে জীব-বস্তুতে (protoplasm) পূর্ণ থাকে, উহা অতীব ক্ষণস্থায়ী, অম্লযান, উদযান, অঙ্গার, যবক্ষারযান প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। এই সকল উপাদানের রাসায়নিক সংযোগে জীব-বস্তুর উৎপত্তি। কিন্তু ঐ সংযোগ সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট হইতেছে।*

জীব-বস্তু (Protoplasm) এইরূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া তদীয় উপাদান পদার্থে পরিণত হয়। পরে, জীবকোষ বাহ্য জগৎ হইতে যে সকল আহার্য্য বস্তু নিজ অভ্যন্তরে গ্রহণ করে, তাহাই উক্ত বিশ্লিষ্ট বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় জীব-বস্তু গঠন করে। স্বভাব শক্তিতেই জীব-বস্তু বিশ্লিষ্ট হইয়াছিল, আহার্য্য

---

price paid for a body. * * * By a body is meant a complex colony of cells, in which there is more or less division of labour, where the component units are no longer, like the protozoa, in possession of all their faculties; but through division of labour have only restricted function and limited powers of self-recuperation.—Geddes and Thomson, The evolution of Sex, p. 260.

* Living matter is extremely unstable and this is no doubt largely due to the nitrogen invariably present in considerable quantities,

Davis Text book of Biology.

দ্বারা তাহা পুনর্গঠিত হইল। যদ্যপি এইরূপে পুনর্গঠিত না হইত, তাহা হইলে জীব-বস্তু আর জৈবভাবে থাকিতে পারিত না। জীবোৎপত্তিও অসম্ভব হইত।

এক্ষণে স্মরণ করিতে হইবে যে, এককোষিক জীবের কোষও যে প্রকার, বহুকোষিক জীবের দেহস্থ প্রত্যেক কোষও প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকারই। কিন্তু উভয়ের কার্য্যপ্রণালীর প্রার্থক্য এই যে, এক-কোষিক জীবদেহের একটী কোষ ঐ জীবের আবশ্যকীয় সকল কার্য্যই নিষ্পন্ন করে; আর বহুকোষিক জীবগণের কোষ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়া ক্রমে যে সকল শারীর যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করে, তাহারা সকলে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করে না; উহাদিগের মধ্যে কার্য্য বিভাগ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নিষ্পন্ন করে। ইহার ফলে ঐ সকল ভিন্ন যন্ত্রের এবং কোষের শক্তি সমভাবে ব্যয়িত ও পুষ্ট হয় না। অর্থাৎ বহুকোষিক জীবের কোষসমূহে শক্তি-সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। এক যন্ত্রের ক্লান্তি বা বিকৃতি বশতঃ সমষ্টি ক্রিয়ার বা জীবন-ব্যাপারের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। কারণ, বিভিন্ন কোষের ব্যষ্টি-শক্তি সমবেত হইয়া এক সমষ্টি-শক্তিতে পরিণত হয়; সুতরাং ব্যষ্টি-শক্তির কোন অংশের বিকৃতিতে সমষ্টি কখনই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। এইরূপে উহাদিগের দেহে পীড়ার আবির্ভাব হয়, এবং তাহাতে সমষ্টি-শক্তির অর্থাৎ জীবন-ব্যাপারের বিঘ্ন হইতে থাকে; তখন জীব-বস্তু যে পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হয়, আর সেই পরিমাণে গঠিত হইতে পারে না। এই হেতু মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। যতদিন বিশ্লেষণ-শক্তি গঠন শক্তির অপেক্ষা ন্যূন থাকে, ততদিন দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি; যখন ঐ দুইশক্তি সমভাবে থাকে, তখন দেহের সাম্যাবস্থা; কিন্তু যে সময় বিশ্লেষণ-শক্তি গঠন-শক্তি অপেক্ষা প্রবল হয়, তখনই মৃত্যু আসিয়া দেখা দেয়।

এককোষিক দেহ, কোষের বিভাগ দ্বারাই বহুকোষিকে পরিণত হয়। আবার, কোসস্থ জীব-বস্তু বিভাগ ও পুনর্গঠন দ্বারাই জীবন-ব্যাপার সম্পন্ন করে। এই বিভাগি-কার্য্য পুনঃ পুনঃ সাধিত হওয়ায় যে ক্লান্তি উপস্থিত হয়, তাহা আর কালক্রমে (বহুকোষিক জীবদেহে) আহার গ্রহণ দ্বারা সম্যক পূরণ হয় না। জীব-দেহে মৃত্যু আসিবার ইহা প্রধান কারণ।

কিন্তু পুনর্গঠন কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইবার আরও অনেক কারণ আছে; যেমন, বাহ্য জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু সকল (microbe)। ইহারা নানারূপে অপর জীব দেহের গঠনকার্য্যের বিঘ্ন এবং বিশ্লেষণ কার্য্য সাধন করে।

তজ্জন্য অসংখ্য পীড়া জীবদেহে সমুদ্ভূত হয়। ইহাদিগের কার্য্যপ্রণালী চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্গত, সুতরাং এস্থলে বিবেচ্য নহে। ফলতঃ জীব-বস্তু স্বভাববশে বিশ্লিষ্ট হইলে উহার পুনর্গঠন কার্য্যে যে কোন হেতুতেই বিঘ্ন উপস্থিত হউক, তাহাতেই মৃত্যুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সন্দেহ নাই। এই সকল হেতুমধ্যে একটী জীবতত্ত্বের বিশেষরূপে আলোচ্য। তাহা কতকটা এইরূপ:—বহু-কৌষিক জীবগণের শারীর যন্ত্রসকল যখন বিভিন্নরূপে গঠিত হইল এবং উহাদিগের কার্য্যও বিভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল, তখন উহাদিগের সকলের আয়তন এবং ক্রিয়া সম-অনুপাতে হইল না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই অবস্থায় উহাদিগের শক্তিসামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এই বলিলেই নির্দ্দোষ হইত যে, বহু-কৌষিক জীবগণের দেহস্থ যন্ত্রাদি সম-অনুপাতে বর্দ্ধিত হয় না এবং উহাদিগের ক্রিয়াও সম-অনুপাতে নিষ্পন্ন হয় না। যদিও ইহাদিগের শারীর যন্ত্র সকলের পৃথক পৃথক শক্তিতেই সমষ্টি-জীবনী-শক্তি কার্য্য পর্য্যালোচনা করে, তথাপি ঐ সকল বিভিন্ন যন্ত্রের আয়তন ও কার্য্যের মধ্যে অল্লাধিক অসমতা শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাতে কোন কোন যন্ত্র সমষ্টি-জীবনের অধিক প্রয়োজনীয় আর কোন কোন যন্ত্র অল্প প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। এই ভাবে কালক্রমে কোন কোন যন্ত্র জীবন-ব্যাপারের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং অন্যান্য যন্ত্র একরূপ অনাবশ্যকীয় হয়। শেষোক্ত-গুলি যদিও জীবন-কার্য্যের সাহায্য করে, তথাপি উহারা অনেক সময় স্বয়ং বিকৃত হইয়া সমষ্টি-শক্তিকে (জীবনকে) উৎপীড়িত করিয়া তুলে। ইহারা মিত্ররূপী শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এইরূপ হইবার প্রধান কারণই হইতেছে, শারীর-যন্ত্র সকলের অসম-অনুপাতে বৃদ্ধি এবং অসম-অনুপাতে ক্রিয়া-বিকাশ। এস্থলে একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তস্রোত নির্গত হইয়া শিরা ও ধমনীর মধ্য দিয়া গতায়াত করে। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে, হৃৎপিণ্ডের আয়তন ও শিরা ধমনীর আয়তনের তারতম্য অনুসারে রক্তের পরিমাণের ও বেগের ন্যূনাধিক্য হইবে। শৈশবে যে আয়তনের হৃৎপিণ্ড হইতে যে আয়তনের শিরা ধমনীর মধ্য দিয়া রক্ত সঞ্চালিত হয়, যৌবনের শেষ ভাগে হৃৎপিণ্ড, শিরা ধমনীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক বর্দ্ধিত হওয়ায় এবং শিরা ধমনীর প্রণালী সেই অনুপাতে বর্দ্ধিত না হওয়ায়, পূর্ব্বের ন্যায় রক্ত-সঞ্চালন হইতে পারে না। রক্তের পরিমাণ ও বেগ উভয়ই অল্লাধিক পরিবর্ত্তিত হয়; অর্থাৎ এতদুভয়ই মন্দীভূত হয়। তজ্জন্য এই সময় হইতে দেহের

বৃদ্ধি হ্রস্তিত হয় এবং জরা ও অবশেষে মৃত্যু প্রবেশ লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। *

বস্তুতঃ নানা কারণে বহুকোষিক জীবদেহে কোষসকলের মধ্যে শক্তি-সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই; উহাদিগের ক্রিয়ারও সম-অনুপাত রক্ষা হয় নাই। একের দুর্ব্বলতা ও ক্ষুদ্রতা অন্যকে আক্রমণ করিয়াছে। সুতরাং জীব-বস্তুর স্বাভাবিক বিশ্লেষণ-ক্রিয়ার পর গঠনকার্য্য পূর্ব্ববৎ সম্পাদিত হইতেছে না। ইহার ফলে মৃত্যু অনিবার্য্য। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, এককোষিক জীবের বংশ-রক্ষক কোষ ভিন্ন স্বতন্ত্র দেহ নাই; সুতরাং মৃত্যুও নাই। আর বহুকোষিক জীবগণের পৃথক দেহ থাকায় মৃত্যু তাহাকেই আশ্রয় করিয়াছে। দেহ মরে, যদিও মরিবার পূর্ব্বে অংশবিশেষকে পৃথকভাবে রাখিয়া গিয়া দেহ স্বীয় অমরত্ব রক্ষা করে; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দেহের তিরোভাব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, আর উহা দেহজ-কারণসম্ভূত; অর্থাৎ দেহরক্ষক কোষের স্বভাবধর্ম্মবশতঃ। সুতরাং যতদিন দেহ আছে ততদিন মৃত্যুও অনিবার্য্য।

এস্থলে আর একটী কথাও স্মরণ করা যাইতে পারে। দেহকোষ সকল বাল্যে যাহা থাকে, যৌবনে ঠিক তাহা থাকে না; আবার যৌবনে যাহা থাকে, বার্দ্ধক্যে তাহা থাকে না। দেহকোষ সকল নিয়ত পরিত্যক্ত হইতেছে, এবং নূতন কোষ পুরাতনের স্থান অধিকার করিতেছে। এই কার্য্যও দেহ-কোষের বিভাগ দ্বারাই সম্পন্ন হয়। যে সকল কারণে দেহকোষ সকলের শক্তি-সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না, তদ্রূপ কারণেই কোষ বিভাগের ক্ষমতাও হ্রাস হইতে থাকে। তাহাতে কোষ বিভাগের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। তৎপর হইতেই পুরাতন কোষের পরিবর্ত্তে নূতন কোষ উৎপন্ন হওয়া এবং তাহার স্থান অধিকার করা স্থগিত অথবা বিরল হইয়া উঠে। তাহাতেই দৈহিক ক্রিয়াও বিকৃত হইতে থাকে। সুতরাং পীড়া ও অবশেষে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু মৃত্যু দেহরক্ষক কোষকেই আশ্রয় করে, বংশরক্ষক কোষকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না।

অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলে দেহকে (অন্ততঃ স্থূল দেহকে) চিরস্থায়ী বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। ইহার নাশ যেন সুদূর ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং মৃত্যুরও নাশ অবশ্যই হইবে।

---

* ১৯০৩ সালের নেচার (Nature) নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন।

জীবদেহের এক কৌষিক অবস্থায় মৃত্যু ছিলনা, বহুকৌষিক অবস্থায় মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আবার দেহের নাশ সহ মৃত্যুও পলায়ন করিবে।

কথাটা অন্যভাবে দেখা যাউক। জীবন ব্যাপার, দেহরক্ষক কোষের ও বংশরক্ষক কোষের ক্রিয়াসকলের সমষ্টি ফল। যদি ক খ রেখা সমষ্টি জীবন

গ

হয়, তবে ক গ দেহরক্ষক ক্রিয়া ক ———————— খ এবং গ খ বংশরক্ষক ক্রিয়া। কগ + গখ = কখ। সুতরাং ইহা অনায়াসেই বুঝা যায় যে, ক গ যত বড় হইবে, গ খ তত ছোট হইবে; আর ক গ যত ছোট হইবে, গ খ তত বড় হইবে। অর্থাৎ কগ—এর সহিত গ খ—এর বিপরীত অনুপাত। একের হ্রাসেই অপরের বৃদ্ধি এবং একের বৃদ্ধিতে অপরের হ্রাস।* তবেই ক গ (দেহ) অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে গ খ (বংশ) নিতান্ত ক্ষুদ্র হইবে এবং খ গ (বংশ) অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে গ ক (দেহ) অতীব ক্ষুদ্র হইবে। সুতরাং বৃহদাকার জীবের বংশ বৃদ্ধি কম; আর ক্ষুদ্রাবয়ব জীবের বংশবৃদ্ধি অধিক। দেহ ও বংশের বিপরীত অনুপাত। এক্ষণে সমস্ত জীবরাজ্যের কথা বিবেচনা করুন। এস্থলে ক গ অনন্ত, সুতরাং গ খ নাই। অর্থাৎ যখন দেহ ও দৈহিক-ক্রিয়া বিশ্বব্যাপ্ত, তখন বংশরক্ষণ নাই; জন্ম, জরা মৃত্যুও নাই। তখন জীবে ও ব্রহ্মে অপ্রভেদ। পক্ষান্তরে, যখন বংশরক্ষণ ক্রিয়া অনন্ত, তখন দেহ নাই। যিনি প্রতিনিয়ত প্রসব করিতেছেন, তিনি অশরীরী, তিনি অরূপ। দেহ অনন্ত, বংশ নাই; বংশ অনন্ত, দেহ নাই। যদি মানবদেহ কালক্রমে তিরোহিত হয়, তবে মানবও অনন্তে পরিণত, অনন্তে লীন হইবে। মানব তখন মানব থাকিবে না। তখন মানব ব্রহ্মের সহিত অপ্রভেদ হইবে। এই জন্যই বলিয়াছি, একদিকে যেমন দেহ অনন্ত, অন্যদিকে তেমনই জৈবশক্তি অথবা জীবাত্মাও অনন্ত। উভয়েরই শেষ পরিণাম অনন্তে।

আমরা বলিলাম "যদি দেহ কালক্রমে তিরোহিত হয়, তবে মানবও অনন্তে লীন হইবে।" কিন্তু তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা কি? কিছুরইত নাশ সম্ভবে না। যাহা আছে তাহা থাকিবেই; তবে একরূপে না থাকিয়া অন্যরূপে থাকিবে এই মাত্র। এস্থলে তিরোহিত শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করিলাম যে দেহ স্থূলভাব পরিত্যাগ করতঃ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম এক অচিন্তনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই অনুমানের মূল কি? মূল আছে।

* If genesis vary inversely as individuation, it must be suppressed

দেহের প্রত্যেক অংশ পৃথক্‌রূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইতে পারে যে, উহারা ধ্বংসের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।* সে আলোচনা বহুবিস্তৃত হয়; সুতরাং সংক্ষেপে এস্থলে একটীমাত্র কথাই উল্লেখ করিব। কিন্তু তদগ্রে পৃথিবীর অতীত অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে। এই অবস্থাকে মোটামুটী তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—(১) অজীবাবস্থা; (২) উদ্ভিদযুগ; (৩) জন্তুযুগ। বলা বাহুল্য যে, উদ্ভিদযুগেও জন্তু ছিল এবং জন্তু-যুগেও উদ্ভিদ আছে। তবে গরিষ্ঠ লক্ষণকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ বিভাগ করা গেল। এক্ষণে, অতীত ভূ-তত্ত্ব অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে জন্তুযুগের মধ্যাবস্থায় (Miocene-যুগ) জীবদেহ একরূপ চরম উপযোগীতা লাভ করিয়া-ছিল; দেহও বৃহদায়তন প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ বৃদ্ধির পর দেহের আর অধিকতর পরিবর্দ্ধনে তৎকালীয় জীবগণের ধরাপৃষ্ঠে বাস করিবার বিশেষ কোন সুবিধা হইত, এমত বোধ হয় না।† সুতরাং এই সময় হইতে জীবদেহের বিবর্দ্ধন স্থগিত হইয়া আসিতেছে; এবং উত্তরোত্তর দেহ অবনত ও জীবের প্রয়োজন সাধনে অপটু হইতেছে। এই অবস্থার শেষ পরিণামে দেহের দশা কি হইবে, তাহা কল্পনার অবিষয় নহে। যেমন এই সময় (Miocene—যুগ) হইতে দেহের অবনতি আরম্ভ হইল, তেমনি মস্তিষ্কের উন্নতি হইতে লাগিল। এখন হইতে মস্তিষ্ক যে কেবল আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, তাহা নহে, উহার ক্রিয়াশক্তিরও উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল।‡ কিন্তু কিছুকাল

---

altogether if individuation becomes complete Geddes and Thomson—The Evolution of Sex p.298

উল্লিখিত রেখাচিত্র উক্ত গ্রন্থকারদ্বয় অন্য কার্য্যে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ও পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

* বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, হস্ত ও পদ এবং মানব দেহের পরিণতি নামক প্রবন্ধত্রয় দ্রষ্টব্য।

† "It seems that we have to imagine that the adaptation of mammalian form to the various conditions of life had in Miocene age reached a point when further alteration and elaboration of the various types, which are know then existed, could lead to no advantage."—Ray Lankester, Nature and Man, p. 19.

‡ "It is a very striking fact that it was not in the ancestor of man

এইরূপ হইবার পর মস্তিকের আয়তন আর বর্দ্ধিত হয় নাই। যখন মানব সেই প্রাথমিক অবস্থা হইতে কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিল, তখন হইতেই মস্তিকের আয়তন আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না; কেবল উহার শক্তিই ক্রমশঃ উৎকর্ষতা লাভ করিতেছে। * তবেই দেখা যাইতেছে যে, জন্তুযুগের মধ্য ভাগ হইতেই জীবদেহের পতন ও মস্তিক শক্তির উন্নতি হইয়া আসিতেছে। সুতরাং মানবের স্থূলদেহের নাশ সুদূর ভবিষ্যতের সম্ভবপর ঘটনা; যদি সেই সুসময় সত্য সত্যই আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মানব আর মানব পদ-বাচ্য থাকিবে না। যাহা হউক, এই সময়ে চিৎশক্তি † যে অতীব উন্নত ভাবাপন্ন হইবে, তাহাও প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ এই শক্তির যে উৎকর্ষতা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নিবৃত্ত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না; বরং উত্তরোত্তর মানবের জ্ঞানোন্নতির সহিত ইহারও উন্নতি অনিবার্য্য।

স্থূলদেহ, অর্থাৎ অন্নময়-কোষ তিরোহিত হইবে। তখন জীব-শক্তি (অর্থাৎ জীবাত্মা) অনেকাংশ বাধা-বিমুক্ত হইয়া ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর কোষ আশ্রয় করিবে। সেই উন্নত চিৎ-শক্তির পক্ষে স্থূলদেহ বিসদৃশ এবং অনুপ-যোগী হইবে। চিৎ-শক্তির বিকাশ অসীম, ইহার সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। সুতরাং চিৎ-শক্তি উন্নতির পথে যতই অগ্রসর হইবে, তাহার কোষও ততই সূক্ষ্ম হইয়া তাহার কার্য্য সাধনের উপযোগী হইবে। অবশেষে চিৎ-শক্তি অনন্তে লীন হইবে, তখন উহা কোষশূন্য, অরূপ, অবিষয়। তখন জীবব্রহ্মে অপ্রভেদ, তখন জীবব্রহ্ম এক। স্থূল দেহের লোপই ব্যাপ্তি; এবং তখনই জীবাত্মার বন্ধ-মুক্তি। দেহের নাশ নৈসর্গিক কারণেই হইতেছে। তথাপি

---

alone that this increase in the size of the brain took place in the same period, viz. the Miocene. * * * Other great mammals of the Tertiary period were in the same case."—Nature and Man, p. 18.

* "Man, it would seem, at a very remote period attained the extraordinary development of brain which marked him off from the rest of the animal-world, but has ever since been devoloping the powers and qualities of this organ witeout increasing its size."—Nature and Man, p. 20.

† এতদ্বারা মস্তিকের ক্রিয়া শক্তিকেই বোধ করিলাম।

মানব-প্রবন্ধে সেই দীর্ঘ সময়কে নিকটস্থ করা অসম্ভব নহে। ফল এক-ই। যে জীবাত্মা আদিতে দেহ গড়িয়া লইয়াছিল, যে অসীম স্বেচ্ছায় দেহ-বদ্ধ হইয়াছিল, দেহনাশে সে পুনরায় মুক্ত হইল। প্রথমে পৃথক্ দেহ গ্রহণ করে নাই, তখনও তাহার গতি অনন্তের দিকে; এবং পৃথক্ দেহ প্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল সীমাবদ্ধ থাকিবার পর দেহমুক্ত হইয়া আবারও গতি অনন্তে। অনন্ত-জীবনের ইহাই প্রকৃত মর্ম্ম, ইহাই প্রকৃত রহস্য।

মৃত্যুর পর পার।

মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, কোন প্রচলিত ধর্ম্মবাদের সাহায্য লওয়া আবশ্যক বোধ হয় না। ওয়ালেস প্রভৃতি প্রেততত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের গবেষণায় যে সকল ঘটনা বিশ্বস্তরূপে জানা গিয়াছে, তাহাতে ঐ সকল ঘটনা সম্বন্ধে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ওয়ালেস বলেন, "আপনা হইতেই লেখা বাহির হওয়া, লিখিবার লোক কেহই দেখা যাইতেছে না, কিন্তু আপনিই লেখা হইয়া যাইতেছে, এরূপ ঘটনা যেমন প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বেও বিজ্ঞ, সুদক্ষ পণ্ডিতগণ দৃষ্টি করতঃ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তেমনই জীবিত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেও উহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অজ্ঞানাবস্থায় সুসঙ্গত কথা বলা, দূর দেশের ঘটনা যাহা বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রতক্ষ্য-গোচর হইতেই পারে না, তাহা প্রত্যক্ষ করা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা—এ সকলই সুধীগণ পূর্ব্বকালে এবং বর্ত্তমান সময়ে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বস্তরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্যজনক বৃত্তান্ত এই যে, অনেক সময়ে ভবিষ্যৎ ঘটনাও মানব ছায়াবৎ দর্শন করিয়া অনেক সময় ভবিষ্যৎ বাণী প্রাপ্ত হইয়াছে; অনেক স্থলে ভবিষ্যৎ বিষয়ে সতর্ক হইতে আদিষ্ট হইয়াছে;—কিন্তু কোন স্থূলদেহধারী জাগ্রত অবস্থায় এ সংবাদ দেয় নাই। এ সকল স্বপ্নবৎ, ছায়াবৎ দেখিয়াছে এবং শুনিয়াছে, কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার, ঐ সকল ভবিষ্যতের ছায়া প্রকৃতই সত্যে পরিণত হইয়াছে; ঐ সকল ঘটনা পরবর্ত্তী সময়ে যথার্থই ফলিয়াছে; এ সকল চির দিনই হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে।" তাহা হইলেও প্রেততত্ত্ব এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক রূপে সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। যদিও তথাকথিত মৃত্যুর পরও আত্মার অস্তিত্ব থাকা প্রমাণ হয়; যদিও এই শাস্ত্রের অন্তর্গত বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাবলীতে মরণের পর আত্মার বিদ্যমানতা সাব্যস্ত হয়; কিন্তু তৎকালে আত্মার স্বরূপ কি প্রকার এবং আত্মা কি অবস্থাপন্ন হয়, তাহা বিশেষ জানা যায় না। হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের দ্বারা এই অভাব কতক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। এই শাস্ত্রে মরণান্তে প্রাণের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক পরিষ্কার ও নির্দ্দিষ্ট মত প্রকটিত আছে। কিন্তু এই সকল মত যুক্তিসঙ্গত প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল উল্লেখ মাত্রই

গৃহীত হইতে পারে না, এই সকল মতকে সর্ব্ব প্রযত্নে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

এমার্সন এক কথায় বলিতেন, "প্রকৃতি চিরদিন একই প্রকার," এ কথাটী বাস্তবিক একটী গম্ভীর বৈজ্ঞানিক সত্য। একই নৈসর্গিক নিয়মে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ঘটনা উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু ঐ সকল বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে এক অখণ্ড নিয়ম সর্ব্বদাই উপলব্ধি করা যায়। হিন্দু শাস্ত্রোক্ত "প্রেততত্ত্বের" অর্থাৎ মরণান্তে আত্মার অবস্থা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষা করা অসাধ্য নহে। এইরূপ পরীক্ষার দ্বারাই জানা যাইতে পারে যে, স্থূল দেহের ক্রিয়ার সহিত মরণান্ত দেহের ক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে কি না?

স্থূল দেহের ক্রিয়ার সহিত আত্মার সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে গেলে প্রথমেই এই কয়েকটী সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। (১) স্থূল দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ হইলেই অর্থাৎ চলিত কথায় যাহাকে মৃত্যু বলে, তাহা সংঘটন হইলেই তৎ সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ক্রিয়ার শেষ হয় না; অর্থাৎ তখনও শরীর মরে না। মৃত্যুর পরে কোনও সময় হইতে শারীর ক্রিয়ার অবসান হয়। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, জীবাত্মশক্তি ভিন্নও দেহের একটা পৃথক্ ক্রিয়াশক্তি আছে। ইহা নিম্নপ্রাণিগণের শরীরের উপর সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে। ভেকের মস্তিষ্ক পদার্থ কাটিয়া বাহির করিয়া লইলেই তাহার চৈতন্যের লোপ করা যায়। কিন্তু তাহার পরেও তাহাকে শরীর পোষণ জন্য আহার যোগাইলে এবং অন্য প্রকার যত্ন করিলে অনেক দিন বাঁচাইয়া রাখা যায়। এমন কি, এক বৎসর কালও বাঁচান যাইতে পারে, তাহাতে তাহার শরীর পচিবে না।

(২) দেহের এক রকম অর্দ্ধচেতনভাব আছে; বোধ হয় যেন তাহাতে দৈহিক অনিষ্ট নিবারণের জন্য দেহ আপনা হইতেই চেষ্টা করে; যেন দেহকে সজীব রাখিবার জন্য ঐ চেষ্টা আপনা হইতেই সমুদ্ভূত হয়। দেহের এই স্বাভাবিক চেষ্টা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে হয়। জীবাত্মার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। দেহতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাহাকে অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া (Reflex action) বলেন, আমি এস্থলে তাহারই কথা বলিতেছি। ইহার একটী দৃষ্টান্ত দিব। একটী ভেকের মাথা কাটিয়া ফেলা হইল। অবশ্যই এ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইবারই কথা। মাথা কাটিয়া লইলে আর ঐ ভেকের আত্মজ্ঞান থাকিল না। এখন যদি তাহার একটী পায়ে চিমটি কি খোঁচা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভেক

সেই পা খানি সরাইয়া লইবে। তাহার পর যদি কোন জ্বালাকর পদার্থ, কোন তীব্র দ্রাবক তাহার এক পায়ের কোন স্থানে ঢালিয়া দেওয়া যায়, সে অমনি আর এক পা ঠিক সেই স্থানে আনিয়া ঘর্ষণ করিতে থাকিবে; এবং ঐ পদার্থ ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিবে।

এই সকল কার্য্য যদিও বুদ্ধিপূর্ব্বক করার মত দেখা যায়; কিন্তু উহা প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিপূর্ব্বক করা নহে; কারণ বুদ্ধি মস্তিষ্কে, আর উহার তো মাথাই কাটিয়া লওয়া হইয়াছে, অথবা মস্তিষ্কই বাহির করা হইয়াছে। এই জন্যই এইরূপ ক্রিয়াকে অর্দ্ধ চৈতন্য বলিয়াছেন।

(৩) কখনও কখনও এমনও দেখা যে, এই অর্দ্ধ চৈতন্য যেন আত্মজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে, যেন আত্মজ্ঞানের উপরও প্রভুত্ব করে। একদিন মহাত্মা ডারউইন একটী কাচ-নির্ম্মিত সর্পালয়ের কাচের সহিত নিজের গাল লাগাইয়া সর্প পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে, ঐ সর্পালয়স্থ ভুজঙ্গ কাচের ভিতর পর পারে থাকায় তাঁহার কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কিন্তু ঐ সর্প যতবার তাঁহাকে দংশন করিবার উপক্রম করিল, ততবারই তাঁহাকে গাল সরাইয়া লইতে হইল। গাল না সরাইবার বিশেষ ইচ্ছা থাকাতেও সেই সময় তিনি গাল সরাইয়া লওয়া নিবারণ করিতে পারিলেন না। এ স্থলে দেহের অর্দ্ধ চৈতন্য আত্মজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ইহাকে কি অজ্ঞাত চৈতন্য বলিব? কথাটা কেমন অসম্ভব অসম্ভব লাগে; তথাপি ইহা তাহাই, আর কিছু নহে।

হিন্দু শাস্ত্রে মরণান্ত দেহের সম্বন্ধেও এইরূপ স্থূলদেহসুলভ প্রবৃত্তি সকল স্বীকার করা হইয়াছে।

ইহা প্রকৃত পক্ষেই এতদ্বিষয়ক হিন্দুমতের বিশেষ অনুকূল কথা, সন্দেহ নাই। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, স্থূল দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিচ্যুত হইলে আত্মা সূক্ষ্ম-দেহ আশ্রয় করে। উহা সূক্ষ্মতর পদার্থে নির্ম্মিত। কিছুদিন পরে এই সূক্ষ্ম দেহের সহিতও আত্মার বিচ্ছেদ হয়। অর্থাৎ যেমন স্থূল দেহের সহিত একবার বিচ্ছেদ হইয়াছিল, তেমনি সূক্ষ্ম দেহের সহিতও বিচ্ছেদ হইল। কিন্তু প্রথম মরণের সঙ্গে সঙ্গেই স্থূল-দেহ মরিয়া যায় নাই। উহার ক্রিয়া কিছুকাল চলিতেই ছিল; তেমনি দ্বিতীয় মরণ অন্তেও সূক্ষ্ম দেহ তখনই বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করে না, উহাও কিছুকাল বর্ত্তমান থাকে এবং ক্রিয়া করে। তাঁহারা ইহাও স্বীকার করেন যে, যেমন

মাথা কাটা ভেকের স্থূল দেহকে কর্ম্মক্ষম অবস্থায় কিছুদিন আহারাদি দ্বারা সজীব রাখা যায়, তেমনি সূক্ষ্ম শরীরকেও এক বিশেষ শক্তিদ্বারা কর্ম্মক্ষম রূপে সজীব রাখা যাইতে পারে। মৃত ব্যক্তির স্থূল দেহে অথবা সূক্ষ্ম দেহে যোগিগণের আত্মা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে দীর্ঘকাল সজীব রাখিবার কথা অনেক প্রাচীন গল্পে শুনা যায়। পাতঞ্জল দর্শনের ৩।৩৮ সূত্র এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

আমি স্থূল দেহের সম্বন্ধে যেমন একরূপ অর্দ্ধ চৈতন্যের কথা উল্লেখ করিলাম, যাহার ফলে অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া সিদ্ধ হয়; লেড্‌বিটার সাহেব "মৃত্যুর পর-পার" (The other side of death) নামক গ্রন্থে সূক্ষ্মশরীর অথবা কামশরীর সম্বন্ধেও ঐরূপ শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "সূক্ষ্মশরীরের উপাদান পদার্থ যেন আপনার স্বার্থ বুঝিতে পারে, এবং তদনুসারে কার্য্য করিতেও সক্ষম হয়। সূক্ষ্মশরীরের এই শারীর স্বার্থ প্রায়ই তাহার আত্মার স্বার্থের প্রতিকূল হয়। কিন্তু বাস্তবপক্ষে যে মানুষটী মরিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে ঐ সূক্ষ্ম শরীরস্থ উপাদান কিছুই জানিবার সম্ভব নাই; এবং কিছু জানিতে পারেও না। ঐ সূক্ষ্মশরীর কেবল ইহাই বুঝে যে, উহার অনুভূতি আছে এবং ঐ অনুভূতি যতই স্পষ্ট হয় ততই সে প্রীত হয়। সেই অনুভূতি কথিত মৃতব্যক্তির সন্তোষদায়ক কি ক্লেশকর হইবে, তাহাতে উহার কিছু আসে যায় না।" এই আলোচনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, হিন্দুমতে সূক্ষ্ম শরীরের যে ধারণা করা হইয়া থাকে, তাহা স্থূল শরীরের সহিত অনেকাংশে একই প্রকার। সূক্ষ্ম শরীরের প্রকৃত অস্তিত্ব থাকিলে বৈজ্ঞানিক মতেও এইরূপই অনুমান করিতে হয়। সুতরাং হিন্দু শাস্ত্রকারগণকে হয়তো নিতান্ত কল্পনাপ্রিয় বলিতে হয়, নচেৎ মৃত্যুর পরপার অথবা পরকাল সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অনেক প্রকৃত জ্ঞান ছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হয়।

এক্ষণে হিন্দু শাস্ত্রকারগণের আর একটী মত সংক্ষেপে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহারা বলেন, মৃত্যুর পরেও আত্মা রহিয়া যায়। আত্মজ্ঞান মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয় না। এই মত পরীক্ষা করিতে গেলে প্রথমেই মনে উদয় হয় যে, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ দেশ কালের অতীত এক চৈতন্যের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে দেশকালের যেন সীমা আছে; আর উল্লিখিত চৈতন্য সেই সীমার উপরে, অর্থাৎ সেই সীমাদ্বারা আবদ্ধ নহে।

দেশকাল উভয়কেই তাঁহারা আত্মার বন্ধ স্বরূপ মনে করেন, আত্মার প্রকাশের অন্তরায় বলিয়া উল্লেখ করেন। এই বন্ধ, এই অন্তরায়, তাঁহারা মায়া নামে অভিহিত করেন। এই মায়ার অন্তর্গতই নাম ও রূপ; ইহার প্রকৃত অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না। এই মতের সহিত সমঞ্জস্য রক্ষা করত তাঁহারা আরও স্বীকার করেন যে, দেশকাল-জনিত বন্ধ অথবা মায়া আত্মার ক্রমবিকাশের সহিত উত্তরোত্তর অপসৃত হয়। আত্মা যেমন উত্তরোত্তর স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর দেহ আশ্রয় করে, তেমনি দেশকালজনিত বন্ধও উত্তরোত্তর চলিয়া যায়; আত্মা তখন উত্তরোত্তর বন্ধমুক্ত হইতে থাকেন।

আকাশই ব্যাপ্তি, আকাশই বিস্তৃতি; আকাশ সর্ব্ব বস্তুর পরিমাপক। পদার্থের আয়তন বুঝিতে হইলে এই সর্ব্বপরিমাপক আকাশের দ্বারাই বুঝিতে হয়। ঐ আয়তন ত্রিধা বিস্তৃত, দৈর্ঘ, প্রস্থ, বেধ। সেই সর্ব্বাধার আকাশ মধ্যে কোন্ পদার্থ কি পরিমাণ স্থান অধিকার করে, তাহা এই ত্রিদিকের বিস্তৃতি অবগত হইলেই জানা যায়। বিস্তৃতি বলিতেই আমরা এই তিন দিকের বিস্তৃতি বুঝি। অন্য কোনরূপ বিস্তৃতি আমাদিগের স্থূল দেহনিবাসী আত্মা ধারণাই করিতে পারে না। থিওসফিষ্টগণ আত্মার উল্লিখিত বন্ধ মুক্তি বুঝাইতে গিয়া পদার্থের চতুর্থ বিস্তৃতির কথা উত্থাপন করিয়া থাকেন। এবং কখন কখন ৫ম ৬ষ্ঠ ৭ম বিস্তৃতি আদির কথাও তাঁহাদিগের মুখে শুনা যায়। এই ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ ৭ম বিস্তৃতি কি? সে বিষয় আমরা এস্থলে আলোচনা করিব না। কিন্তু এ কথা না বলিয়া নীরব থাকিতে পারি না যে, আমাদিগের স্থূল দেহ নিবাসী আত্মা প্রকৃত সীমাবদ্ধ, সে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির বাহির যাইতে অক্ষম। আমাদিগের বুদ্ধি অভ্রান্তগণিত-বিদ্যা অনুশীলন করত আকাশ সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, মন তাহা ধারণাই করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সকল সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্বন্ধে আমরা কোন ক্রমেই সন্দেহ করিতে পারি না। এস্থলে একটা দৃষ্টান্ত দিব। বৈশেষিক জ্যামিতি (১) শাস্ত্র হইতে আমরা বক্র রেখার ধর্ম্ম অথবা গুণ সকল জানিতে পারি। সে রেখা বাস্তব পক্ষে অঙ্কিত করা যায় না, তাহা আমরা কেবল কল্পনাতেই উপলব্ধি করি। ঐরূপ বক্র রেখার এমন অনেক ধর্ম্ম আমরা বুদ্ধিবলে প্রতিপন্ন করিয়াছি, যাহা প্রকৃত অঙ্কন-

(১) Analytical Geometry.

যোগ্য রেখার ধর্ম্ম হইতে অতীব বিভিন্ন। যেরূপ বক্র রেখা আমরা অঙ্কিত করিতে পারি, তাহাতে ঐ কাল্পনিক বক্ররেখার (১) ধর্ম্ম আদৌ আরোপ করাই যায় না। অথচ এই সকল ধর্ম্ম অথবা গুণ অবলম্বন করত আমরা প্রত্যক্ষসিদ্ধ এমন সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারি, যাহা অন্ত উপায়ে জানিবার কোনই পথ ছিল না। কাল্পনিক রেখার ধর্ম্ম হইতে, অচিন্তনীয় সিদ্ধান্ত হইতে, আমরা প্রত্যক্ষসিদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে?

বৈশেষিক জ্যামিতি শাস্ত্রে অঙ্কনযোগ্য সাধারণ বক্র রেখা সম্বন্ধেও আমরা এমন কোন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই, যাহা মানব মন ধারণা করিতে সক্ষম হয় না। ইহার দৃষ্টান্তস্থল বৃত্ত। কোন সমতল ক্ষেত্রে বৃত্ত অঙ্কিত করিলে উহা ঐ ক্ষেত্রস্থ অনন্ত ব্যবধান দুইটী নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর মধ্য দিয়া যাইবেই। কথাটা বুদ্ধিবলে গণিত শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপন্ন করিলাম। কিন্তু মনে ধারণা করিতে পারিলাম কি? অনন্ত ব্যবধান দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া বৃত্তটী কেমন করিয়া যাইতে পারে? এখানে কি অসীমে ও সসীমে ঠেকাঠেকি হইতেছে না? গণিত শাস্ত্রের বহু পরীক্ষিত এইরূপ বিবিধ সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ করিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, আমরা বুদ্ধিবলে অনেক সময় এরূপ সত্য আবিষ্কার করিয়া ফেলি, যাহা স্থূলদেহবাসী আত্মা কোন ক্রমেই ধারণা করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া স্থূল দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ না থাকিলেও, অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থায় পালিত হইলেও যে ঐ অক্ষমতা রহিয়াই যাইবে, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। অবস্থার প্রভেদে ধারণার প্রভেদ ত হইবারই কথা। বিভিন্ন অবস্থায় শক্তির বিভিন্ন বিকাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

---

(১) Imaginary lines.

বস্তু ও অ-বস্তু।

বুদ্ধির অসম্পূর্ণতা। নিত্য-সত্য। বস্তু তড়িৎশক্তির বিকাশ। বস্তু ঘূর্ণিত ইথার। তড়িৎ ইথারের ভাবান্তর। বস্তু প্রকৃতপক্ষে শক্তিই, সুতরাং অবস্তু। অবস্তুতে বস্তু ভ্রম কেন? উদাহরণ। বস্তু ধর্ম্ম তড়িতের নিয়মাবলী হইতে নিষ্পন্ন। বস্তু—শক্তি। উহা জ্ঞানময়, আনন্দময়, অদ্বিতীয়।

মানব এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের কতটুকু জানিতে পারে? আর যেটুকু জানিতে পারে, তাহার মধ্যে কতটুকুই বা বুঝিতে পারে? সে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপরে একটী ক্ষুদ্র জীবমাত্র, ব্রহ্মাণ্ডে কত অসংখ্য পৃথিবী, কত অসংখ্য মণ্ডল, গ্রহ, উপগ্রহ রহিয়াছে, সে তাহা জানিতেই পায় না। সে সকলের কত প্রকার-অধিবাসী আছে, সে তাহা বুঝিতেই পায় না। আছে, এই মাত্র জানে; কিন্তু তাহাদিগের সম্বন্ধে আর কিছুই বুঝে না। সে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর জীব, কিন্তু ইহারই বা কতটুকু সে জানিতে ও বুঝিতে পায়? কেবল ধরাপৃষ্ঠের কিঞ্চিন্মাত্র স্থান তাহার আয়ত্ত, কেবল গ্রহ উপগ্রহের কয়েকটী মাত্র তাহার পর্য্যবেক্ষণের অধীন। তাহাও সে ভাল করিয়া জানিতে কিম্বা বুঝিতে পারে না। কিন্তু ইহারই মধ্যে সে এটুকু ঠিক করিয়া লইয়াছে যে, জগতের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন। সে যে টুকু দেখিয়াছে, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মই লক্ষ্য করিয়াছে। তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না যে, জগতের সর্ব্বত্রই নিয়মের অধীন; অথবা একই নিয়মের অধীন। এক প্রকাণ্ড বাড়ীর ক্ষুদ্র একটী গৃহকোণে যে পিপীলিকা বিচরণ করিতেছে, সে ঐ বাড়ীর অতি অল্পাংশই দেখিতেছে। কিন্তু তাহা হইতেই সে যদি মনে করে যে, সমস্ত বাড়ীটাই ঐ গৃহকোণের ন্যায় এবং ঐ গৃহকোণ যেরূপ নিয়মাধীন, সমস্ত বাড়ীও তদ্রূপই, তাহা হইলে যেরূপ হয়, মানবও সমস্ত জগতের সম্বন্ধে কোন সাধারণ অবস্থা কি নিয়ম অনুমান করিলে, তেমনই হাস্যাস্পদ হয়, সন্দেহ নাই। জগতের এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র দেখিয়া সর্ব্বাংশের সম্বন্ধে কোনই অনুমান হইতে পারে না।

তাহার পর আর এক কথা। মানব এই ক্ষুদ্র ধরার যে অংশটুকু দেখি-

তেছে, সেটুকুই বা কতদিন হইল দেখিতেছে? কতদিন হইলই বা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে? নিশ্চয়ই, অন্তহীন কালের তুলনায়, অতি অল্প সময়। মানব নিজেই, বোধ হয়, তিন লক্ষ বৎসরের অধিক কাল জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহা জগতের ইতিহাসেতো কিছুই নহে, পৃথিবীর ইতিহাসেও অতি অল্প সময়। এই কালের মধ্যেও কত অল্পসময় হইল মানব জগতের নিয়মাবলী বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে! এই অত্যল্প কাল মাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কি কোন সাধারণ সার্ব্বকালিক নিয়ম অবধারণ করা যায়? মুহূর্ত্ত মাত্র পরমায়ু লইয়া যে মশক জন্মগ্রহণ করে, সে যদি তখন সূর্য্যদেবকে চক্রবাল রেখার নিকটবর্ত্তী এবং লোহিতবর্ণ দেখিয়া অনুমান করে যে সূর্য্য ঐ স্থানে থাকাই নিয়ম এবং সূর্য্যের বর্ণ লোহিত, তবে কি তাহা ঠিক হইবে? যে স্থান ও যে পরিমাণ কাল সে দেখিল, তাহাতে ঐরূপই সত্য বটে; কিন্তু তাহার পূর্ব্ব অথবা পরের সম্বন্ধে কোনই নিয়ম উহা হইতে অনুমিত হইতে পারে না।

এই সকল বিবেচনা করিলে ইহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, মানব এমন কিছুই বলিতে পারে না, এমন কিছুই জানিতে পারে না, যাহা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে সত্য, এমন নিয়ম মানব স্ব-চেষ্টায় কখনই জ্ঞাত হইতে পারে না। কিন্তু তাহার এতই স্পর্দ্ধা যে, সে জগদ্ব্যাপারের অলঙ্ঘ্য নিত্য-সত্য নিয়ম সকল আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া সর্ব্বদাই আস্ফালন করে। আর সেই গর্ব্ববশতঃ "এটা সম্ভব, ওটা অসম্ভব; ইহা হইতে পারে, উহা হইতে পারে না"—বলিয়া অনর্থক চীৎকার করে। সে জানে না যে, সে জগতের অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র, তিলার্দ্ধ কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যে সকল নিয়ম সত্য বলিয়া আবিষ্কার করিতেছে, যাহা কিছু সম্ভব, যাহা কিছু অসম্ভব বলিয়া স্থির করিতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা তদ্রূপ নাও হইতে পারে। (১) সে বুঝে না যে নিত্য-সত্য, দেশকালের অতীত সত্য, সে স্ব-চেষ্টায় জানিতেই পারে না। উহা তাহার সসীম জ্ঞানের অতীত।

কিন্তু দেশ কালের অতীত সত্য কি? উহা পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে পারে না। যাহা ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহা নিত্য-সত্য কখনই নহে। যাহা রূপের অধীন, তাহা আজি একরূপ, কালি

(১) Lodge—Modern views of Electricity, p p 387-388.

অন্তরূপ। যাহা ভাবের অধীন, তাহা আজি একভাব, কালি অন্ত ভাব। এ সকল কখনই চিরন্তন সত্য নহে। জগতের যে অংশ মানব দেখিতেছে কিম্বা বুঝিতেছে, তাহা সকলই ঐরূপ। সুতরাং উহা কখনই নিত্য-সত্য হইতে পারে না। তবে উহা কি?

এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় যে, উহা বস্তু-পদার্থের মূলীভূত উপাদান মাত্র। বস্তু বলিতে আমরা যাহা বুঝি,—কঠিন, তরল অথবা বায়ব্য, যে রূপই হউক,—সেই রূপেরই বস্তু পদার্থের সমষ্টি লইয়া জগৎ। বস্তু-পদার্থ রূপ-বিশিষ্ট। যাহা বস্তু, তাহার রূপ স্বীকার করা মানবের স্বভাবসিদ্ধ। ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, রূপ কল্পনা না করিয়া মানব থাকিতে পারে না। কিন্তু রূপ তো নিশ্চয়ই অনিত্য; সুতরাং রূপ নিত্য সত্য হইতে পারে না। কাজেই রূপকে উপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু বস্তু পদার্থের রূপ গেলে আর থাকে কি? থাকে কেবল শক্তি। যে শক্তির বশে রূপ নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, রূপ গেলে থাকে কেবল সেই শক্তি। এই শক্তিই বস্তু পদার্থের উপাদান এবং কারণ। সে শক্তি কি, তাহা মানব এখনও সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু যতদূর বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে সে জগদ্ব্যাপারের বহুত্বের মধ্যে একটা একত্ব অনুভব করিতেছে। অসংখ্য বস্তু যে এক শক্তিরই ভাবান্তর মাত্র, ইহা সে উপলব্ধি করিতেছে। তড়িৎ বলিতে যে শক্তি বুঝা যায়, পণ্ডিতগণ যেন সেই শক্তিকেই একমাত্র সত্তা বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন। যেন তড়িৎ-শক্তিই একমাত্র শক্তি; বস্তু-পদার্থ যেন তাহারই বিকাশ মাত্র। যাহাকে বস্তুর অণু বলা হইত, তাহা তড়িতেরই অণু; বস্তুও প্রকৃত পক্ষে তড়িৎই। (১) এই একত্ব-প্রতিপাদক মত এক্ষণে ক্রমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।

বস্তু পদার্থের মৌলিক অবস্থা অতীন্দ্রিয়। যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহা মৌলিক নহে। এ সংস্কার ধীরে ধীরে মানবকে বস্তু ছাড়াইয়া অ-বস্তুতে লইয়া যাইতেছে। মানবীয় চিন্তার পরিণামে, এক অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপ্ত সূক্ষ্মা-

---

(১) We may, on the contrary, from now on add that instead of considering electricity as matter, we are led to the exactly opposite hypothesis that the atoms of various bodies are systems of Electrons. Righi—Modern theory of Physical phenomena, p 6.

রূপি সূক্ষ্ম সত্বা অঙ্গীকার করা অনিবার্য্য হইয়াছে। উহা অব্যক্ত এবং সাম্যাবস্থ।

এই সত্বাকে পণ্ডিতগণ এক্ষণে ইথার বলিতেছেন। ইথার সর্ব্বব্যাপ্ত কিন্তু অব্যক্ত। উহার মৌলিক ভাব সাম্যাবস্থা; উহা শান্ত, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়। এই দুর্ব্বোধ্য সত্বার সাম্যাবস্থা কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে সর্ব্বত্র পরিরক্ষিত হয় নাই। মানব কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এই অনন্ত-বিস্তৃত ইথার-সমুদ্র স্থানে স্থানে চক্রবৎ গতিযুক্ত; যেন ইথার স্থানে স্থানে ঘূর্ণ-পাকের ন্যায় চক্রোৎপন্ন হইয়া কল্পনাতীত কাল হইতে ঘূর্ণিত হইতেছে। এই চক্র (১) সকলই বস্তু-পদার্থরূপে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। যখন এই সর্ব্বব্যাপ্ত ইথার সাম্যাবস্থ, তখন উহা অব্যক্ত। যে মুহূর্ত্তে যে স্থানে ঘূর্ণিত-গতি-যুক্ত, সেই মুহূর্ত্তেই সে স্থান ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইতেছে; আর তখনই উহা বস্তু পদার্থরূপে প্রতিভাত হইতেছে। (২) বস্তু পদার্থ, অব্যক্ত শান্ত ইথারেরই স্থান বিশেষের ঘূর্ণিত অবস্থা; এই মাত্র। ব্যক্তরূপ অব্যক্তেরই বিকাশ। এ সিদ্ধান্ত মানব এক্ষণে অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। বস্তু মূলতঃ অবস্তু। কিন্তু অ-বস্তু কি? উহা শক্তি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং বস্তু মূলতঃ শক্তি। মানব এ পর্য্যন্ত যত প্রকার শক্তির কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছে, তাহাদিগের সমন্বয় করতঃ এক্ষণে একমাত্রে উপনীত হইতেছে। আর, সেই একমাত্র শক্তি যে তড়িৎ শক্তি, তাহাও অঙ্গীকার না করিয়া গত্যন্তর দেখিতেছে না।

এ শক্তি বিরাট, অচিন্ত্য। ইহাকে সমষ্টিভাবে কল্পনা করা অসাধ্য। এ নিমিত্ত ইহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ চিন্তা না করিয়া উপায় নাই। মানব যখন বস্তু পদার্থের পৃথক সত্বা স্বীকার করিত, তখনও তাহার অণু সকলই কল্পনা করিয়া লইয়াছে; এক্ষণে একমাত্র তড়িত শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিতে গিয়াও তাহার ক্ষুদ্রতম অংশকেই অণুরূপে কল্পনা করিতেছে; আর ইহার নাম দিতেছে তড়িদণু (Electron)।

---

(১) Vortex motion.

(২) One universal substance * * extending to the further limits of space * * existing equally every where; some portions either at rest or in simple ir-rotational motion; * * other portions in rotational motion, in vortices. * * * One continuous substance filling all space; which in whirls constitutes matter; and which transmits every action and reaction of which matter is capable.—

Modern views of Electricity, p 416.

আমরা বলিয়াছি যে, বস্তু পদার্থ তড়িতেরই বিকাশ মাত্র; এক্ষণে বলিতেছি যে, বস্তু পদার্থ ইথারেরই ঘূর্ণিত অবস্থা। সুতরাং ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইথারের এই অবস্থাই তড়িৎশক্তিরূপে অনুভূত হইতেছে (১)। বস্তু কেবল তড়িদণুরই সমষ্টি মাত্র। কিন্তু তড়িৎ তো অ-বস্তু অর্থাৎ শক্তি। সুতরাং বস্তুও শক্তি মাত্র, আর কিছুই নহে। (২)

কিন্তু তাহাই যদি হইল, তবে শক্তি, বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয় কেমন করিয়া? শক্তিতো বস্তু নহে। যাহা অ-বস্তু, তাহা বস্তু বলিয়া ভ্রম জন্মায় কেন? ব্রহ্মাণ্ড কি ভ্রম মাত্র? বিষয়টী অন্যরূপে দেখিতে হইতেছে। একটী দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলে বুঝিবার সাহায্য হইতে পারে। একটা রাবারের চোঙ্গা অতি নরম; তাহার এক দিক বন্ধ করিয়া অপর দিক খোলা রাখিয়া, যদি খোলা দিকের মধ্য দিয়া জল-স্রোত প্রবাহিত করিতে থাকি, তাহা হইলে বন্ধদিকের মধ্য দিয়া জল বাহির হইতে পারিবে না। বাধা পাইয়াই জল-স্রোত ঘুরিবে। এদিকে খোলা দিক দিয়া আরও জল-স্রোত আসিতেছে। ক্ষণকাল এইরূপ করিলেই চোঙ্গার মধ্যে জলের ভিতর কতকগুলি ঘূর্ণপাক উৎপন্ন হইবে; এবং ঐ পাক সকল চোঙ্গার পার্শ্বে আঘাত করিবে। তখন যদি চোঙ্গার গায়ে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, তন্মধ্যে দিয়া ঘূর্ণগতিতে জল নির্গত হইতেছে। কাচের চোঙ্গা লইয়া এইরূপ পরীক্ষা করিলে জলের ঘূর্ণপাক সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। যাহা হউক, ঐ রাবারের চোঙ্গার মধ্যে ক্রমে ক্রমে জল প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু বহির্গত হইতে পারিতেছে না; ইহাতেই ঐ সকল ঘূর্ণপাক উৎপন্ন হইতেছে। তাহার ফলে ক্রমশঃ সেই নরম রাবার চোঙ্গা শক্ত ও কঠিন হইয়া উঠিতেছে। শেষে যদি ফাটিয়া না যায়, তবে উহা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিবে। ঐ চোঙ্গার মধ্যে জলের পরিবর্ত্তে কোনরূপ বায়ু অর্থাৎ গ্যাস্ প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিলেও

---

(১) An electron may be simply a special localised condition of the universal ether. Modern theory of Physical Phenomena, p 6.

Of these two electricities (positive and negative) we imagine the ether to be composed. Modern views, p 247-8.

(২) According to the modern hypothesis, matter is built up of electrons; * * Electrons are not matter, in the ordinary sense of the word, Modern theory of phyisical Phenomena, 150,

তবেই দেখিবেন, বস্তু পদার্থ অবস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে।

রাবার চোঙ্গার পূর্ব্ববৎ কাঠিন্য অনুভূত হইবে। ইহার কারণ কি? রাবারের চোঙ্গাও নরম, জলতো নরমই। কঠিন পদার্থতো কোনটাই নহে। তবে কাঠিন্য অনুভূত হয় কেন? ইহা ঐ ঘূর্ণগতিরই ফল। উপরের উদাহরণে যদি খোলা দিকের জলস্রোত বন্ধ করিয়া ঐ দিকও বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে ক্ষণকাল পরেই চোঙ্গার মধ্যস্থিত জলরাশির কিম্বা গ্যাসের ঘূর্ণগতি নিবৃত্ত হইবে; কিন্তু চোঙ্গাটী পূর্ব্ববৎ কঠিনই বোধ হইবে। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, জল রাশির ঘূর্ণ গতি নিবৃত্ত হইল বটে; কিন্তু সে গতির কি নাশ হইল? তাহা হইতে পারে না। জলরাশির যে গতি ছিল, তাহা ঐ জলের প্রত্যেক অণুকে আশ্রয় করিল; তাহাতে ঐ জলের প্রত্যেক অণুই ঘূর্ণগতি প্রাপ্ত হইল এবং সেই গতি চোঙ্গার পার্শ্বে আঘাত করতঃ চাপ উৎপন্ন করিল। তাহাতেই চোঙ্গা কঠিনবৎ প্রতীয়মান হইল। নরম তরল ও বায়ব্য বস্তু ঘূর্ণ-গতি-যুক্ত হইলেই কঠিনবৎ প্রতীয়মান হয়; ঘূর্ণগতিই কাঠিন্যের ভ্রম উৎপাদন করে। ইথার কি বস্তু, তাহা সম্যক বোধগম্য না হইলেও, তড়িৎ কি, তাহা বুঝিতে না পারিলেও, তাহার স্থান বিশেষ ঘূর্ণিত গতি-যুক্ত হইয়া ক্রমে কাঠিন্যের ভ্রম উৎপাদন করিতে পারে,—এ কথা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই প্রতীয়মান হইবে। ইথার অথবা তড়িতের (১) আণবিক ঘূর্ণগতিই বস্তু পদার্থ রূপে প্রতিভাত হয়। এই একমাত্র সত্তার ঘূর্ণ-গতির নামই বস্তু-পদার্থ।

এক্ষণে বস্তু-ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। ঘনত্ব, গুরুত্ব, জড়তা ইত্যাদি বস্তু-ধর্ম্ম কিরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। পূর্ব্বে যেমন বস্তু পদার্থের পৃথক অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া জড়ের জড়ধর্ম্ম সকল বুঝিবার চেষ্টা করা হইত, এখন তড়িৎকেই একমাত্র সত্তা কল্পনা করিয়া, তড়িদণু (Electron) হইতেই বস্তুধর্ম্ম নিষ্পন্ন করা হইতেছে (২)। তড়িদণুর দুই প্রকার ব্যবহার; উহা অসম শ্রেণীর তড়িৎকে আকর্ষণ করে এবং সম শ্রেণীর তড়িৎকে বিপ্রকর্ষণ

(১) তড়িৎ ইথারেরই ভাবান্তর মাত্র, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(২) While formerly, starting with the existence of cosmic ether and that of ponderable matter, characterised by its principle attribute, inertia, the attempt was made to give a mechanical explanation for all phenomena; now, on the contrary, starting with the ether and 'the electrons the attempt is made to the construct, so to speak, ponderable matter out of these and to take account of the phenomena which it presents,—Righi—Modern Theory of Physical Phenomena, p 143—4.

করে। এই দ্বিবিধ ব্যবহার হইতেই একণে সর্ব্বপ্রকার বস্তু-ধর্ম্ম নিশ্চয় করা হইতেছে (১)। এমন কি, মাধ্যাকর্ষণও তড়িৎ শক্তিরই ফল স্বরূপ বিবেচিত হইতেছে (২)। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিস্তীর্ণ ইথার সমুদ্র সাম্যাবস্থ; তাহার কোন কোন স্থান বিশেষ ঘূর্ণগতি বিশিষ্ট হইয়া ভাবান্তর উপস্থিত হয়। উহাই বস্তু। সাম্যাবস্থ ইথার ও ভাবান্তরিত ইথার (অর্থাৎ তড়িৎ), এতদুভয়ের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে। তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার মূল। বস্তু-ধর্ম্ম এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ারই ফল মাত্র। মানব তড়িৎ-শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাহা হইতেই জড়ত্ব রূপ ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হয়। বস্তু-জ্ঞান এই ভ্রমেরই নামান্তর (৩)। প্রকৃত পক্ষে ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড কেবলই শক্তি, আর কিছুই নহে। এই মীমাংসা একণে অনিবার্য্য

---

(১) অসম তড়িদণু সকলের পরস্পর আকর্ষণেই বস্তু-পদার্থের ন্যায় ঘনত্ব। আকর্ষণের ন্যূনাধিক্য—বশতঃ ন্যূনাধিক ঘনত্ব উৎপন্ন হয়। বায়ব্য অবস্থা বিপ্রকর্ষণের আধিক্যের ফল।

জড়তা। পৃথিবী একটী প্রকাণ্ড তড়িৎ-চক্র, তদুপরিস্থ অপর কোন বস্তু একটী ক্ষুদ্র তড়িৎ চক্র। উভয়ের অসম বৈদ্যুতিক আকর্ষণে যে শক্তিতে ঐ বস্তু পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়, তত্তুল্য বিপরীত শক্তি দ্বারা উহার গতিরোধ করিলেই ভারত্ব বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। জড়তাও ইহারই ভাবান্তর।

(২) Material atom is nothing but a system consisting of a certain number of positive and an equal number of negative electrons * * *

Molecular atomic forces would then be nothing but the manifestations of the Electro magnetic forces of the electrons and gravitation itself might be explained with these concepts as a basis, Ibid p 151,

See also Lodge—Modern Views, p p 396, 397, 410.

(৩) Matter consists of aggregations or, systems of electrons, since the electrons which may be considered as simply electric charges devoid of matter or as. consisting in a modification of the ether symmetrically distributed about a point, perfectly *simuliate* inertia by reason of the laws of the electro magnetic field and thus show he fundamental property of matter, Modern Phenomena p 151.

(১) The modern conception of matter tends to make the whole world alive, Prof, J A Thomson

হইয়া উঠিয়াছে। যাহা কিছু মানবের অনুভূত অথবা মীমাংসিত, তাহাকেই মানব এক্ষণে শক্তিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছে। এতদ্দেশে এ তথ্য স্মরণাতীত কাল হইতে পরিজ্ঞাত আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এত দিনে তাহা সপ্রমাণ করিতে বসিয়াছে।

এই শক্তি কি অন্ধ-শক্তি? ইহা কি উদ্দেশ্যহীন? না চৈতন্যযুক্ত এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ? এ শক্তি অজ্ঞান অথবা জ্ঞানময়? আমরা এতক্ষণ এ শক্তিকে তড়িৎ নামে অভিহিত করিতেছিলাম। কিন্তু নামে কিছুই নাই। ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র শক্তির বিকাশ, এবং সে শক্তি জ্ঞানময়। ইহাই প্রকৃত অদ্বৈতবাদ। ব্রহ্মাণ্ড কর্ম্ম-ক্ষেত্র। কর্ম্ম যাহার অভিব্যক্তি, সে শক্তি উদ্দেশ্যহীন হইতেই পারে না; সুতরাং তাহাকে জ্ঞানময় অঙ্গীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। সমস্ত জগৎ চৈতন্যময় সুতরাং জ্ঞানময়, সুতরাং আনন্দময়। জ্ঞানের লক্ষণ আনন্দ, তদ্বিপরীত কথনই লক্ষ্য হইতে পারে না। এ নিমিত্ত যে শক্তি জ্ঞানময়, তাহাকে আনন্দময় স্বীকার করিতেই হইবে। জগৎ তাহারই বিকাশ, এবং তাহাতেই জগতের পরিণতি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি।"

বস্তু এক, শক্তি আর;—আমরা চিরদিন এইরূপ পৃথকভাবে বুঝিয়া আসিতেছি। সুতরাং এক্ষণে এতদুভয়কে একভাবে চিন্তা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বস্তু বলিতেই রূপ মনে হয়; শক্তি বলিতেই অ-রূপ মনে হয়। শক্তির ভাবান্তর উপস্থিত হইলে যে রূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, একথা বুদ্ধি-বলে প্রতিপন্ন করিতে পারিলেও, মনে ধারণা করিতে পারি না। মানব দীর্ঘকাল এইরূপ চিন্তায় অভ্যস্ত না হইলে তাহার মন ইহা ধারণা করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু যাহা মনে ধারণা হয় না, তাহাই যে অসত্য, এরূপ কোন কথা নাই। গণিতজ্ঞ বুদ্ধি-বলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দুইটী রেখা এরূপ হইতে পারে যে, উভয়কে অনন্তকাল বর্দ্ধিত করিলেও উহারা মিলিত হইবে না, কিন্তু ক্রমেই পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইবে। ইহা কি মনে ধারণা হয়? দুইটী রেখা, যে কোন প্রকারেরই হউক, ক্রমে পরস্পরের নিকট-বর্ত্তী হইবে, কিন্তু অনন্তকালেও মিলিবে না, ইহা মনে ধারণা হয় না। কিন্তু এ কথা সত্য। মনে ধারণা হউক আর না হউক, বস্তু-পদার্থ প্রকৃতপক্ষে শক্তিই। পণ্ডিতগণ জগতের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া সে সকল শক্তির পরিচয় পাইতেছেন, তাহাদিগকে বিভিন্ন ভাবে দেখা আর সম্ভবপর হইতেছে না। ঐ সকল শক্তি পরিণামে এক তড়িৎ-শক্তিরই ভাবান্তর বলিয়া প্রতিপন্ন

হইতেছে। তাপ, তড়িতেরই ফল; আলোক, তড়িতেরই বিকাশ অথবা বিকীরণ (radiation); চৌম্বক শক্তি (magnetism) তড়িতের সহিত অপ্রভেদ; এমন কি, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি জড়-ধর্ম্ম ও এক্ষণে তড়িৎ-ধর্ম্মরূপে বিবেচিত হইতেছে। মানব সকল শক্তির সমন্বয় করতঃ একমাত্র তড়িৎ শক্তিকেই মৌলিক স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহার গতির বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া মানব এক সর্ব্বব্যাপ্ত সূক্ষ্ম ইথার নামক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারিতেছে না। তাপ এবং আলোকের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় এইরূপ অত্যতিসূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপ্ত ইথারের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। পরে তড়িতের ব্যবহার দৃষ্টে এই কল্পনা ক্রমেই দৃঢ়ীভূত হইতেছে। তাপ ইথারের কম্পন-জনিত গতি বিশেষ, তরঙ্গ বিশেষ; আলোক ও তাহাই, তড়িৎও ইথারের চক্রবৎ-গতি বিশেষ (vortex motion)। এই সকল সিদ্ধান্ত এক্ষণে পণ্ডিত-সমাজে গৃহীত হইয়াছে। মানব সকল শক্তিকে তড়িতের ভাবান্তর প্রতিপন্ন করিয়া তড়িৎকে ও ইথারেরই ভাবান্তর বিবেচনা করিতেছে। তড়িতের ব্যবহার দৃষ্টে তাহাকে দ্বিবিধ বলিয়া বোধ হয়। অসম-শ্রেণীর তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে, সম-শ্রেণীয় তড়িৎ পরস্পরকে দূরে বিক্ষিপ্ত করে। এই দ্বিবিধ তড়িতের সংযোগে ইথার। পণ্ডিতগণ এক্ষণে ইথারকে এই দ্বিবিধ তড়িতের রাসায়নিক সংযোগের ন্যায় বিবেচনা করিতেছেন। (১) তড়িৎ যখন শক্তি, তখন ইথারও শক্তি মাত্রই হইতেছে। এই ইথারকে শক্তি বলা যাউক আর বস্তুই বলা যাউক, ইহাই ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র সত্তা। সকলই ইহার ভাবান্তর মাত্র। ইথার শান্ত, অব্যক্ত এবং সর্ব্বব্যাপ্ত। ইহার স্থানে স্থানে কোন অপরিজ্ঞাত কারণবশতঃ ঘূর্ণপাকের ন্যায় চক্র (২) উৎপন্ন হইয়াই বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। বস্তু এই ইথারেরই ঘূর্ণিত অবস্থা মাত্র। ইথার অথবা তড়িৎ অথবা বস্তু প্রকৃত পক্ষে একই। ইহাদিগকে বস্তু বল ভালই, শক্তি বল, ভালই। কথা লইয়া গোলযোগ করা নিষ্প্রয়োজন।

---

(১) Though atoms of matter are composed of them (positive and negative electricity), * * * these make their appearance when the original substance (ether) is decomposed. Nature, 1907 p, 521.

(২) কাহারও কাহারও মতে, এই ঘূর্ণপাক (vortex motion) অনাদিকাল হইতে আছে। ইহা নূতন করিয়া কোন স্থানে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। এই মত সকলে স্বীকার করেন না।

যদি বস্তু বলা যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, বস্তুই মূলতঃ অব্যক্ত, অতীন্দ্রিয়, পরে ভাবান্তরিত হইয়া ব্যক্ত হইয়াছে। বস্তুই একমাত্র সত্তা। আর যদি শক্তি বল, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ শক্তিই মূলতঃ অব্যক্ত, পরে ভাবান্তরিত হইয়া বস্তুরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। শক্তিই একমাত্র সত্তা। বস্তু শক্তিরই বিকাশ মাত্র, ইহা মনে ধারণা হউক আর না হউক, মানব ইহাকে স্বীকার না করিয়া পারিতেছে না। তবে বস্তুই বল আর শক্তিই বল, উহাকে চৈতন্যময়, জ্ঞানময় স্বীকার করিতেই হইবে। নচেৎ জগতে চৈতন্যের অথবা জ্ঞানের আবির্ভাব সম্ভব হয় না। ফলতঃ জগতে এক মাত্র সত্তা ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তা নাই; উহারই অবস্থা বিশেষের নাম বস্তু-পদার্থ।

বস্তুর অণু ইথারেরই অণু, অথবা তড়িতেরই অণু। সুতরাং বস্তু তড়িদণুর সমষ্টিফল। (১) কিন্তু তড়িৎকে শক্তিরূপে ব্যতীত বস্তুরূপে কল্পনা করা যায় না। এ নিমিত্ত বস্তুকে শক্তিরূপেই কল্পনা করা উচিত। শক্তিই একমাত্র সত্তা; সকলই শক্তির বিকাশ মাত্র, আর কিছুই নহে।

বস্তু অথবা তড়িৎ অথবা ইথার, যেরূপেই মৌলিক সত্তাকে ধারণ করি, তাহার অণু পরমাণু কল্পনা করিতেই হইবে। যাহা অনন্ত বিস্তৃত, সর্ব্বব্যাপ্ত, তাহার ধারণা হয় না। সুতরাং তাহাকে অংশতঃ বিবেচনা করিতে হয়। অতীব ক্ষুদ্রাংশের নাম পরমাণু। এক্ষণে, এই পরমাণুর বিষয় বিবেচনা করিতে সর্ব্বাগ্রেই বুঝিতে হইবে যে, উহা কেবল কল্পনা-মাত্র নহে। যখন দুই অমিশ্র বস্তুর সংমিশ্রণে এক সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম্মবিশিষ্ট যৌগিক বস্তু জাত হয়, তখন ঐ দুই বস্তুর চিহ্নমাত্রও থাকে না। দুই-এ মিশিয়া এক হইয়া যায়। এই সংযোগকে রাসায়নিক সংযোগ বলে। এস্থলে ঐ দুই বস্তুর অতি সূক্ষ্ম অংশও আর পৃথক থাকে না। উভয়ের পরমাণু মিলিত হইয়া ঐ যৌগিক বস্তুর অণু গঠিত হয়। বিভিন্ন বস্তুর পরমাণু সকলের নির্দ্দিষ্ট আয়তন আছে। পণ্ডিতগণ এ সকলের আয়তন ও গুরুত্ব গণনা করিয়াছেন। উদযানের পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা লঘু; তাহারই তুলনায় অন্যান্য অমিশ্র বস্তুর পরমাণু সকলের আয়তন ও গুরুত্ব গণনা করা হইয়াছে। পরমাণু সকল রাসায়নিক সংযোগের মূল। এতদিন মনে করা হইত যে পরমাণু অবিভাজ্য, কিন্তু সম্প্রতি রেডিয়াম্

(১) According to the modern hypothesis, matter is built up of electrons, (But) Electrons are not matter in the ordinary sense of the word. Righi Modern Theory p, 150.

নাশক পদার্থ আবিষ্কৃত হইবার পর এই সংস্কার ক্রমে পরিত্যক্ত হইতেছে। পণ্ডিতগণ পরমাণুকে আর চিরস্থির মনে করিতে পারিতেছেন না। (১) উহাকেও ধ্বংসশীল মনে করিতে বাধ্য হইতেছেন। এক প্রকার পরমাণু খণ্ডিত ও বিভক্ত হইয়া ক্রমে অন্য প্রকারে পরিণত হইতে পারে; ইহা রেডিয়ামের ব্যবহার হইতে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যদি এক বস্তুর পরমাণু অন্য বস্তুর পরমাণুতে পরিণত হওয়া সম্ভব হইল, (২) তবে বস্তু সকলও আর পৃথক পৃথক গণ্য হইতে পারে না। সকলই এক হইয়া যায়। এক মৌলিক বস্তুর পরমাণু ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া জগতের বিভিন্ন অমিশ্র বস্তু উৎপন্ন হওয়া, এবং তাহাদিগের সংযোগে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হইয়া উঠে। এইরূপ চিন্তা হইতেই বস্তু এক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সেই এক, বস্তু না শক্তি? আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন। উত্তর—যাহা বল, তাহাই। কথায় কিছু আসে যায় না। তথাপি শক্তি বলাই সঙ্গত। কারণ তাহাতে যখন আদি হইতেই জ্ঞানের আরোপ না করিয়া উপায় নাই, তখন বস্তু বলিলে ধারণা হইবে না। বরং শক্তি বলিতে অভ্যস্ত হইলে জ্ঞানের আরোপ করিবার সময় অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। যাহা হউক, যিনি যে ভাবে বুঝেন, তাহাই ভাল। এই আদি সত্তাকে এক এবং জ্ঞানময় মনে করিলেই যথেষ্ঠ হইল। সকলই তাহার পরিণতি। কিন্তু পরমাণুর কথা বলিতেছিলাম। একটু রেডিয়াম্‌কে এক কাচের নলের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলে ক্রমেই ঐ নল এক প্রকার বায়ব্য পদার্থে পূর্ণ হইয়া যায়। উহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, উহা রেডিয়াম্ হইতে পৃথক বস্তু। উহা বায়ু আকারের রেডিয়াম্ নহে। হিলিয়াম্ বলিতে যে পদার্থ বুঝা যায়, উহা তাহারই সহিত এক ভাবাপন্ন। শূন্য নলে রেডিয়াম্ রাখিয়া তাহারই বিকৃত অবস্থায় হিলিয়াম্ পাওয়া যাইতেছে। রেডিয়াম্ প্রকৃতই হিলিয়ামে পরিণত হইল। রেডিয়ামের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২২৫; অর্থাৎ উদ্‌যানের তুলনায় রেডিয়াম্ ২২৫ গুণ

---

(১) No comtemporary physicist believes that such a thing as an absolutely stable atom exists. Saleeby, Evolution, p 91,

(২) The atoms of the diffrent "elements" vary only in the arrangement of their electrons. * * * Thomson's theory clearly explains how atoms of one element by losing their outer ring or ring of electrons, may be transformed into those of another. Ibid p 91.

ভারী। কিন্তু ঐ দলের মধ্যে যে হিলিয়াম্ পাওয়া গেল, তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২½। উহা উদ্‌যান অপেক্ষা ২½ গুণ ভারী। এই কথার প্রকৃত অর্থ কি? অর্থ এই যে—রেডিয়ামের পরমাণু উদযানের ২২৫ গুণ ভারী; আর হিলিয়ামের পরমাণু উদ্‌যানের পরমাণু অপেক্ষা কেবল ২½ গুণ ভারী। কিন্তু যখন রেডিয়াম্ হিলিয়ামে পরিণত হইলে, তখন অবশ্যই তাহার পরমাণু প্রায় একশত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এত সূক্ষ্ম পরমাণু, তাহাও কত সূক্ষ্মতর অংশের সমষ্টি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে! পরমাণুর এই সূক্ষ্মাংশ সকলকে পরম্-পরমাণু (ion) বলিলে, বহুসংখ্যক পরম্-পরমাণুতে একটী পরমাণু গঠিত হওয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহারাও তড়িতেরই সূক্ষ্মতম অংশ; দ্বিবিধ তড়িতের রাসায়নিক সংযোগের ফল; অথবা ইথার পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশের ঘূর্ণিত গতির পরিণাম। এ দুই-ই এক কথা। তাহা হইলে পরমাণু (এবং পরম্-পরমাণুও) জন্য পদার্থ, মৌলিক নহে।

ঘূর্ণিত গতি কি? উহাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহা কেন্দ্রাভিমুখ ও বহির্মুখ—এই দ্বিবিধ গতির ফল। ইহাকে আকর্ষণ ও বিক্ষেপ বলা যায়; কুঞ্চন প্রসারণও বলা যাইতে পারে। এই দুই বিপরীত গতিকে এক কথায় স্পন্দন বলিলে, ইথার-সমুদ্রের ঘূর্ণিত গতিও তাহাই। সুতরাং পরমাণু এবং বস্তু পদার্থও স্পন্দন অথবা তরঙ্গ মাত্র হইতেছে। বস্তুর এই প্রকার ধারণা করিলে, জগতের সকল শক্তির সমন্বয় হইতেছে। তাপ আলোক, চৌম্বক-শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি সকলই ইথারীয় তরঙ্গ মাত্র; তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কেবল তরঙ্গে পরিণত হইতেছে। জগৎ=শক্তি; উহা অবিশ্রান্ত, নিত্য তরঙ্গে স্পন্দিত। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড মহান্ স্পন্দন্ মাত্রে পরিণত হইতেছে। চেতন অচেতন সকলই স্পন্দন মাত্র। (১) প্রকৃত পক্ষে চেতন অচেতন ভেদ কিছুই থাকিতেছে না। সকলই পরম্ পরমাণু সমষ্টির খেলা; উহারা নিত্য স্পন্দিত জীবন্ত (২) তরঙ্গ চক্রের অভি-

---

(১) The rhythm in the structure of the elements applies to that of the * * cells too * * * * Rhythmic laws prevail in the aggregates of the elements (জড়) ana in the formation of the cell (চেতন), Burke, Origin of Life p, 150.

(২) We maintain that the movement that exits in the universe without begining is life. Ibid p 177.

ব্যক্তি মাত্র। এই চক্রকে ইথার চক্র অথবা তড়িৎ বলা হইয়াছে। ইহাই একমাত্র সত্ত্বা। চেতন এবং অচেতন, ইহারই অভিব্যক্তি। যে তড়িৎ শক্তিকে মৌলিক বলিয়াছি, পণ্ডিতগণ তাহাকেই একণে জড় ও চেতন; উভয়েরই কারণ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন (৩)। উহারা একের দুই শাখা মাত্র বিবেচিত হইতেছে। উহাদিগের মৌলিক ভেদ তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। জড় ও চেতন মূলতঃ একই প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডে সকলই চেতন, আর অচেতন কিছুই থাকিতেছে না। (৪)

যাহাকে লৌকিক ব্যবহারে জড় বলে, তাহার সূক্ষ্ম অংশ অণু, উহা পরমাণু দ্বারা গঠিত। আর, যাহাকে লোকে চেতন বলে, তাহার ক্ষুদ্র অংশের নাম কোষ, উহা জীবাণু দ্বারা গঠিত। এতদুভয় মধ্যে প্রভেদ কিছুই নাই। অণুর কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া পরমাণু সকল অতি বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। উহাদিগের সংখ্যা, অবস্থান ও গতির উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে। একরূপ হইলে জড় অণু, অন্যরূপ হইলে জীব অণু। জড় ও জীব উভয়ই এক শক্তির বিকাশ মাত্র (৫)। যাহাকে জড় বল, তাহা শক্তি পুঞ্জ, চৈতন্য সমষ্টি, আর কিছুই নহে। আমরা বলিয়াছি, সকল শক্তিই মূলতঃ তড়িৎ শক্তি। এই শক্তিই জীব ও জড় রূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জড়ের জড়-ধর্ম্ম তড়িতেরই ক্রিয়া। তড়িদণুর সেই চক্রগতি কিরূপে জড়স্বরূপ ভ্রম উৎপাদন করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি (৬)। চেতন পদার্থও তড়িতেরই ভাবা-

---

(৩) 'Life and matter are merely different phenomena of electricity * * The three states of electrons may be (1) The purely electrical (২) The living or biogenic state * * (3) The material state. Ibid, p 192—93.

(৪) The barrier, apparently insuperable, * * between living and so-called dead matter would thus pass away as a false distinction, and all nature appear as a manifestation of life. Ibid p 74—75.

(৫) Both the physical and the psychical must be regarded as manifestations of some thing fundamental than either. Nature 1903 p 77.

(৬) The electrons which may be considered as * * consisting in a modification of the laws of ether perfectly *Simulate* inertia by reason of the laws of the electro-magnetic field, and thus *show* the fundamental properties of matter. Righi Modern Theory p, 151.

স্তর। এ সিদ্ধান্ত ধীরে ধীরে মানবকে বহুত্বের মধ্য দিয়া একত্বে লইয়া যাইতেছে। পরমাণু আশ্চর্য্য পদার্থ। ইহা স্বতঃ কম্পিত চক্রাবর্ত্ত; এই স্পন্দনই চৈতন্য। অণুসমষ্টিই ব্রহ্মাণ্ড, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড চৈতন্যময়।

কিছু কাল হইল একটা তর্ক উপস্থিত হইয়াছে যে, অচেতন হইতে চেতন উদ্ভব সম্ভব কিনা? ইহার অনুকূলে প্রতিকূলে বিবিধ পরীক্ষা চলিতেছে। অঙ্গার, অম্লযান, উদযান, যবক্ষারযান ইত্যাদি কতিপয় বস্তুর সংযোগে জীববস্তু (proto-plasm) জাত হয়। ইহারা জলের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া জীবকোষ গঠিত করে। এই জীববস্তু অতীব ক্ষণস্থায়ী। ইহা সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট হইতেছে; এবং উপাদান পদার্থে পরিণত হইতেছে। আর বাহ্যজগৎ হইতে পোষক পদার্থ গ্রহণ করত পুনরায় গঠিত হইতেছে। এই পদার্থ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নানারূপ চেষ্টা হইতেছে। এখনও উহা প্রস্তুত হয় নাই। পরমাণু সকল যে প্রকারে সজ্জিত ও স্পন্দিত হইয়া যে ভাবে জীব-বস্তু গঠিত করিয়াছে, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে, চিরাতীত কাল হইতে উহারা নানা ভাবে সজ্জিত ও স্পন্দিত হইতে হইতে অবশেষে জীববস্তু-ভাবে গঠিত হইয়াছে, এই মাত্র বলা যায়। জীব-বস্তু একদিনে গঠিত হয় নাই। যে গঠনের ফলে তথাকথিত জড় অণু জাত হইয়াছে, তাহা হইতে কত পৃথক ভাবে পরমাণু সকল সজ্জিত হইয়া আংশিক-জড় অংশিক জীব-রূপী কোষ উৎপন্ন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অবশেষে পূর্ণ জীব বস্তু বহু বিবর্ত্তনের পরিণাম ফল। ইহার উপদান-পদার্থের মূলে চৈতন্য না থাকিলে পরিণামে চৈতন্য উদ্ভূত হওয়া সম্ভব হইত না। এই চৈতন্যই অণু পরমাণু রূপে ব্যক্ত হইয়া কোষ নির্ম্মিত করিয়াছে (১)। যাঁহারা জড় হইতে চেতনের উদ্ভব স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতে চিরাতীত কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও ঐ রূপে জীবোৎপত্তি জগতের সর্ব্বত্রই হইতেছে। বস্তু পদার্থের সাধারণ নৈসর্গিক নিয়মানুসারে জীব বস্তুর উৎপত্তি হওয়া তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন (২)। কিন্তু এই তর্ক অনাবশ্যক। মৌলিক শক্তিকে চৈতন্যময় স্বীকার করিলে জড় বলিয়া কোন কালেই কিছু থাকিতেছে না। সুতরাং জড় হইতে জীবোৎপত্তির তর্ক উঠিতেই পারে না। সকলই চৈতন্যময়, জড় কোথায়? জড় হইতে জীবোৎপত্তির কথাই বা উঠিবে কি প্রকারে? চৈতন্যকেই একমাত্র মৌলিক সত্তা অঙ্গীকার করিলে, অণু, পরমাণু, পরম-পরমাণু সকলেই তাহা

হইতে উৎপন্ন হইতেছে, এ কথা আপনা হইতেই প্রতিপন্ন হয় (৩)। ইহাকেই আদি, মধ্য ও শেষ স্বীকার করিলে অণু, পরমাণু, পরম-পরমাণু, সর্ব্বপ্রকার পদার্থ ঘনীভূত চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। ঘনীভূত শব্দ পণ্ডিতবর বার্কের। আমি ইহার এই এইরূপ অর্থ বুঝিয়াছি যে, যিনি আদিচৈতন্য, যিনি এক, যিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার ইচ্ছানুসারে তিনি কখনও পূর্ণ বিকশিত, কখনও অল্পাধিক আচ্ছন্ন; যেন মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় মলিন। যখন তিনি মেঘ-মুক্ত তখন পূর্ণ; যখন মেঘাবৃত তখন মলিন, পূর্ণ প্রকাশ নহে। সেই মৌলিক শক্তি যখন অব্যক্ত, তখন পূর্ণ, আর যখন চক্রাবর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড রূপে প্রকটিত, তখন নানা ভাবে অল্পাধিক আচ্ছন্ন। এই অল্পাধিক আচ্ছন্নতা বশতই জড় ও জীবের প্রভেদ; নচেৎ এ ভেদ মৌলিক হইতে পারে না।

ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র সত্তাই শক্তি এবং তাহা চেতন। যাহাকে বস্তু, অণু, পরমাণু, পরম-পরমাণু বলিলাম (তাহা জড়াণুই হউক বা জীবাণুই হউক) তাহা ঘনীভূত চৈতন্য মাত্র। ব্রহ্মাণ্ড ইঁহারই লীলা, ইঁনি যে ভাবে যখন ব্যক্ত হইতেছেন, তাহা তখন সেই ভাবেই হইতেছে। ইনি জ্ঞানময়। এই আদি শক্তিই জগতে কর্ম্ম রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। কর্ম্মমাত্রই কামমূলক সুতরাং জ্ঞানমূলক। এ নিমিত্ত এই শক্তিকে জ্ঞানময় স্বীকার করিতেই হইবে। এই কথা বুঝাইবার নিমিত্তই পণ্ডিতগণ পরমাণুকে জ্ঞান-তন্মাত্র বলিতেছেন। (১০)। বৈদান্তিকেরা জ্ঞান রূপ একমাত্র পদার্থ স্বীকার করেন। ইনি জ্ঞানময়। সুতরাং আপনাকে আপনি জানেন এবং এবং আপনাতেই আপনি

---

(১) We regard the biogen (জীবাণু) as a sort of nebula of electrons in the process of formation into atoms of elements. Burke—Origin p 223.

(২) Living things * * have been the immediate products of ever acting material properties or natural laws Bastian's studies in Heterogenesis, appendix p VI,

(৩) The vital substance or biogen we regard as * * the substance from which the molecules and atoms by condensation are evolated.—Burke Origin p 223.

(১০) Atoms * * in a sense possess consciousness in some dim remote degree. For that reason we regard matter, or the electrons of which matter, is composed, as Mind stuff. Ibid p, 338.

অবস্থিত। জ্ঞানের লক্ষ্য কি? আনন্দ, অর্থাৎ সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা। দুঃখ না থাকিলে সুখ উপলব্ধি হয় না। সুখ বুঝিতে হইলেই দুঃখ চাই; কিন্তু দুঃখ বোধ ত চৈতন্যের ধর্ম্ম হইতেই পারে না। দুঃখং মে মাভুয়াৎ, ইহাই লক্ষ্য। সুখ ও চৈতন্যের ধর্ম্ম নহে। চৈতন্য সুখ দুঃখের অতীত। এই অবস্থাই পরমানন্দ, সুতরাং যিনি জ্ঞানময়, তিনিই আনন্দময়, তিনি একমাত্র সত্ত্বা। একমেবা-দ্বিতীয়ম্। তুমি আমি, সকলই সেই একমাত্র,— নির্ব্বিকার নিরঞ্জন। তত্ত্বমসি, সোঽহং,—এই মহাবাক্যদ্বয়ের প্রকৃত রহস্য ইহাই। তুমিও তাহাই, আমিও তাহাই।

অণু হ'তে সূক্ষ্ম আমি; আমিই বৃহৎ।
আমি বিশ্ব, আমি নিত্য, আমিই জগৎ (১)।

এতক্ষণে অবশ্যই বুঝা গিয়াছে যে, আমরা যাহাকে অ-বস্তু বলিতেছি, তাহা আর কিছুই নহে, শক্তি। শক্তিই জগতে একমাত্র সত্ত্বা, বস্তু তাহারই বিকাশ মাত্র। কিন্তু শক্তি কি হঠাৎই বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে? না ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত হইয়া বস্তুর আকার ধারণ করিয়াছে? জীব-জগতে এক্ষণে বিবর্ত্তন-বাদ স্বীকৃত হইতেছে। জড়-জগতও কি বিবর্ত্তন-বাদের অধীন? আমরা দেখিয়াছি, জীব ও জড়ে মৌলিক প্রভেদ কিছুই নাই (২)। সুতরাং যাহাকে সচরাচর জড়-জগৎ বলা হয়, তাহাতেও বিবর্ত্তনবাদের প্রয়োজ্যতা স্বীকার করিতে বাধা কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ মত এ স্থলেও প্রয়োজ্য কিনা, তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

আমরা দেখিয়াছি যে, সমস্ত বস্তু-পদার্থই অণু সমষ্টি মাত্র। অণু, পরমাণু-সমষ্টি। পরমাণুও বহুসংখ্যক পরংপরমাণুতে (৩) গঠিত। বস্তুর এই সকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ প্রকৃত পক্ষে তড়িতেরই অংশ। বস্তুপদার্থ তড়িদণুরই সমষ্টি। তড়িদণু দ্বিবিধ, কিন্তু মূলে এক। উহা সেই সর্ব্বব্যাপ্ত ইথারেরই ভাবান্তর মাত্র। ইথার মধ্যে স্থানে স্থানে ঘূর্ণাবর্ত্ত উৎপন্ন হইয়াই তড়িৎরূপে এবং বস্তুরূপে প্রকাশ হয়। এই ঘনীভূত ঘূর্ণাবর্ত্তের বেগাধিক্যে তড়িতের বিকাশ;

(১) উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, ১০৮ পৃষ্ঠা।

(২) The modern conception of matter tends to make the whole world alive. J. A. Thomson.

(৩) Ion.

এবং বেগ-মান্দ্যে বস্তু-পদার্থ (১)। আবর্ত্তের বেগাধিক্য বশতঃ তড়িতের ন্যায় অনুভূতি উৎপন্ন হয়; এবং তাহার বেগ অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইলে বস্তু পদার্থের ন্যায় অনুভূতি জাত হয়। তড়িদণু ও বস্তুর অণু মধ্যে প্রধান প্রভেদ বেগের পার্থক্যে, এবং অণুদ্বয়ের গঠন প্রণালীতে। এই গঠন প্রণালী কিরূপ, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যাহা হউক, বস্তু পরমাণু সমষ্টি। পরমাণু তড়িদণু মাত্র। তড়িদণু ইথারীয় ঘূর্ণাবর্ত্ত। তবেই দেখা যাইতেছে যে, বস্তু পদার্থ ইথারেরই বিকাশ। ইথার কি, তাহা বুঝা যায় নাই; কিন্তু উহা বস্তু নহে। বস্তু উহা হইতে ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে; উহা বস্তু নহে, অবস্তু। বস্তুর একমাত্র লক্ষণ গুরুত্ব, অর্থাৎ ওজন। উহার রূপ ও অবস্থা কিছুই নহে; কেবল ওজনই স্থিরধর্ম্ম। ইহাই বস্তু-বাদিগণের মত-সম্মত। যাহা কঠিন, তাহা তরল হইতেছে, যাহা তরল, তাহা বায়ব্য হইতেছে। যাহা গোলাকার, তাহা লম্বা হইতেছে; যাহা লম্বা, তাহা ত্রিভুজরূপ গ্রহণ করিতেছে। সুতরাং রূপ এবং অবস্থার কিছুই স্থিরতা নাই। কিন্তু এ সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেও বস্তুর ওজন অপরিবর্ত্তিত থাকে। ওজন অর্থাৎ গুরুত্বই একমাত্র স্থির বস্তু-ধর্ম্ম, কিন্তু উহা ইথারের নাই। পণ্ডিতগণ যে সর্ব্বব্যাপ্ত ইথারের কল্পনা করিতে বাধ্য হইতেছেন, তাহাতে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করিতে পারিতেছেন না; অথচ এই গুরুত্বহীন সত্বাতে সমধিক ঘণত্ব আরোপ না করিয়া উপায় নাই। রৌপ্য স্বর্ণ ইত্যাদি হইতে ইহাকে অধিকতর ঘন বিবেচনা করিতে হইতেছে। যাহা গুরুত্বহীন, তাহাই আবার এত ঘন! কিন্তু এত ঘনত্ব সত্ত্বেও চন্দ্র সূর্য্য হইতে কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলই তাহার মধ্য দিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতেছে, কোন বাধা নাই!! গুরুত্ব নাই, কিন্তু ঘনত্ব আছে, আবার ঘনত্ব থাকা সত্ত্বেও বাধকত্ব নাই!!! এইরূপ পরস্পর-বিরোধী বস্তুধর্ম্ম সকলের আরোপ করিতে হয় বলিয়াই ইথারকে বস্তু বলা যাইতে পারে না। যদি ইথার হইতে বস্তু-পদার্থ জাত হইয়া থাকে, তবে অবস্তু হইতেই বস্তু জাত হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু হঠাৎ হওয়া সম্ভবপর নহে। যদি ক্রমশঃ এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই মাঝামাঝি অবস্থার কোন না কোন সত্বা জগতে বিদ্যমান আছে; যাহা সম্পূর্ণ ভাবে বস্তুও নহে, এবং

(১) When the transformations of equilibrium are rapid, we call them electricity &c ; when * * slower, we give them the name of Matter.
The evolution of Matter, P. 17.

সম্পূর্ণ অবস্তুও নহে। ক্রম-বিবর্ত্তনের নিয়ম এস্থলে প্রয়োজ্য হইলে, অবস্তু ক্রমশঃ আপন ধর্ম্ম হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। অবস্তু ক্রমে কিছু কিছু বস্তুভাবাপন্ন হইয়া অবশেষ বস্তুরূপে বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং অবস্তু এবং বস্তুর মাঝামাঝি উভয়রূপ লক্ষণযুক্ত সত্বা অবশ্যই জগতে বিদ্যমান থাকিয়া ক্রমবিবর্ত্তনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, ইহা আশা করা যায়। প্রকৃত পক্ষেও তাহাই দেখা যাইতেছে। রেডিয়ম্ হিলিয়াম ইত্যাদি পদার্থ সর্ব্বদাই ব্যোমমণ্ডলে সূক্ষ্মাদপি সুক্ষ্ম কণিকা সকল (effluves) বিকীরণ করিতেছে। কেবল রেডিয়ম্ হিলিয়ম নহে, অধ্যাপক গুস্তেব-লি-বোঁ প্রতিপন্ন করিয়াছেন (১) যে, জগতে সকল বস্তু হইতেই সর্ব্বদা কণিকা সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে; এই কণিকা সকলের বস্তুধর্ম্ম নাই বলিলেই হয়, কারণ ইহারা গুরুত্বহীন; অথচ বস্তুর ন্যায় অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপন্ন করিতে পারে। অপিচ ইহারা একেবারে তড়িৎভাবাপন্নও নহে। ইহারা বায়ুকে তড়িৎ পরিচালক করিতে পারে; কিন্তু তড়িৎ বায়ুকে আত্ম-পরিচালক শক্তি প্রদান করিতে সক্ষম নহে। কোন বস্তুতে তড়িৎ উৎপন্ন করিয়া তাহা বায়ুতে রাখিলে বায়ু তড়িদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করে না। কিন্তু ঐ কণিকা সকল বায়ুকে আত্ম-ভাবাপন্ন করিতে সক্ষম হয়। এদিকে উহারা চৌম্বকশক্তি দ্বারা তড়িতের ন্যায় আকৃষ্ট হয়; উহাদিগের গুরুত্ব নাই। তড়িতেরও নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উহারা কোন কোন অংশে তড়িদভাবাপন্ন এবং অপরাংশে নহে; কোন কোন অংশে বস্তুভাবাপন্ন, অন্যাংশে তাহাও নহে। যেন উভয়েরই মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। পক্ষান্তরে ইহারা ইথার হইতেও অনেক বিভিন্ন। কণিকা সকল তড়িৎ হইতে বিভিন্ন, সুতরাং ইথার হইতেও বিভিন্ন। কারণ ইথারচক্রের নাম-ই তড়িৎ, তাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। সুতরাং ঐ সকল কণিকা ইথার ও বস্তু অথবা তড়িৎ ও বস্তু, এতদুভয়ের যেন মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় অবস্থিত। এই কথাই অন্যভাবে বলিলে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, যাহা ইথার, তাহাই যথাক্রমে তড়িদ্রূপে, বস্তু কণিকারূপে, অবশেষে বস্তুরূপে অভিব্যক্ত হয়।

এ স্থলে আর একটী কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। বস্তু-কণিকা কি অণু, পরমাণু? উত্তর—না, তাহা নহে। অণু, পরমাণু যতই ক্ষুদ্র হউক, উহা বস্তুধর্ম্মী, উহাদিগের গুরুত্ব আছে; এবং উহারা পৃথক পৃথক বস্তু হইতে

(১) The evolution of Matter. —Gustave Le Bon.

বিশ্লিষ্ট হইলে পৃথক পৃথক ভাবাপন্ন হয়। কিন্তু এই সকল কণিকা—অর্থাৎ রেডিয়ম ইত্যাদি হইতে সে সকল কণিকা সতত নির্গত হইতেছে, উহারা সকলেই এক ভাবাপন্ন। যে কোন বস্তু হইতেই নির্গত হউক, কণিকা সকল একধর্ম্মী। (১) সকলেই বায়ুকে তড়িৎ পরিচালক রূপে পরিণত করে এবং চৌম্বক-শক্তি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। এই একধর্ম্মীতা হইতেই বুঝা যায় যে, উঁহারা অণু পরমাণু হইতে পৃথক ভাবাপন্ন। যেন বস্তু-পদার্থের পরমাণু সকল আরও বিশ্লিষ্ট হইয়া ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, পরমাণু অবিভাজ্য নহে; উহাও বহু সংখ্যক ক্ষুদ্রতর অংশের সমষ্টি মাত্র। এখন দেখিতেছি যে, উহা যে কেবল মাত্র বিভাজ্য, তাহা নহে, উহা বিভক্ত হইয়া পরমাণু হইতে পৃথক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। অণু, পরমাণু বস্তু-পদার্থের পৃথক পৃথক ধর্ম্ম ঠিক রাখে; কিন্তু এই সকল কণিকা তাহা রাখে না। যে বস্তুরই কণিকা হউক, সব এক ভাবাপন্ন। সুতরাং ইহারা অণু, পরমাণু হইতে পৃথক। এক্ষণে পূর্ব্বের ক্রম-বিবর্ত্তন স্মরণ করুন। আমরা বলিয়াছিলাম, "যাহা ইথার, তাহাই তড়িদ্রূপে, বস্তু-কণিকা রূপে, অবশেষে বস্তুরূপে অভিব্যক্ত হয়।" কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কণিকা ও বস্তু মধ্যে অনেক ব্যবধান আছে। কণিকা বস্তুধর্ম্মী নহে; সুতরাং কণিকার পর অণুর উল্লেখ করিতে হয়, তৎপরে বস্তুর উদ্ভব। তাহা হইলে অভিব্যক্তির ক্রম এইরূপ হয়;—ইথার, তড়িৎ, কণিকা, পরমাণু, অণু, তৎপর প্রত্যক্ষীভূত বস্তু-পদার্থ। ইহাই জড়-জগতের অভিব্যক্তিবাদ। (২)

এই তত্ত্ব জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতেও কথঞ্চিত প্রতিপন্ন হইতে পারে। পণ্ডিতগণ এক্ষণে স্বীকার করিতেছেন যে, নীহারিকা হইতে জ্বলন্ত বাষ্পাবর্ত্ত, তাহা হইতে (ক্রমে তাপ মন্দীভূত হইয়া) তরল ও কঠিন জ্যোতিষ্ক সকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই নীহারিকাই আবর্ত্তিত হইয়া ঘনীভূত হইতেছে ও ক্রমে বস্তুরূপে পরিণত হইতেছে। কিন্তু নীহারিকাও মৌলিক

---

(১) The particles emitted during dissociation possess identical characters, whatever the substance in question.—Ibid p, 37,

(২) In evolution towards the state of matter, the ether must no doubt have passed through intermediate phases of equilibrium.

Ibid p, 171

অবস্থা নহে। যাহা সম্পূর্ণ বস্তুধর্ম্মের বহির্ভূত, তাহাই নীহারিকার পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহা হইতেও বস্তুর ক্রমবিকাশ বুঝা যাইতে পারে।

আমরা পুনঃ পুনঃ তড়িৎ-শক্তির উল্লেখ করিয়াছি। উহার গুরুত্ব কিছুমাত্র নাই। সুতরাং বস্তুর প্রধান লক্ষণই অভাব। উহা অবস্তু, উহা শক্তি; কিন্তু ইথার চক্রের ঘূর্ণাবর্ত্তের ধর্ম্ম। ইথার কি তাহা বোধগম্য নহে। কিন্তু এ কথা বলিতে পারা যায় যে, উহাও বস্তু নহে। অবস্তু অর্থাৎ শক্তি হইতেই ক্রম-বিবর্ত্তনের বশে বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। (১) আর অমিশ্র বস্তুর যোগে মিশ্রবস্তুর উৎপত্তি।

কিন্তু অমিশ্র বস্তু কি এক শ্রেণীর এবং এক ভাবাপন্ন? রৌপ্য, লৌহ ইহাদিগকে অমিশ্র বলি; কিন্তু ইহারাও কত প্রকার। রৌপ্য বোধ হয় ছয় প্রকার, লৌহও অনেক প্রকার। অঙ্গার নানা প্রকার—কয়লা হীরক ইত্যাদি। অম্লজানও অন্ততঃ দুই প্রকার। ইহাদিগকে অমিশ্র-ভেদ (allotropic modification) বলা যাইতে পারে। যেমন বানর ও মানুষ একশ্রেণীর হইয়াও বিভিন্ন, যেমন বিড়াল ও সিংহ একশ্রেণীর হইয়াও পৃথক, যেমন উই ও পিপীলিকা এক শ্রেণীর হইয়াও স্বতন্ত্র, উহারাও তদ্রূপ। আর যদি ততদূর প্রভেদ নাও বলা যায়, অন্ততঃ বিভিন্ন জাতীয় মানবে যে প্রভেদ, তাহাত স্বীকার না করিয়া আর উপায়ই নাই। তাহা হইলেই জীবজগতে যেমন বিভিন্ন জন্তুকে বিভিন্ন শাখাতে বিভক্ত করা হইয়াছে, জড়-জগতেও সমস্ত বস্তু পদার্থকেই তদ্রূপ বিভিন্ন শ্রেণী ও শাখাতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (২) আর জীবজগতে যেমন বিবর্ত্তনবাদ স্বীকৃত হইতেছে, জড়জগতেও তেমনই বিবর্ত্তনবাদ স্বীকৃত হইতে পারে। জড়জগতের মূল পরমাণু। সেই পরমাণুও চিরস্থির নহে। আমরা দেখিয়াছি যে, উহা বিভাজ্য এবং বহু অংশের সমষ্টি। আর এই অংশ সকলের সমষ্টি-ফল একরূপ হইতে অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, রেডিয়ম্ পরমাণু হিলিয়মের পরমাণুতে পরিণত হয়। আর পণ্ডিতগণ পরমাণুকে চির-স্থির মনে করিতে সক্ষম হইতেছেন না। উহারা এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে

---

(১) This conception leads us to view matter as avariety of energy. Ibid p, 10.

২) Chemical species evolves like organic species. Ibid p 79.

পরিণত হইতেছে (১), সুতরাং যেমন জীবজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ (কোষ) চিরপরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্ন হইতে উচ্চজীব সকলকে বিবর্ত্তিত করিয়াছে, জড় জগতেও পরমাণু সকল চিরবিবর্ত্তিত হইয়া এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু রচনা করিতেছে, অথবা বিভিন্ন বস্তুতে পরিণত হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। এক্ষণে সেই কণিকার কথা পুনরায় স্মরণ করুন। জগতে সমস্ত পদার্থই সর্ব্বদা কণিকা বিকীর্ণ করিতেছে; কিন্তু ঐ সকল কণিকা, বস্তু হইতে পৃথক। উহারা সম্পূর্ণ বস্তুধর্ম্মী নহে। এ কথার প্রকৃত অর্থ কি? ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে না যে, বস্তু-পদার্থ অর্থাৎ তাহার অণু সততই বিশ্লিষ্ট হইতেছে? বস্তু চিরস্থির নহে। জগতে কিছুই চিরস্থির নহে। যেমন ইথার হইতে ক্রমে বস্তু-পদার্থ বিবর্ত্তিত হইতেছে, তেমনই বস্তু পদার্থও সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট হইয়া সেই অনন্ত, সর্ব্বব্যাপ্ত ইথারেই লীন হইতেছে। (২) যাহা হইতে উদ্ভব, আবার তাহাতেই লয়। ইহা কি বিজ্ঞানের চরমা কথা নহে? মানব-জ্ঞানের ইহাই শেষ কথা, ইহাই শেষ সীমা।

আমরা বস্তু হইতে পরমাণুতে, পরমাণু হইতে তড়িতে, এবং তাহা হইতে ইথারে গিয়াছি। এই ইথার সাম্যাবস্থ, অব্যক্ত। ইহাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্ব্বাণের সহিত তুলনা করিতেছেন। (৩) বিজ্ঞান ইহার পশ্চাতে আর যাইতে সক্ষম হইতেছে না; ইহাকে মূল শক্তি রূপে কল্পনা করিতেছে। কিন্তু ধর্ম্ম-বিশ্বাস এই স্থানেই ক্ষান্ত হইতে পারে নাই। মানবের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ইহারও পশ্চাতে গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক অনন্যোপায় হইয়া এই ইথারকেই জ্ঞান-চৈতন্য

---

(১) Thomson's theory clearly explains how atoms of one element by losing their outer ring or ring of electrons may be transformed into those of another.—Saleeby, Evolution p, 98.

(২) It (Ether) is no doubt the first source and ultimate end of things

The evolution of Matter, p, 93 and p 310.

The ponderable issues from the ether and returns to it under manifold influences.

M A Ducland Revue Scientifique, April, 1904.

(৩) It is a sort of fina Nirvan * * an infinitive and motionless nothingness.—The evolution of Matter, p 73 and p, 315.

আরোপ করিতেছেন। জগতে সর্ব্বত্রই জ্ঞানের খেলা। জড় হইতে উদ্ভিদ ও মানব পর্য্যন্ত, একটা ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। তাই অণু, পরমাণুতে, সুতরাং পরিণামে ইথারেও, আর জ্ঞান-চৈতন্যের আরোপ না করিয়া উপায়ান্তর দেখা যাইতেছে না (১)। পণ্ডিতগণ জ্ঞান চৈতন্যকেই মূল শক্তি স্বীকার করিয়া সেই শক্তি হইতে জগতের অভিব্যক্তি অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। সেই একমাত্র সত্তা জ্ঞান-চৈতন্য-হইতেই অণু পরমাণুর মধ্য দিয়া ব্যক্তাব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে;, আবার ব্রহ্মাণ্ড-পদার্থ ক্রমে বিশ্লিষ্ট হইয়া সেই অণু পরমাণুর মধ্য দিয়াই সেই মৌলিক সত্তায় লীন হইবে। উহার সাম্যাবস্থা অচিন্তনীয়, এবং চক্রাবর্ত্তে ব্যক্তাবস্থাই জগৎ। জগতের যাহা কারণ, তাহাই পরিণাম। যখন জগৎ এই পরিণামে উপনীত হইবে, তখন মহাসাম্য। সে সাম্য শান্ত, অচঞ্চল। তাহা আবার চক্রাবর্ত্তে অভিব্যক্ত হইবে, আবার চঞ্চলতা, অর্থাৎ জগৎরূপ প্রাপ্ত হইবে। কি উপায়ে সেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে চিন্তার অবিষয়। তবে এই পর্য্যন্ত চিন্তা করা সম্ভব যে, উহার সাম্যাবস্থা ভগ্ন হইবেই; উহা স্পন্দিত, বিবর্ত্তিত হইবেই। যে কারণে পূর্ব্বে সেই সাম্যাবস্থা অপনীত হইয়া জগৎ প্রকটিত হইয়াছে, সেই কারণেই আবারও সাম্যাবস্থা প্রাপ্তির পর তাহা অপনীত হইয়া জগৎ অভিব্যক্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত। এ ধারা অনন্ত। যেমন পূর্ব্বে ছিল, পরেও তেমনই হইবে। "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ"—এই মহাশ্রুতি অনন্তের দিকেই লক্ষ্য করিতেছে। এই অনন্ত চক্রের গতি অবিরাম, আদিহীন এবং অন্তহীন; সেই একমাত্র অদ্বিতীয়ের গূঢ় ও ব্যক্ত ভাব। মানব-মনের অতীত মহান্ লুকাচুরী খেলা। এ খেলা কেনই বা হইল, কেনই বা হইতেছে, আর কেনই বা হইবে, তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে বিজ্ঞান ত সম্পূর্ণ অসমর্থ, ধর্ম্মবৃত্তিও স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করিয়া পরাস্ত হয়। ইহা তুল্যরূপে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অবিষয়।

পূর্ব্বে যে সকল তত্ত্ব আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, (১) অবস্তু অর্থাৎ শক্তি হইতেই বস্তু উদ্ভূত হইয়াছে। শক্তিই মৌলিক, বস্তু তাহার বিকাশ মাত্র।

উপসংহার

(১) Atoms * * in a sense, possess consciousness in some dim remote decree. Burke origin of life, p 338. The Evolution, p 249.

(২) শক্তি ক্রম-বিবর্ত্তিত হইয়া বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে।

(৩) তাহার পারম্পর্য্য এইরূপ :—

শক্তি
|
মধ্যবর্ত্তী অবস্থা।
|
বস্তু
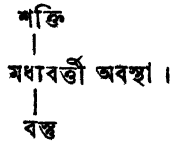
(৪) তড়িৎকেই একমাত্র শক্তি জানা যাইতেছে। তথাকথিত বিজ্ঞানশাস্ত্র ইহার পশ্চাতে যাইতে অক্ষম। তড়িৎ দ্বিবিধ হইলেও এক। এতদুভয় হইতে

(৫) ইথার *। ইথার সর্ব্বব্যাপ্ত। ইহার মধ্যে চক্রাবর্ত্ত সকল অতি বেগে ঘূর্ণিত অর্থাৎ "স্পন্দিত" হইতেছে। ইথার চক্র সকল বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত। † দুই-এর সংযোগে সাম্য। এ নিমিত্ত ইথার সাম্যবস্থ কিন্তু স্থানে স্থানে আবর্ত্তিত; এবং সেই আবর্ত্তনের ফলে তড়িদ্রূপে প্রতিভাত।

(৬) তড়িদনু। ‡ (বস্তুপক্ষে) পরং পরমাণু ¶ ইহারা অবস্তু ও বস্তুর মধ্যবর্ত্তী অবস্থা।

(৭) কণিকা। * ইহারাও তাহাই। এতদুভয় এক দিকে তড়িৎ ভাবাপন্ন, অন্য দিকে বস্তু ভাবাপন্ন।

(৮) পরমাণু, এবং বস্তু পদার্থ। অণু পরমাণু, সকলই জ্ঞান-চৈতন্য-যুক্ত। সুতরাং জীব ও জড় অপ্রভেদ। § সকলই চেতন, অচেতন অথবা জড় কিছুই নাই। নিম্নে বিবর্ত্তন-ক্রম চিত্রাকারে প্রদর্শিত হইল।

---

* Of these two electricities (positive and negative) we imagine the ether to be composed. Modern views of Electricity p, 247—8.

† Left-handed and right-handed vortices.

‡ Electron.

¶ Ion.

§ Efluves.

তড়িৎ-শক্তি
|
ইথার।
চক্রাবর্ত্ত।
|
তড়িদণু।
|
কণিকা-ইত্যাদি।
|
পরং পরমাণু।
পরমাণু।
অণু।
|
জড় ——————————— জীব
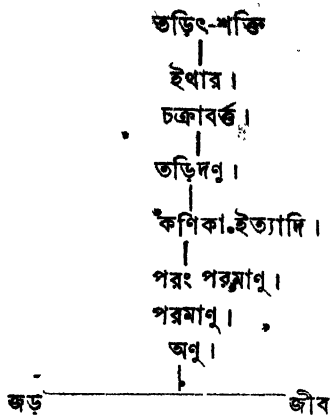
জীবাণু ও জড়াণুতে কেবল অণুর গঠন ও গতির প্রভেদ মাত্র। তড়িদণু ও বাস্তব অণুর মধ্যেও এই প্রভেদ। ফলতঃ বস্তু-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞান অনুসারে ব্রহ্মাণ্ড এক অদ্বিতীয় শক্তিরই অভিব্যক্তি মাত্র প্রতিপন্ন হয়। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড এক মহাশক্তি; উহাতে বস্তু-বোধ ভ্রম মাত্র; যাহাকে পণ্ডিত রিগি (১) simulation অর্থাৎ প্রতারণা বলিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক মত কি? ইহা সেই বেদান্তেরই মত। ঋষিগণের অলোকসামান্য জ্ঞান ইহা ঘোষিত করিয়াছে। আধুনিকগণ তড়িৎ ও ইথার হইতে আরম্ভ করিতেছেন; বস্তু বিজ্ঞান ইহার উর্দ্ধে যাইতে সক্ষম নহে। কিন্তু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা এই স্থানেই ক্ষান্ত হইতে পারে না। তড়িদাদি সর্ব্বপ্রকার শক্তি, ইথার আদি সর্ব্বপ্রকার সত্তার মূলে সেই এক, অদ্বিতীয়, অজ, শাশ্বতকে নিরূপণ না করিয়া মানব স্থির থাকিতে পারে না। নিরূপণ কি? তাঁহাকে কি বুঝা যায়? যিনি বাঙমনের অগোচর, তাঁহাকে কি ধারণা হয়? হয় না, এ কথা সত্য নহে। হয় বলিলেও ভ্রম হইতে পারে।

কেনোপনিষৎ বলেন—

নাহংমন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদচ
যো নস্তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদচ॥

"নিতান্তই বুঝি না যে তাও সত্য নহে, বুঝি যে, এমন কথা কার সাধ্য কহে। জানি না, তবুও জানি, এই কথা যাঁর, তিনিই সে ব্রহ্ম বস্তু বুঝেছেন সার।" (২) কিন্তু কি বুঝিয়াছেন? বস্তু বিজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানের কি সহা-

(১) Righi Modern Theory of Physical phenomena, p 151.
(২) উপনিষদ গ্রন্থাবলী পৃঃ ৬৯।

রক্তা করে? যে টুকু করে, তাহা বুঝা যাউক আর না যাউক, কল্পনা করা যাইতে পারে। আর বস্তু বিজ্ঞান যে স্থলে অক্ষম, সেস্থলে ভগবদ্বাক্যই এক মাত্র আশ্রয়।

সৃষ্টিতত্ত্ব।

বস্তু বিজ্ঞান অনুসারে আমরা কল্পনা করিতে পারি যে—এক বিরাট সর্ব্ব-ব্যাপ্ত (৩) (চৈতন্তময়) সত্তা সাম্যাবস্থায় ছিল; তাহার স্থানে স্থানে চক্রাবর্ত্ত (vortex) উৎপন্ন হইয়াছিল।—কবে, কি কারণে হইয়াছিল, তাহা মানব মনের অজ্ঞেয়। এই চক্রাবর্ত্ত বশতঃ কণিকা প্রভৃতি উৎপন্ন হইল এবং তাহা হইতে পরমাণু এবং অণু সকল জাত হইল। এই অণু সকলের গঠন এবং অন্তর্নিহিত পরমাণুর গতির তারতম্য অনুসারে জীবাণু ও জড়াণু উৎপন্ন হইল। ক্রমে জীবাণুর বিবর্ত্তনে মানব পর্য্যন্ত, এবং জড়াণুর বিবর্ত্তনে ধূলি-কণা হইতে জ্যোতিষ্ক পর্য্যন্ত গঠিত হইল। তাহারা ঐ বিরাট-সত্তা হইতে জাত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মসম্পাদন করিতেছে; এবং কালবশে আরও বিবর্ত্তিত হইয়া সেই মৌলিক-সত্তাতে লীন হইবে। (৪) বস্তুবিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে লইয়া যাইতে সক্ষম হয়। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা ইহার পশ্চাতের রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছে। ঐ ইথার ও তড়িৎশক্তি কি? ব্রহ্মবিদ্যা বুঝাইয়া দিতেছে, উহারা মৌলিক সত্তা নহে, একমাত্র ব্রহ্ম বস্তুই মূল; উহারা তাঁহারই বিকার মাত্র। তিনিই মহাসাম্য, তখন তিনি নির্গুণ। তিনিই চক্রাবর্ত্ত, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডচক্র, তখন তিনি সগুণ। ব্রহ্ম পদার্থই মৌলিক সত্তা, তাঁহারই বিকার ঐ তথা-কথিত ইথার এবং তড়িৎ-শক্তি। পণ্ডিতগণ সকল বস্তুর ও সকল শক্তির সমন্বয় করতঃ যে ইথার ও তড়িতে উপনীত হইতেছেন, তাহাকে ব্যবহারতঃ মৌলিক স্বীকার করিলেও পরমার্থতঃ মৌলিক স্বীকার করা যায় না। তাহাদিগের পশ্চাতে এক অনন্তশক্তি স্বীকার করিতে হয়। আর পণ্ডিতগণ (৫) যে অণু পরমাণুকে চৈতন্য আরোপ করিতেছেন, তাহাও সেই অনন্ত জ্ঞানময়ের একাংশ মাত্র। জ্ঞানচৈতন্যই মৌলিক, তিনিই অজ, তিনিই সত্য। ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই ক্ষণিক বিকাশ, অথবা লীলা মাত্র। এ লীলা, এ ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই লীন হইবে। কিন্তু পুনর্ব্যক্ত হইবে। এ চক্রকে অনন্ত স্বীকার না করিয়া উপায়ান্তর নাই।

---

(৩) Ether.

(৪) It (ether) is no doubt the first source and the ultimate end of things. Evolution of Matter p, 93.

(৫) গুস্তেভ লিবোঁ, ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু, জন্ বার্ক, অগস্তো, রিগি প্রভৃতি।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

এখনই আমাদিগের হস্ত ও পদের অঙ্গুলি সকল যেরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিলে, পরিণাম ভাবিয়া কিছু ব্যাকুল হইবার কারণ উপস্থিত হয়। একবার কল্পনা করুন যে, আমাদিগের পদের অঙ্গুলি নাই; কেবল পদতল দ্বারা পদের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে! তাহা হইলে কিরূপ বোধ হয়? আমার মনে ত একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়। মনে হয়, যেন প্রত্যেক পদক্ষেপেই পড়িয়া যাইতেছি; অন্ততঃ পিচ্ছিল স্থানে যে কিরূপে চলিব, তাহা সম্পাদক মহাশয়ের সহিত পরামর্শ না করিয়া আমি কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছি না! কিন্তু এই অঙ্গুলিহীন কাল্পনিক অবস্থাই বোধ হয় আমাদিগের যথার্থ পরিণাম; আর নানা কারণে সেই দিকেই আমাদিগের চরণ অগ্রসর হইতেছে, ইহা বিলক্ষণ বুঝা যায়।

আমাদিগের অব্যবহিত নিম্নতম জীবগণের হস্ত ও পদের অঙ্গুলির সহিত আমাদের কর-চরণের অঙ্গুলির তুলনা করুন। সেই অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের ভক্তবৃন্দের পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠগুলি অন্যান্য অঙ্গুলি হইতে একটু ব্যবধানে স্থিত, এবং পদের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে একটী সূক্ষ্ম কোণ থাকে যথা।/। অর্থাৎ, আমাদের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যেমন তর্জ্জনীর সহিত সূক্ষ্ম কোণে ও একটু ব্যবধানে অবস্থিত, তাহাদিগের পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অবস্থানও সেইরূপ। কিন্তু আমাদিগের পদাঙ্গুষ্ঠের পরিবর্ত্তন দেখুন। উহা পদের তর্জ্জনীর দিকে অনেকটা সরিয়া আসিতেছে। এখন আর ব্যবধান নাই বলিলেই হয়। তর্জ্জনীর সহিত ঐ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আর সূক্ষ্ম কোণ নাই, এখন প্রায় সমান্তরাল-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। বানরাদি জীবের ন্যায় পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আমরা আর পার্শ্বের দিকে বেশী ব্যবহার করিতে পারি না, কিংবা উহা দ্বারা জোর করিয়া কোনও দ্রব্য ধরিতে পারি না। উহার সঞ্চালিত হইবার শক্তি ও অন্য বস্তু ধরিবার বলের অনেক হ্রাস হইয়াছে। আমরা নির্ভয়ে সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া দাড়াইতে পারি। সুতরাং পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বানরগণের ন্যায় বাঁক

করিয়া দিয়া ভূমিতে জোর করিয়া দাঁড়াইবার ও সেই ভাবে দেহের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিবার আবশ্যক হয় না।

বিড়ালাদি জীবগণ উঠিয়া দাঁড়ায় না। আমাদিগের ন্যায় তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অস্থি নাই। কেবল তাহার স্থলবর্ত্তী নখমাত্র আছে। অন্য নখের সহিত তাহার সংশ্রব নাই। তাহা ভারবহনও করে না; কেবল অস্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তাহার পরে, বানরাদি পশু; তাহারা কখন কখন দাঁড়ায়, কিন্তু ভাল করিয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইতে পারে না। তাহাদিগের দেহ-ভার বহন করিবার জন্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্যান্য অঙ্গুলি হইতে একটু ব্যবধানে ও পদের সহিত বক্রভাবে অর্থাৎ সূক্ষ্ম কোণে থাকা আবশ্যক। কারণ, তাহা হইলে তাহাদের ভার বহিবার জন্য আশ্রয়ের স্থানের বিস্তৃতি হয়; তাহাতে ভার-কেন্দ্র ঐ আশ্রয়ের বাহিরে যায় না। গণিতজ্ঞ জানেন যে, এরূপ না হইলে, ঐ সকল জীব পড়িয়া যাইত, দাঁড়াইতে পারিত না।

সর্ব্বশেষে মানুষ; নির্ভয়ে উঠিয়া দাঁড়ায়। তাহার পদের পেশী ও শিরাতে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে। তাহার বাহু, স্কন্ধ ও মস্তকের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বিস্তার করিয়া দাঁড়াইবার আবশ্যক হয় না। সেই জন্য মানবের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্যান্য অঙ্গুলির নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তবেই দেখা গেল যে, জীবের প্রয়োজনবশতঃ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্যান্য অঙ্গুলির নিকট-বর্ত্তী স্থান হইতে সূক্ষ্ম কোণে সরিয়া গিয়াছিল; পরে ঘুরিয়া আসিয়া সমান্তরালভাবে তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। উহার বলক্ষয়ও ঘটিয়াছে। কারণ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা আমাদিগের আর কিছুই ধরিবার আবশ্যক না হওয়ায় উহা ক্রমে দুর্ব্বল হইয়াছে। কিন্তু কেবল বলক্ষয় নহে, উহার অঙ্গক্ষয়ও ঘটিয়াছে। আমাদিগের পদের অথবা হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলিগুলির প্রত্যেকের তিন তিনটি অংশ আছে। অর্থাৎ, যে ভাগ অঙ্গুলিনামে খ্যাত, তাহার প্রত্যেকটিতে তিনটী সন্ধি (গাঁইট) ও তিনটি পর্ব্ব আছে। কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুলির তাহা নহে; উহার দুইটি সন্ধি (গাইট) ও দুইটি আছে। সুতরাং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একটিকে হারাইয়াছেন। পদতল এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কুব্জ অথবা 'খাল' হইয়াছে। আর পদপৃষ্ঠে অঙ্গুলির মূলের সহিত সংলগ্ন যে সকল অস্থি রহিয়াছে, যাহাদিগকে গূঢ়াঙ্গুলি বলা যাইতে পারে, (Metatarsus) তাহা প্রায় পূর্ব্ববৎ থাকিলেও, প্রকৃত অঙ্গুলি ভাগের খণ্ডাস্থি সকল মধ্যস্থলে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। শেষে

তাহার কি অবস্থা হইবে, তাহা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দশা দেখিলে সহজেই অনুমিত হইত পারে। অঙ্কিত চিত্রে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ১ ও ২ এই দুই খণ্ড, অন্যান্য অঙ্গুলির ১। ২। ৩। প্রত্যেকের এই তিনটি খণ্ড। গূঢ়াঙ্গুলির সহিত গণনা করিলে দেখা যায়, অন্যান্য অঙ্গুলির ৪।৪ ভাগ বা অংশ, কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অংশ তিনটি মাত্র। সুতরাং বৃদ্ধ একটি হারাইয়াছেন, তাঁহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃদ্ধের যেমন একটি অঙ্গ গিয়াছে, তেমনই আবার স্থূলতায় তিনি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন! হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির তুলনায় অথবা হস্তপদের অন্যান্য অঙ্গুলির তুলনায় পদাঙ্গুষ্ঠ অত্যন্ত স্থূল হইয়াছে। আর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিও একটি অংশ খোয়াইয়াছেন, কিন্তু তিনি অতিরিক্ত স্ফীত না হইলেও অপর বৃদ্ধের সমব্যবসায়ী বলিয়া, এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।
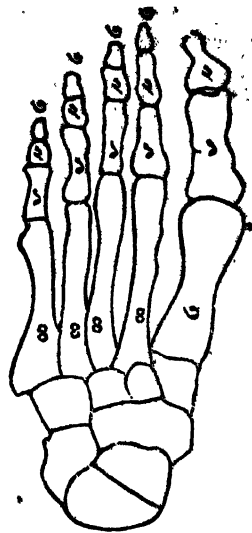
এই চিত্রের আর এক ভাগ দেখুন। সকল খণ্ডাস্থিরই (phalanges) আগা ও গোড়া মোটা ও মাঝখানটা সরু হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাগ্রভাগের খণ্ডাস্থিগুলি অর্থাৎ (৩) চিহ্নিত খণ্ড সকল অতীব ক্ষুদ্র হইয়াছে, এবং মধ্যভাগ এত সরু হইয়াছে যে, প্রায় খসিয়া পড়িবার আশঙ্কা হইতেছে। গূঢ়াঙ্গুলিই কিছু দীর্ঘ ও সুস্থকায়। তাহাও বড় জোর করিয়া বলা যায় না। যাহা হউক, তাহাই যেন ধরিয়া লওয়া গেল। কিন্তু যেগুলি অঙ্গুলি নামে খ্যাত, সেগুলির প্রত্যেক খণ্ডাস্থি ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ; এবং হস্তের অঙ্গুলির খণ্ডাস্থির সহিত তুলনায় দেখা যায়, পদের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলির খণ্ডাস্থি নিতান্তই ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। অথচ এত বড় দেহের ভারটা পদযুগলকেই বহন করিতে হয়। ব্যাপারটা গুরুতর নয় কি? তাহার পর পদের যিনি কনিষ্ঠ অঙ্গুলি, একবার তাঁহার অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। তিনি এত ক্ষুদ্র যে, তাঁহার তিনটি খণ্ডাস্থি এক রকম তাঁহাকে জবাব দিয়াছে, বলিলেও চলে। তাহারা ক্ষুদ্রতম ও ক্ষীণতম। কনিষ্ঠের নড়িবার চড়িবার কিছুমাত্র শক্তি নাই। তিনি এখন কেবল না থাকার মত কোনও রূপে দেহধারণ

করিয়া আছেন! তাঁহার পেশীগুলি প্রায় কোনও কাজই করে না। সকল অঙ্গুলিরই পেশীগুলি মৃতকল্প। সুতরাং অঙ্গুলিগুলির পরিণাম ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। অস্থিগুলি ক্ষুদ্র হইতেছে; তাহাদিগের মধ্যভাগ ক্ষীণ হইতে হইতে প্রায় খসিয়া পরিবার উপক্রম ঘটিয়াছে। পেশীগুলি আর তেমন কাজ করে না। বৃদ্ধ যিনি, তিনি ত একাংশ হারাইয়াছেন; কনিষ্ঠ মুমূর্ষুর অপেক্ষাও সঙ্কটাপন্ন। এখন প্রশ্ন এই, আমরা কি অঙ্গুলি-হীন-পদতল-বিশিষ্ট জীব হইতে চলিলাম? তাহা হইলে শ্রীচরণকমল যে বড় কদাকার হইয়া উঠিবে! পুরুষ অপেক্ষা নারীর পদাঙ্গুলির পরিবর্ত্তন আরও বিস্ময়াবহ। এই দুর্দ্দিনে একমাত্র আশার স্থল পদের তর্জ্জনী। তিনি এখনও আর সকলের অপেক্ষা অবিকৃত আছেন। ইনি আরও বহু দিন টিঁকিয়া থাকিতে পারেন, এমন ভরসাও করা যায়। তর্জ্জনীর অদৃষ্ট যদি এইরূপ প্রসন্ন থাকে, তাহা হইলে হয় ত একবারে অঙ্গুলিহীন না হইতেও পারি। অন্ততঃ তর্জ্জনীটি থাকিতে পারে। সেই ভবিষ্যতের চরণ দেখিতে কতকটা এইরূপ হইতে পারে।* কিন্তু ইতোমধ্যেই পদশত্রু ট্রাম, বাইসিকল মটর প্রভৃতি যেরূপ সাংঘাতিক দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, নিশ্চয়ই পায়ের কপাল ভাঙ্গিয়াছে! তর্জ্জনীও যদি অন্যান্য অঙ্গুলির গতি প্রাপ্ত হয়, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কারণ নাই।
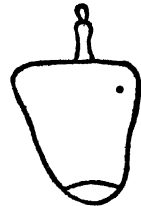
ভবিষ্যতের বাম পদ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নিতান্ত অনুন্নত জীবগণের পদের ব্যবহার প্রধানতঃ ভ্রমণকালে দেহ-বহন। কিন্তু বানরাদির পদ, ভ্রমণ ও বস্তুগ্রহণ এই উভয় কার্য্যই সম্পাদন করে; আবার, মানুষের পা বস্তুগ্রহণ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভ্রমণ কার্য্যেই ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং প্রয়োজনভেদে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠও নানা-অবস্থাপন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ বিড়ালাদি জীবের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অস্থি নাই, কেবল সূক্ষ্মাগ্রযুক্ত নখমাত্র আছে; বানরাদির বৃদ্ধাঙ্গুলির অস্থি হইয়াছে, কিন্তু তাহা তর্জ্জনীর সহিত সূক্ষ্ম কোণে অবস্থিত। মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুলি

---

* ডাক্তার ওয়েডারসেম আর একটু আশা দিয়াছিলেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, তর্জ্জনীর সহিত বৃদ্ধটিও বা থাকিতে পারে! "It might therefore be predicted of the human foot that it may end by possessing only two two-jointed toes, the great toe and its neighbour,—Wedershiem structure of man."
Translated by Bernard p 90.

উহার সহিত সমান্তরালভাবে স্থিত। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের সহিত পেশী সকলও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মানুষের পা প্রধানতঃ ভ্রমণ কার্য্যেই ব্যবহৃত হওয়ায়, পায়ের নলী-সংযুক্ত পেশী সকল দৃঢ় হইয়াছে। কিন্তু পদের অঙ্গুলি বস্তু-গ্রহণ কার্য্য পরিত্যাগ করায়, অঙ্গুলি-সংযুক্ত পেশী সকল ক্ষীণ অথবা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; কোনটি বা অঙ্গুলির সংযোগ ত্যাগ করিয়াছে। (১) যে সকল পেশী বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহারা ক্ষীণও হইয়াছে; এবং যে সকল পেশী অঙ্গুলির সংযোগ ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ক্রমে উর্দ্ধগামী হওযায়, অঙ্গুলির সঞ্চালন কার্য্যে ব্যাঘাত হইয়াছে। সুতরাং ইহা সহজেই বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, কালক্রমে অঙ্গুলিও অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। দুর্ব্বল, ক্ষীণ, ভগ্ন ও লুপ্ত হওয়া কেবল কালসাপেক্ষ, এইমাত্র।

তাহার পর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আর এক অবস্থা কথনও কথনও দেখিতে পাওয়া যায়। উহার খণ্ডাস্থি যেন দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রস্তুত হয়। ঐ দুই খণ্ড অস্থি যেন একত্র জুড়িয়া দিলে একটি গোটা অঙ্গুষ্ঠ হয়। ইহাতে উভয় বৃদ্ধেরই বলহানি ঘটে, এবং বর্ত্তমান অবস্থা লোপ পাইবার সাহায্য করে। ইহাকে বৃদ্ধাঙ্গুলির উন্নতির পরিজ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কথনও কথনও বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্বে পৃথক আর একটি অঙ্গুলি হয়। ইহা হাতেরই হইয়া থাকে। তজ্জন্যও বৃদ্ধের বলক্ষয় ও অবনতির সূত্রপাত হয়।

পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির দুর্দ্দশার কথা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। ইহার অস্থি, পেশী, সকলই ইহাকে অধোগতির দিকে লইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন আমাদিগের সমক্ষে ঘটিতেছে; অথচ ইহা আমরা লক্ষ্য করিতেছি না। এই অঙ্গুলি কথনও কথনও নিকটবর্ত্তী অঙ্গুলির সহিত মাংস ও চর্ম্ম দ্বারা জড়িত হয়। তাহাতে উহার ক্ষীণ অস্তিত্ব ক্ষীণতর হয়। উহার কার্য্য ও চেষ্টা আরও পরায়ত্ত হইয়া পড়ে। পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠও কথনও কথনও তর্জ্জনীর সহিত চর্ম্ম দ্বারা সংযুক্ত হইয়া যায়; তাহাতে বৃদ্ধেরও স্বাধীন কার্য্য এবং

(১) A further consequence of the transformation of the hind limb into a supporting and ambulatory organ is that some of the flexor muscles which originally ran down without interruption to the sole of the foot have become interrupted at the protuberantia calcanei by the dorsal flexion entailed * * * * The short flexor has shifted its point of origin further and further down, till at last, on the acquisition of the upright gait it has reached the calcareal tuberosity, * * * At present it shows in many ways, e, g, in the variation of its terminal tendors and the frequent absence of that to the fifth toe, evidences of a retrogressive tendency.
Structure of Man p, 110-11.

চেষ্টার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ইহাকেও একটি অবনতিসূচক ঘটনা বলিতে হইবে। সুতরাং নানা কারণে এ কথা একরূপ নিশ্চিত হইতেছে যে, অঙ্গুলি সকলের অন্য কারণে উন্নতিবিধান না হইলে, ইহাদিগের লোপ অবশ্যম্ভাবী। ডাক্তার ওয়েডারসেম ও অধ্যাপক টমসন প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিদ্গণ এখনও একবারে আশাশূন্য হন নাই। ইহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যখন আমাদিগের পদ আর বানরাদির পদের ন্যায় বস্তুগ্রহণ কার্য্য না করাতেই প্রধানতঃ এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তখন বস্তু-গ্রহণ কার্য্যে আবার পায়ের অঙ্গুলি সকলকে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেই, ক্রমে উন্নতির আশা করা যাইতে পারে। জাপানী স্ত্রীলোকগণ এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। জাপানীগণ সকল বিষয়েই জগৎকে স্তম্ভিত করিতেছেন। অঙ্গুলিগণের পুনর্জ্জীবনপ্রাপ্তিও কি তাঁহাদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে? জাপানী নারী শেলাই করিবার সময় পদের অঙ্গুলি সুতা টানা কার্য্যে বিলক্ষণ ব্যবহার করিতে পারেন; পায়ের অঙ্গুলি দ্বারা বেশ চিমটি কাটিতে পারেন! বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে স্বতন্ত্রভাবে কিয়ৎপরিমাণে সঞ্চালন করিতে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু জোরে ধরিতে পারেন। * এইরূপে ক্রমে পদাঙ্গুলির ব্যবহার-বৃদ্ধির সহিত এই দুর্দ্দশারও অবসান হইতে পারে। অধুনা ব্যবসায়-ভেদে মনুষ্যের পদাঙ্গুলির প্রয়োজন বাড়িতেছে, এবং ক্রমে বাড়িবে, বোধ হইতেছে। এই কঠিন জীবন-সংগ্রামের যুগে শুধু হাতে বোধ করি আর কুলাইবে না। সুতরাং পাঠকগণ, বিশেষতঃ অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত-চরণা পরারবিন্দ-গৌরবময়ী পাঠিকাদিগের বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই? আমি কেবল ভয় দেখাইতে আসি নাই, কিয়ৎপরিমাণে আশাও দিতে পারি। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদেরই অধিক দোষ। কারণ, পদাঙ্গুলির অ-ব্যবহার তাঁহাদিগের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহাদিগের প্রকৃতি স্থিতিশীল; সুতরাং পুরুষের অপেক্ষা তাঁহাদিগের অঙ্গুলি সকল খর্ব্ব ও ক্ষীণ। পুরুষের অঙ্গুলি বড় ও সবল, তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল † যদি সত্যই কখনও অঙ্গুলিগুলির উচ্ছেদ ঘটে তবে তাঁহারাই সে জন্য দায়ী।

* The use made by the Japanese of the great toe as a thumb is very remarkable. It can be independently moved and strongly pressed against the second toe that even small objects can be firmly held between them. A woman when sewing may hold the stuff with her toes, * * * and can pinch effectively with them......Balz. The bodily characteristics of the Japanese quoted by Wedersheim.

† Structure of Man, P, 89.

হস্ত ও পদ।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, হস্ত ও পদের অঙ্গুলি সকল ক্রমে আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিতে চলিল। হস্তের গূঢ়াঙ্গুলি (Metacarpus) ও পদের গূঢ়াঙ্গুলি (Metatarsus) যদিও অপেক্ষাকৃত অনেক সবল ও পূর্ণাবয়ব আছে, কিন্তু উহারাও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। আর প্রকৃত অঙ্গুলি সকল ত ধ্বংসের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। শিরা ও পেশী সকল দুর্ব্বল হইয়াছে ; এবং হস্তের ও পদের অগ্রভাগের সহিত তাহাদিগের সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। এক তর্জ্জনী ভিন্ন পদের অন্য কোনও অঙ্গুলি যে স্থায়ী হইবে, সে আশাও নাই। তর্জ্জনীর স্থায়িত্বেও সন্দেহ আছে। এক্ষণে হস্ত ও পদের অবস্থা কিরূপ হইল, দেখা যাউক।

হস্ত ও পদের অস্থি সকল একই প্রকার। হস্তাগ্রের * দুই অস্থি ও পদাগ্রের দুই অস্থি তুল্য ; এবং বাহুর এক অস্থি ও উরুর এক অস্থি তুল্য। হস্তকে সম্মুখের পদ বলিলে কোনও দোষ হয় না। চতুষ্পদ অবস্থায় যাহা সম্মুখের পদ, দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহাই হস্ত। সুতরাং এই দুই বস্তু, হস্ত ও পদ, একই পদার্থ। কিন্তু কালক্রমে ইহাদিগের গঠন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ; অবস্থান ত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। নিম্নশ্রেণীস্থ জীবগণের হস্ত ও পদের প্রভেদ মানুষের অপেক্ষা অনেক অল্প ; মৎস্যদিগের এই প্রভেদ একবারেই নাই। তাহাদিগের সম্মুখের ডানা ও পশ্চাতের ডানার অবয়ব ও অবস্থান সম্পূর্ণ একরূপ। বলা বাহুল্য যে, এই ডানাই প্রকৃত হস্ত ও পদের পূর্ব্বপুরুষ। হস্ত ও পদের পুরাতন ঐক্য সর্ব্বতোভাবে সমান নাই। পক্ষিগণের পশ্চাতের পদের উপর দেহের সমস্ত ভার ন্যস্ত ; দেহভার-বহনার্থ সম্মুখের পদের আবশ্যক নাই। তাই সম্মুখের পদ কালক্রমে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ! তাহাদিগের পক্ষ আর কিছুই নহে, সম্মুখের পদের বিকৃতাবস্থামাত্র। তার পর মানুষ। মানুষকে আর পদ দ্বারা বস্তু গ্রহণ করিতে হয় না, এইজন্য ক্রমশঃ পদাঙ্গুলির অবস্থান্তর ঘটিতেছে। ইহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে

---

* কনুই হইতে কব্জি পর্য্যন্তকে হস্তাগ্র (forearm) এবং স্কন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্তকে বাহু বলিব। কুঁচকি হইতে হাঁটু পর্য্যন্তকে উরু, এবং হাঁটু হইতে পায়ের পাতার উপরকার সন্ধি পর্য্যন্তকে (foreleg) পদাগ্র বলিব।

প্রতিপন্ন করিয়াছি। হস্ত ও পদ যে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবশ্যক অনুসারে যে জীব যে ভাবে হস্ত এবং পদের ব্যবহার করিয়াছে, হস্ত এবং পদও সেইভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এক্ষণে হস্ত ও পদের অবস্থার একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাউক। সর্ব্বাগ্রে হস্তের দৈর্ঘ্যের বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, উহা ক্রমশঃ খর্ব্ব হইতেছে। বানরাদির দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অসভ্য মানবের হস্তের দৈর্ঘ্য অল্প; এবং অসভ্য মানবের অপেক্ষা সভ্য মানবের হস্তের দৈর্ঘ্য আরও অল্প। সুতরাং হস্তের অস্থি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া আসিতেছে। তবে মানব এক্ষণে নানা কার্য্যে হস্তের ব্যবহার করিতেছে, অতএব একবারে হস্ত-লোপের আশঙ্কা নাই। বরং কেবল এই কারণের প্রতি লক্ষ্য করিলে বলা যাইতে পারে যে, হস্ত কালক্রমে আরও উন্নত হইবে। কিন্তু কেবল এই কারণে নির্ভর করাও অসম্ভব। অন্য কারণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হস্তের অবস্থান এখন পূর্ব্বের মত নাই। হস্ত পূর্ব্বে মস্তকের নিকটবর্ত্তী ছিল; এখন ক্রমে দূরবর্ত্তী হইতেছে। কথাটা এইরূপ:—মেরুদণ্ড মস্তকের নিম্নদেশ হইতে গুহের ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত স্থিত। উহা ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডাস্থি সকলের সমষ্টিমাত্র। এখন মেরুদণ্ডের যে ভাগ বক্ষ ও পৃষ্ঠের সহিত সংযুক্ত, সেই ভাগ হইতে দক্ষিণে ও বামে কতকগুলি পঞ্জর (ribs) বাহির হইয়া বক্ষোগহ্বরকে (thorax) আবৃত করিয়াছে। এই পঞ্জর সকলের সংখ্যা পূর্ব্বে অধিক ছিল।* এক্ষণে স্কন্ধের ঊর্দ্ধভাগে আর পঞ্জর নাই। কিন্তু পূর্ব্বে ছিল। মেরুদণ্ডের যে ভাগ স্কন্ধ হইতে মস্তকের অধোভাগ পর্য্যন্ত বিদ্যমান, তাহারও দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে পঞ্জরাস্থি বাহির হইত। সুতরাং গলা এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে ছোট ছিল; হস্তমূল উপরে ছিল; সুতরাং হস্তও এখন যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছে, তখন তাহার একটু ঊর্দ্ধ হইতে, অর্থাৎ মস্তকের নিকটবর্ত্তী দেশ হইতে বাহির হইত। এক্ষণে আর মেরুদণ্ডের ঐ ভাগ হইতে পঞ্জর বাহির হয় না। স্কন্ধ ও মস্তকের মধ্যভাগে মেরুদণ্ডের যে সকল খণ্ডাস্থি আছে, তাহারা পঞ্জরশূন্য। সুতরাং স্কন্ধ নীচে নামিয়াছে, এবং গলা বড় হইয়াছে। হস্তও বাধ্য হইয়া নীচে নামিয়াছে। † পঞ্জরাস্থির ক্রমে আরও ধ্বংস হইবে। এখনকার প্রথম,

---

* Structure of Man. p. 41, 42.

† Structure of Man. p. 94.

দ্বিতীয়,তৃতীয় ইত্যাদি পঞ্জরাস্থির যতই ধ্বংস হইবে,* স্কন্ধও তত নীচে নামিবে; হস্তও ততই নীচে হইতে বাহির হইবে। অবশেষে আর পঞ্জরাস্থিও থাকিবে না, স্কন্ধদেশও থাকিবে না, বুক পিঠও থাকিবে না, হস্তও থাকিবে না। কি সর্ব্বনাশ! এ কল্পনাকে দূরতর ভবিষ্যতে লইয়া যাইবার ভার আমি সম্পাদক মহাশয়ের বর্ত্তমান স্কন্ধে স্থাপন করিয়া নিজে নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছা করি।

যাহা হউক, প্রকৃতপক্ষে পরিণামে এইরূপ দেহ-হীন অবস্থাই যে আমাদের ঘটিবে, তাহার বহু অন্তরায় আছে। তবে যদি এই জরা-ব্যাধি-মন্দির স্থূল-দেহ অতীব দূর ভবিষ্যতে লুপ্ত হয়, তাহা হইলে কোনও দুঃখের কারণ নাই। কিন্তু সে বিষয়ে যেরূপ কল্পনাই সঙ্গত হউক না কেন, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, হস্ত পূর্ব্বে মানবদেহের যে স্থান হইতে বাহির হইত, তাহা মস্তকের নিকটবর্ত্তী ছিল; স্কন্ধ আর একটু উপরে ছিল। কালক্রমে হস্ত নীচে নামিয়া আসিয়া মস্তক হইতে একটু ব্যবধানে গিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, স্কন্ধের উপরকার পঞ্জরাস্থির লোপ।

তাহার পর হস্তাগ্রের দুই খণ্ড অস্থি কি ভাবে ছিল, এবং এখন কি ভাবে আছে, তাহা দেখা যাউক। উপরে বলিয়াছি যে, মৎস্যের ডানা আমাদিগের হস্ত ও পদের পূর্ব্ববর্ত্তী। ডানা-অবস্থায় উহারা শরীরের দৈর্ঘ্যের সহিত প্রায় সমকোণে বাহির হইয়াছিল। ক্রমে যতই হস্ত ও পদের আকৃতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, ততই মস্তক হইতে দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল। পরে ঐ দৈর্ঘ্যের সহিত প্রায় সমান্তরাল-ভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহার ফলে যে দিক মস্তকের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহা দূরবর্ত্তী হইয়াছে। সুতরাং ডানা অবস্থা হইতে ক্রমে প্রায় একটী সমকোণপরিমাণে বাহিরের দিকে হস্ত ঘুরিয়া গিয়াছে। তবেই দেখা গেল-যে, হস্ত দৈর্ঘ্যে বড় ছিল, ছোট হইয়াছে; দেহের সমকোণে বাহির হইত, সমান্তরালভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; মস্তকের নিকটবর্ত্তী ছিল, ক্রমে দূরে অর্থাৎ নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে। আর শিরা পেশী সকলও পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ও অসংলগ্ন হইয়াছে। *এই অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিলে, ইহার পরিণাম বুঝিতে বিশেষ কল্পনাশক্তি আবশ্যক হয় না।

এক্ষণে পদের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা দেখা যাউক। হস্ত দৈর্ঘ্যে খর্ব্ব হইলে অপেক্ষাকৃত সহজে ধরা পড়ে; পদের খর্ব্বতা তত সহজে ধরা পড়ে না। কিন্তু যখন মনে করি যে, হস্তাগ্রের ন্যায় পদাগ্রের দুইখণ্ড অস্থিও পাশা-

* Structure of Man. p. 43.

পাশি ছিল, এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় চতুষ্পদ-অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর দেহভার পদাগ্রের উপর পতিত হইয়াছে, তখন স্বাভাবতঃই মনে হয় যে, পদাগ্রের অস্থিদ্বয় অবশ্যই অনেক পরিবর্ত্তিত হইবার কারণ আছে। প্রকৃতপক্ষেও, এই দুই খণ্ড অস্থির এক খণ্ড (tibia) যত অধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, দেহের আর কোনও অস্থিই তদ্রূপ হয় নাই। এই অস্থিখণ্ড উরু-অস্থির (femur) ঠিক নীচে ছিল না; একটু পার্শ্বে সরিয়া ছিল। কিন্তু দেহের দিকে আসায় এক্ষণে ঠিক উরু-অস্থির নীচে আসিয়াছে, এবং দেহের প্রায় সমস্ত ভার এই অস্থিকেই বহন করিতে হইতেছে। তাহার পর অপর অস্থিটীর কার্য্য অনেক কমিয়া গিয়াছে; এবং তাহার ফলে ক্রমে উক্ত অস্থি দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, এবং প্রথমোক্ত অস্থি (tibia) দেহের চাপে অধিকতর খর্ব্ব ও চাপা-লাগা-মত (compressed) হইয়া যাইতেছে। তবেই পদও ক্ষুদ্র ও পিষ্ট-বৎ হইল, উহার অস্থির আভ্যন্তরিক গঠনও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কতিপয় শিরা ও পেশী সকল নীচের সংযোগস্থান ছাড়িয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে, এবং অকর্ম্মা হইতেছে, ইহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি। এখন ইহার ভবিষ্যৎচিন্তা করা কঠিন হইবে না।

তাহার উপর আর এক বিষম সমস্যা উপস্থিত! পদের অবস্থান এখন পূর্ব্বের মত নাই। যেমন হস্ত ক্রমে নীচের দিকে নামিতেছে, তেমনই পদও উপরের দিকে উঠিতেছে। পদের দুরাকাঙ্ক্ষা মস্তকের দিকে উঠা। * হস্তের নিম্নগতি ও পদের উর্দ্ধগতি। † সুতরাং তৎসম্পর্কীয় শিরা, স্নায়ু ও পেশী সকলেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই সকল কারণে কালক্রমে গুরুতর ফলের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। যাহা হউক, এই দ্বিবিধ গতিরই আর অধিক অগ্রসর হইবার এখনও অনেক বিঘ্ন আছে। নতুবা কালক্রমে আমরা কি আকার প্রাপ্ত হইব, তাহা চিন্তা করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! কিন্তু এ কথা ধ্রুব সত্য যে, পদও পূর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্ব হইয়াছে, এবং মস্তকের দিকে উঠিয়াছে। যাহা হউক, হস্ত, পদ ও তৎসংলগ্ন অঙ্গুলি সকলের দুরবস্থা একরূপ বুঝিতে পারা যাইতেছে। এক্ষণে মানবদেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে, এবং পরিণামে সমগ্র দেহেরই বা কিরূপ অবস্থান্তর সম্ভব, তাহা ক্রমে দেখিবার চেষ্টা করিব।

---

* Structure of Man. p. 94. 95.

† যেন ঠিক আমাদের বর্ত্তমান সমাজ!

মানবদেহের পরিণতি।

এই প্রাচীন ধরা মানবের বাসোপযোগিনী হইতে বহু ত্যাগস্বীকার করিয়াছে। ইহার সেই জলন্ত অঙ্কে মানবের স্থান হয় নাই। তৎপরে ইহার গভীর জলপ্লাবিত পৃষ্ঠেও মানবের যোগ্য স্থান কুত্রাপি বিদ্যমান ছিল না। তাহার পর ইহার ভয়ঙ্কর অত্যুচ্চ নিবিড় জঙ্গল-কণ্টকিত দেহেও মানবকে স্থান দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ঐ সকল যুগে ধরিত্রী মানবের অভ্যর্থনা করিতে সক্ষম হইতেন না। তাঁহার উর্দ্ধাধঃ-বেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলও মানবকে মুহূর্ত্তকালের জন্য রক্ষা করিতে পারিত না। সেই অঙ্গার, অম্ল, ক্ষার ও লবণাদিতে পূর্ণ ঘন বায়ু অচিরেই তাহার মানবলীলা শেষ করিয়া দিত। ঐ সকল পদার্থ বায়ুমণ্ডল হইতে পরিত্যক্ত হইয়া, তাহাকে পরিষ্কৃত ও অম্লজানবহুল না করিলে, মানব কখনই জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইত না। তাই ধরিত্রী বহুযুগ ধরিয়া ক্রমে বহু ত্যাগস্বীকার করিয়া, সুন্দর পরিচ্ছন্ন নাতিশীতোষ্ণ আবাস রচনা করিবার পর মানবকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু মানবের এই দেবমূর্ত্তি একদিনে গঠিত হয় নাই। মানবদেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকোষের সমষ্টিমাত্র হইলেও, সেই ক্ষুদ্র কোষ বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কথায় বলে, "লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে মানবজন্ম লাভ হয়।" আমরাও এ স্থলে মানবদেহের অভিব্যক্তি স্বীকার করিয়া লইতেছি। এ প্রবন্ধে যে সকল বিষয় আখ্যাত হইবে, তাহা ঐ অভিব্যক্তিবাদেরই একাংশমাত্র।

পার্শ্বের ১ চিহ্নিত বৃত্তটি একটি জীবকোষ। উহার বহিরাবরণ জীবৰস্তুতে (Protoplasm) গঠিত। উহার অভ্যন্তরেও বিন্দু বিন্দু জীববস্তু তরল পদার্থে ভাসমান অবস্থায় অবস্থিত করিতেছে। ঐ বিন্দু বিন্দু জীববস্তু স্থানে স্থানে অপেক্ষাকৃত ঘন ও পুঞ্জীকৃত। এই ঘন স্থান বৃত্তাকার। উহার কেন্দ্রকে আমরা কেন্দ্র-বিন্দু নামে অভিহিত করিলাম।

১ চিহ্নিত কোষের মধ্যে যে একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত দেখা যাইতেছে, উহাই ২ চিহ্নিত বৃত্ত। জীববিন্দু ও জীবকোষ কুঞ্চন-প্রসারণ-শক্তি-যুক্ত। এই শক্তিই জীব-কোষের জীবন। যে তরল পদার্থে জীববিন্দু ভাসমান থাকে, উহাতেই বিন্দু সকলের দেহপোষণ হয়। জীবকোষ একাধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি করে। ৩ ও ৪ চিহ্নিত চিত্রে এই বিভাগক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অতি সহজ ও আদিম জীবকোষেই. প্রথমজ (Protozoa) জীবগণের দেহ গঠিত। পরে ক্রমে জীব যতই উন্নত হয়, ততই জীবকোষের বহিরাচরণের মধ্যে আর দুইটি ঐক-কেন্দ্রিক আবরণ প্রস্তুত হয়। ইহা জীববিন্দু সকলের চক্রাকারে ঘনীভূত হইবার ফল। এই আবরণত্রয়কে কেন্দ্রাবরণ, মধ্যাবরণ ও বহিরাবরণ বলা যায়। ইহাদিগকে ইংরাজীতে Hypoblast, Mesoblast ও Epiblast বলে। জীব যতই উচ্চশ্রেণীতে অভিব্যক্ত হয়, ততই দেখা যায় যে, বহিরাবরণ হইতে ত্বক্, লোম, কেশ ও নখাদি উৎপন্ন হয়; মধ্যাবরণ হইতে আভ্যন্তরিক শারীর-যন্ত্র সকল ও কেন্দ্রাবরণ হইতে অস্থি, কোমলাস্থি, (Cartilege), শিরা ও পেশী সকল সঞ্জাত হয়। এইরূপে ক্ষুদ্র জীবকোষ ক্রমে বিভক্ত ও পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে, প্রথমজ অবধি মানব পর্য্যন্ত সমস্তই গঠিত হইয়াছে। এই জীব-কোষকেই আমরা এ স্থলে মৌলিক স্বীকার করিলাম। ইহা কিরূপে উৎপন্ন হইল, সে আলোচনা এ স্থলে প্রাসঙ্গিক হইবে না।

নিম্নতম জীব একটি জীবকোষমাত্র। পরে ঐ কোষ বহুধা বিভক্ত হইয়া কতিপয় কোষ সঞ্জাত হয়; এবং তাহারই সমষ্টিতে সম-কৌষিক জীবগণ উৎপন্ন হইয়াছে। পরে যখন ঐ কোষের এক আবরণের অভ্যন্তরে আরও দুইটি আবরণ উদ্ভূত হইল, তখন অস্থি, মাংস, শিরা, পেশী ইত্যাদি গঠিত হইয়া, পরিণামে বিভিন্নকৌষিক মানবদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সহিত তুলনায় মানব অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কখনও বা ক্ষতিগ্রস্ত, কখনও বা লাভবান্ হইতে হইতে, এক্ষণে এই পরমবিস্ময়কর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাই কি শেষ পরিণতি? যে পরিবর্ত্তনস্রোত যুগযুগান্তর হইতে বহিয়া আসিতেছে, তাহা কি এই স্থানে আসিয়াই অকস্মাৎ রুদ্ধ হইল? ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। মানবদেহ আমাদের সমক্ষেই অদ্যাপি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের গতি সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে, বিস্ময়ে অভিভূত ও আনন্দে পরিপ্লাবিত হইতে হয়। আমি দৈনিক, বার্ষিক, কি সপ্তবার্ষিক পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছি না। সে পরিবর্ত্তনে মূল ঠিক থাকে। কিন্তু আমি অদ্য আপনাদিগের সমক্ষে

যে পরিবর্ত্তনের কথা উপস্থিত করিতেছি, তাহা মৌলিক। তাহার ফলে, এই স্থূল দেহ সুদূর ভবিষ্যতে আদৌ বিদ্যমান থাকিবে কি না, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। আমি একে একে কতিপয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা আলোচনা করিব। আশা করি, আমার অক্ষমতা মার্জ্জনা করিয়া আপনারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন।

প্রথমতঃ, হস্ত ও পদের অগ্রভাগের, অর্থাৎ অঙ্গুলির কথা বিবেচনা করুন। এ বিষয়ে আমি গত বৈশাখ মাসের "সাহিত্য" পত্রে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এ স্থলে বক্তব্য বিষয়টি অন্যভাবে দেখিতে হইতেছে।

হস্ত ও পদ

আমাদিগের অব্যবহিত নিম্নতর জীবগণের * পদাঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীর সহিত সূক্ষ্ম কোণে, এবং কিছু দূরে অবস্থিত। যেমন আমাদিগের হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর অবস্থান, তাহাদিগের পদের ঐ দুই অঙ্গুলিরও তদ্রূপ। কিন্তু আমাদিগের পদের অঙ্গুলি তর্জ্জনীর একবারে সন্নিহিত,তাহার সহিত সমান্তরালভাবে স্থিত। বানরগণের পদাঙ্গুলি সকল বিশেষ কার্য্যক্ষম ; অর্থাৎ, বস্তুগ্রহণকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের পদাঙ্গুলি সকল ঐ কার্য্যের (প্রায়) অনুপযোগী হইয়াছে। উহাদিগের শিরা ও পেশী সকল (প্রায়)অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, কোনটি বা ক্ষীণ, কোনটি বা অঙ্গুলিমূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খর্ব্ব ও দুর্ব্বল হইয়াছে। সুতরাং বানরগণের ন্যায় আমরা আর পদাঙ্গুলিসঞ্চালনে কিংবা কার্য্যে ব্যবহার করিতে সক্ষম হই না। ব্যবহার গেলেই সে অঙ্গ ক্রমে ক্রমে লোপ পাইবার সূত্রপাত হয়, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। পদের ও হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং অন্যান্য অঙ্গুলির বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য অঙ্গুলিগুলির সন্ধিও তিন-তিনটি, পর্ব্বও তিন-তিনটি। কিন্তু বৃদ্ধের সন্ধি ও পর্ব্ব দুই দুইটি মাত্র। আর একটি কি হইল ? অতিপূর্ব্বে জীবরাজ্যে এরূপ ছিল না। আমাদিগের এরূপ কেন হইল ? বৃদ্ধের দুর্ভাগ্যবশতঃ একটী পর্ব্ব, সুতরাং সন্ধি হারাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহার ক্ষতিপূরণের জন্য প্রকৃতি তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত স্থূল করিয়া তুলিয়াছে বটে, কিন্তু মানবজীবনে পদাঙ্গুলির ব্যবহার কমিয়া যাওয়ায়, তাঁহার কার্য্যক্ষমতা আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি কখনও কখনও দ্বিখণ্ডিত হইয়া থাকে ; কখনও বা বৃদ্ধের নিকটে ও নিম্নে আর একটি ছোট বৃদ্ধ উৎপন্ন হয়। ইহাতেও বৃদ্ধের বলক্ষয় হয়, এবং তাহাকে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করে। হস্তপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী, অথবা কনিষ্ঠা-

---

* বানর, সিম্পাঞ্জি, গরিলা প্রভৃতি।

ও অনামিকা কখনও কখনও এক ত্বকে আবদ্ধ, কিংবা যুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতেও অঙ্গুলিগুলির স্বাধীন ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া পরায়ত্ত হয়।

এক্ষণে অঙ্গুলি সকলের খণ্ডাস্থি-(Phalanges)-গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করুন। উহাদিগের মধ্যভাগ ক্ষীণ ও শীর্ণ। সকল অঙ্গুলিরই অগ্রভাগের খণ্ডাস্থি অতি ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র। দেখিলে মনে হয়, যেন খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। তাহা হইলে, সকল অঙ্গুলিই বৃদ্ধের ন্যায় দুই সন্ধি ও পর্ব্বযুক্ত হইবে। পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলির তিনখানি খণ্ডাস্থিই এত ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ যে, প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। উহার নড়াচড়ারও শক্তি নাই। অনামিকাও প্রায় তদ্রূপ সঙ্কটাপন্ন।

অঙ্গুলিগুলির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, উহারা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ডাক্তার Wedersheim বলেন যে, কালে হয় ত পদের দুইটীমাত্র দ্বি-পর্ব্ব অঙ্গুলি থাকিতে পারে।* আমার মনে হয় যে, কেবল তর্জ্জনীমাত্রই বা থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাও নিশ্চিত বলা যায় না। এই দুর্দ্দশার মূল কারণ এই যে,বানরগণের ন্যায় আমরা পদাঙ্গুলি সকলকে বস্তুগ্রহণ কার্য্যে আর ব্যবহার করি না। সুতরাং ব্যবহার কমিয়া যাওয়াতেই উহারা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু হস্তের অঙ্গুলি সকলের সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না যে, উহাদেরও কালে ধ্বংস হইবে। কারণ, উহাদিগের ব্যবহার তত কমে নাই। যাহা কিছু কমিয়াছে, তাহাতে উহাদিগের নাশের আশঙ্কা করা সঙ্গত হইবে না। কিন্তু তাহাই বা সম্পূর্ণ সাহস করিয়া কিরূপে বলিব? দেখুন, পক্ষীদিগের অঙ্গুলিতে এক এক খণ্ড দীর্ঘ ও গোটা অস্থি; আর আমাদিগের তিন খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুক্‌রা মাত্র। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাস্থি সকলও ক্রমে ক্ষুদ্রতর ও ক্ষীণতর হইতেছে; মধ্যভাগ শীর্ণ হইতে হইতে প্রায় খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। পেশীগুলি আর তেমন কাজ করে না। বৃদ্ধ যিনি, তিনি একাংশ হারাইয়াছেন। কনিষ্ঠ অতীব সঙ্কটাপন্ন। সুতরাং কালে ইহাদিগের ধ্বংসের আশঙ্কাও অমূলক নহে।

---

* It might therefore be predicted of the human foot that it might end by possessing only two, two-jointed toes, the great toe and its neighbour. Structure of Man. p. 90.

এক্ষণে হস্ত ও পদের বিষয় আলোচনা করিব। ইহাদিগের কুর্চিনামা এইরূপ।—

বহিরাবরণ (Epiblast)

স্থায়ী ও অস্থায়ী। পদ অথবা কর, যাহা বলুন।

|

ডানা ও ফড়ে (rays)

|

পাখা ও পদ (অগ্রপদ = হস্ত; পশ্চাৎপদ = পদ)।

পার্শ্বে যে প্রথমজ * জীবটির চিত্র দেওয়া গেল, উহার বহিরাবরণ স্থানে স্থানে বাহির হইয়া গিয়াছে। ঐ বহির্গত অংশ অস্থায়ী; উহা আবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; এবং অন্য স্থান হইতে ঐরূপ অংশ বহির্গত হয়। তদ্দ্বারা ঐ জীব আহার অন্বেষণ করে, এবং পাইলেই তৎসহ দেহ মধ্যে চলিয়া যায়। আবার এইরূপ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে হইতেই ঐ জীব এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়। সুতরাং বহিরাবরণের যে সকল স্থান বাহির হইয়াছে, উহাদিগকে হস্ত অথবা পদ, উভয় নামই দেওয়া যাইতে পারে। আবার ইহাদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত সিলেণ্টেরেটা (Coelenterata) শ্রেণীস্থ জীবগণের দেহ হইতে ঐরূপ অংশ যাহা বাহির হয়, তাহা আর দেহমধ্যে প্রবেশ করে না; সুতরাং তাহাকে স্থায়ী বলা যায়। তা'র পর দ্বিতীয় অবস্থা ডানা। মৎস্যগণের ডানা

দেহের সহিত সমকোণে বাহির হয়। এক জোড়া ডানা মস্তকের নিকট, আর এক জোড়া ডানা পিছনের দিকে। এই ডানার অস্থির অগ্রভাগ হইতে কতিপয় ফড়ে বাহির হয়। ক্রমে উহা সূক্ষ্মাগ্র চ্যাপটা কোমলাস্থিতে পরিণত হয়। সেই কোমলাস্থি ক্রমে (কঠিন) অস্থিতে পরিণত হইতে, কতকগুলি লোপ হয়, আর কতকগুলি একত্রিত হইয়া থাকে। এইরূপে ফড়ে কালক্রমে দুইখণ্ড মোটা অস্থিতে পরিণত হয়। ইহাই আমাদিগের অগ্রহস্তের (arm) ও পদযষ্টির (leg) দুই দুই খণ্ড অস্থি। আর সেই ডানার গোড়ার অস্থি, যাহা
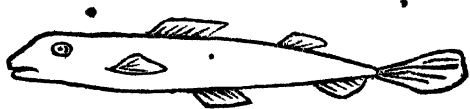
---

* Protozoa.

মৎস্যাদির দেহলগ্ন, তাহাই আমাদিগের বাহুর ও জঙ্ঘার এক এক খণ্ড অস্থিতে পরিণত হইয়াছে। উপরের চিত্রিত মৎস্তের একটি ডানা ও ফড়ে বড় করিয়া অঙ্কিত করিয়া ১।২।৩।৪।৫ চিহ্ন দেওয়া গেল।

ক্রমে ডানার অস্থি মোটা হইয়া ৫—এর ন্যায় হইল এবং ফড়েগুলি ১।২ হইতে ৪ পর্য্যন্ত যেরূপ আকৃতি, ঐরূপ হইল। কালে ঐফড়ের কোমলাস্থি সকল দৃঢ় অস্থিতে পরিণত ও স্থূল হইল। এই প্রকার হইতে কতকগুলি ফড়ে একত্রিত ও কতকগুলি পরিত্যক্ত হইল। মনে করুন ক খ লাইনের ঊর্দ্ধাংশ পরিত্যক্ত হইয়া গেল। তাহার ফল এই হইল যে, ৫ চিহ্নিত খণ্ডের সহিত কেবল ১ চিহ্নিত দুই খণ্ড অস্থি থাকিল, তাহাই ক খ চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।
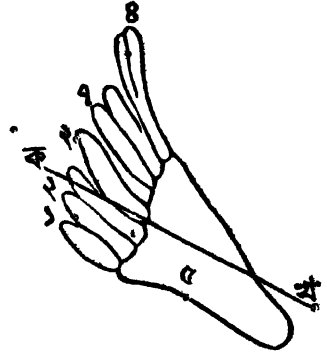
খ-এর অগ্রভাগে অর্থাৎ ১ চিহ্নিত অস্থিদ্বয়ে ত্বক্‌-বৃদ্ধির ন্যায় বোধ হইতেছে। পরিশেষে উহা গ চিত্রের ন্যায় হইল। তাহাতে
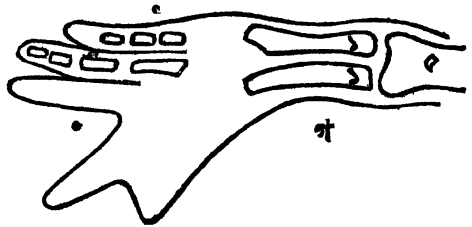
অগ্রভাগে অর্থাৎ অঙ্গুলিগুলিতে খণ্ডাস্থি হইয়াছে। অনামিকাতে ৪ খানি খণ্ডাস্থি দেখিবেন। ইহা একটী সরীসৃপের হাত। দেহলগ্ন অংশে একটি অস্থি, এবং তন্নিম্নে দুইটি অস্থি। ইহা এক্ষণে উচ্চশ্রেণীস্থ জীবগণের হস্ত ও পদের সাধারণ গঠন। ফড়ের সংখ্যা বহু ছিল, তাহা কমিয়া গিয়া দুই-এ পরিণত হইল; কেবল ক্ষতিপূরণস্বরূপ উহারা কঠিন ও মোটা হইল। এইরূপে লোপ ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া জীব-রাজ্যে হস্ত ও পদ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ডানা, দেহ হইতে সমকোণে বাহির হইয়াছিল। হস্ত ও পদ সহজ অবস্থায় সমান্তরালভাবে থাকে। এক্ষণে সুতরাং উহারা মানবদেহে পূর্ব্বাপেক্ষা

প্রায় ৯০ ডিগ্রী দেহের দিকে সরিয়া আসিতেছে। এই ব্যাপার সংস্থাবস্থা হইতেই সাধিত হইতেছে। কিন্তু যখন ডানা হস্ত পদ রূপে পরিণত হইল, তখন হইতে এ পর্য্যন্ত উহাদিগের দৈর্ঘ্য ও অবস্থান কি এক ভাবেই আছে? তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। শুধু যদি নরবানর শ্রেণীই বিবেচনা করেন, তাহা হইলেও দেখিতে পাইবেন যে, হস্ত ও পদের দৈর্ঘ্যের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উহারা পূর্ব্বের ন্যায় লম্বা নাই, অনেক খর্ব্ব হইয়াছে। নরগণের মধ্যেই কাহারও কাহারও হস্ত ও পদ অত্যন্ত ছোট অথবা বড় হইয়া থাকে। যে অঙ্গ এইরূপ অস্থায়ী ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হইতেছে, সন্দেহ নাই। পদের Tibia নামক অস্থিখানি সমস্ত অস্থি অপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উহা জঙ্ঘাস্থির সহিত এক লাইনে ছিল না; পূর্ব্বোক্ত মতে সরিয়া আসিয়া তাহার ঠিক নীচে আসিয়াছে। তজ্জন্য দণ্ডায়মান অবস্থায় দেহের সমস্ত ভার প্রায় উহাকেই বহন করিতে হয়। কাজেই উহা যেন চাপালাগা মত হইয়া ছোট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু পদের দেহ বহন ও ভ্রমণ কার্য্যের আবশ্যকতা বশতঃ পদযষ্টির উপরভাগের পেশী শক্ত, বলিষ্ঠ ও স্থূল হইয়াছে। বাহুর পেশীও ব্যবহারবশতঃই ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু হস্ত ও পদের অবস্থানের পর্য্যালোচনা করিলে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। হস্ত এখন আমরা কোথায় দেখিতেছি? স্কন্ধ প্রদেশ হইতে। অর্থাৎ যে স্থান হইতে বর্ত্তমান প্রথম পঞ্জর বাহির হইয়াছে, তাহার উপরেই স্কন্ধ, তৎসংলগ্নই বাহুমূল। পৃষ্ঠবংশ মস্তকের নীচ হইতে আরম্ভ হইয়া পায়ু পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। মস্তকের নীচেই গ্রীবাদেশ, উহাতে (এখন) পঞ্জর নাই। গ্রীবার নিম্নভাগ হইতে পৃষ্ঠবংশের দুইদিকে পঞ্জর বাহির হইয়া পীঠ হইতে বুকের দিকে আসিয়াছে, তাহাতেই বক্ষঃগহ্বর গঠিত হইয়াছে। এই সকল পঞ্জর, সংখ্যায় দ্বাদশটি। ইহাদিগের মধ্যে সকলের উপরকার পঞ্জর, যাহাকে বর্ত্তমান প্রথম পঞ্জর বলা যাইতে পারে, তাহার উপরেই স্কন্ধ এবং তৎসংলগ্ন বাহু। গ্রীবা প্রদেশে পৃষ্ঠবংশ হইতে এখন প্রায় পঞ্জর বাহির হয় না; কিন্তু পূর্ব্বে এ প্রদেশেও পঞ্জর ছিল, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। তাহা হইলে প্রথম পঞ্জর পূর্ব্বে বর্ত্তমানকাল অপেক্ষা উপরে ছিল; সুতরাং স্কন্ধও উপরে ছিল, বাহুমূলও উপরে ছিল। কালক্রমে বাহুদ্বয় নীচে নামিয়া আসিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে যে, গ্রীবাদেশে, বর্ত্তমান পঞ্জর সংস্থানের ঊর্দ্ধে, আরও পঞ্জর থাকার প্রমাণ কি?

পৃষ্ঠবংশে সর্ব্বসমেত ৩৩ খানি খণ্ডাস্থি (vertebræ) আছে। উহার উপরের ৭ খানি গ্রীবাদেশের মধ্যে আছে। (৮ম) অষ্টম খণ্ডাস্থি হইতে দুই দিকে যে পঞ্জর বাহির হইয়াছে, তাহাই বর্ত্তমান প্রথম পঞ্জর। ইহার উপরে, অর্থাৎ পৃষ্ঠবংশের প্রথম সাতখানি খণ্ডাস্থিতে,আর এখন কাহারও পঞ্জর দেখা যায় না কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিৎ (P. Albrecht)সাহেব এক জন ব্যক্তির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার (৭ম) সপ্তম খণ্ডাস্থিতে পঞ্জর ছিল। তবেই এখনকার প্রথম খণ্ডাস্থির উপরের একখানিতেও পঞ্জর থাকা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু প্রথম খণ্ডাস্থি হইতে ষষ্ঠ খণ্ডাস্থি পর্য্যন্ত যে ছয়খানি খণ্ডাস্থি আছে, তাহার আকৃতি দেখিলেই সহজেই অনুমান হইবে যে, উহাদিগের পূর্ব্বে পঞ্জর ছিল। ঙ চিহ্নিত চিত্রে দেখিবেন যে, দুই দিকে দুই খণ্ড লম্বা কোমলাস্থি বাহির হইয়া আসিয়াছে। উহাই অতীত পঞ্জরের মূল-ভাগ। অতীত পঞ্জর সম্ভবতঃ যে ভাবে ছিল, তাহা বিন্দু বিন্দু লাইনের দ্বারা প্রদর্শিত হইল। ঐ ভাবে ঘুরিয়া গ্রীবাদেশ হইতে কণ্ঠের দিকে আসিত। কালক্রমে উহাদিগের বিন্দু বিন্দু ভাগ ক্ষয় হইয়া মূলভাগমাত্র আছে। এই অবস্থা ষষ্ঠ খণ্ডাস্থিতে বিলক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু আর ৫ খানি খণ্ডাস্থিতে যদিও এই অবস্থা স্পষ্ট দেখা যায় না, তথাপি খণ্ডাস্থিগুলির দুই দিকে পূর্ব্বচিহ্ন অনেকাংশে বুঝিবার উপায় আছে। তবেই গ্রীবাদেশ হইতে কণ্ঠের দিকেও প্রাচীনকালে পঞ্জর বিদ্যমান ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে। উহারা গ্রীবাস্থ সাতখানি খণ্ডাস্থি হইতে বাহির হইত। সুতরাং পৃষ্ঠবংশের প্রথম খণ্ডাস্থি সংলগ্ন পঞ্জর, আরও প্রায় পাঁচ অঙ্গুলি উপরে ছিল ; কাজেই স্কন্ধও উপরে ছিল ; বাহুমূলও উপরে ছিল ; এক্ষণে বাহু ঐ পরিমাণ নীচের দিকে নামিয়া আসিয়াছে ! কিন্তু আরও কি নীচে নামিবে ? গ্রীবাভাগ আদৌ ছিল না ; এখন যদি বা কিঞ্চিৎ
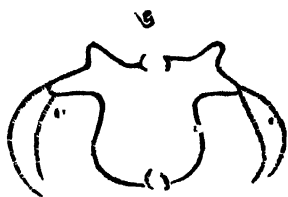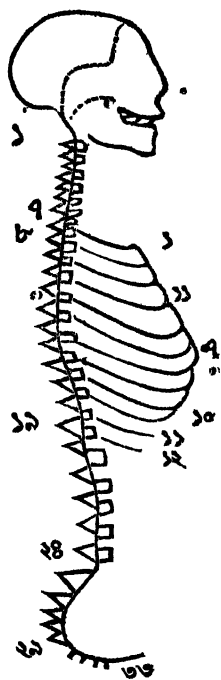
হইয়াছে, আরও কি লম্বা হইবে? কারণ, পঞ্জর আরও নীচে নামিলেই ঐ ফল অনিবার্য্য। এ প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যায় যে, আধও কিছু নামিবে। বেশীও নামিতে পারে। কিন্তু কিছু না কিছু নিশ্চয়ই নামিবে। * পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বর্ত্তমান প্রথম পঞ্জর পৃষ্ঠবংশের অষ্টম খণ্ডাস্থি হইতে বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই পঞ্জর এখন কাহারও ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেখা যায়। প্রাণীতত্ত্ববিৎ Struthers Grosse, Turner প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কোন কোন ব্যক্তির অষ্টম খণ্ডাস্থি লগ্ন বর্ত্তমান প্রথম পঞ্জরের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। † সুতরাং বর্ত্তমান প্রথম পঞ্জর যখন ইহারই মধ্যে বিকৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন উহার আর কোনও আশা করা যায় না। উহা যে ভবিষ্যতে ধ্বংস হইবে, তাহা নিশ্চিত। তাহা হইলে পৃষ্ঠবংশের নবম খণ্ডাস্থি হইতে প্রথম পঞ্জর বাহির হইবে। সুতরাং স্কন্ধ ও বাহুমূল, সুতরাং বাহুও একটু নীচে নামিবে। এইরূপে অন্যান্য পঞ্জরও লুপ্ত হইতে পারে। ক্রমে এক একটী পঞ্জর লুপ্ত হইবে, আর স্কন্ধ নীচে নামিবে, গ্রীবা বড় হইবে, এবং বাহুও নীচে নামিবে। অবশেষে?—আর পঞ্জরও নাই, সুতরাং বুক পীঠও নাই, বাহুও নাই। কি সর্ব্বনাশ! আমরা কি হইতে চলিলাম! আপনারা ভীত হইবেন না, এ অবস্থাপ্রাপ্তির বহু বিলম্ব আছে। হয় ত এ অবস্থা নাও হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত শ্বাস-যন্ত্র ও হৃদ্‌পিণ্ড বক্ষোগহ্বরে বিদ্যমান আছে, সে পর্য্যন্ত পঞ্জরগুলির একেবারে লোপ হওয়া বড় একটা সম্ভবপর নহে। হস্তের বহু ব্যবহারে বক্ষের শিরাপেশী সকল সবল হইবে। আর শ্বাস-যন্ত্র ও হৃৎপিণ্ডের যে সকল স্থান পঞ্জরের সহিত সংযুক্ত আছে, অথবা পঞ্জরের সাহায্য অপেক্ষা করে, পঞ্জর লুপ্ত হইলে সেই সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবে; এবং ঐ যন্ত্রদ্বয় আর পঞ্জরের সাহায্য

---

* Ad Charpey of Tonlouse shows that the white man is evoling towards a type with nine pairs of ribs, through the disappearance of the first and the last two. Consequently the neck freed at its base will become longer and more mobile. The Lumber column will loose some of its fixity, the waist will be more flexible, the flanks more slender.

Regnault in the International for January 108, The Empire—march 6.

† The fact that in man the first thoracic rib is probably beginning to degenerate and is in the present time in process of atrophy is established by the not infrequent recurrence of undoubted cases of abortive development. Structure of Man, p 43..

পাইবে না। তাহা হইলে ঐ দুই অত্যাবশ্যক যন্ত্রের বর্ত্তমানরূপ অবস্থিতি থাকিতে পারে না। অর্থাৎ, উহারা স্থানচ্যুত হইবে। তাহা হইলে যে মানব-জীবনই যায়! সুতরাং ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে,যে পর্য্যন্ত মানবজীবন আছে সে পর্য্যন্ত পঞ্জর লুপ্ত হইতে পারে না। তবে এখনকার বক্ষোলগ্ন কয়েকটি যে লুপ্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলেই হস্ত আরও নীচে নামিল। কিন্তু অন্যান্য পঞ্জর যে নিতান্তই অক্ষয়, তাহাও বলা যায় না। যদি সেগুলিও যায়, তবে বাস্তবিক শ্বাস যন্ত্র ও হৃদ্‌পিণ্ড স্থানচ্যুত হওয়ায় মানবদেহের ও মানব-জীবনের অন্যরূপ অভিব্যক্তি হইবে, এইমাত্র।

তার পর পদের অবস্থান বিবেচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, নিম্নতম জীবগণের পশ্চাৎপদ দেহের যে ভাগ সংলগ্ন,মানবের পদ তাহা অপেক্ষা উপরের দিকে, অর্থাৎ মস্তকের দিকে উঠিয়া আসিয়াছে। পৃষ্ঠবংশের প্রায় শেষভাগ হইতে কটিদেশের আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই নিম্নভাগ হইতে আমাদের উরুর আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু নিম্নতম জীবগণের পৃষ্ঠবংশের খণ্ডাস্থি সকলের সংখ্যা (আমাদিগের) ৩৩ খানি অপেক্ষা বেশী। তাহাদিগের অনেকের কটিদেশের খণ্ডাস্থি ১১ খানি, এবং তন্নিম্নস্থ লেজভাগের (Coccygeal region) খণ্ডাস্থি ১৫ খানি। মানবের কটিদেশের খণ্ডাস্থি ১০ খানি ও লেজভাগের খণ্ডাস্থি ৪ খানি মাত্র। সুতরাং দেহের যে ভাগ হইতে তাহাদিগের উরু বাহির হইতেছে, মানবের উরু তাহা অপেক্ষা উপর হইতে বাহির হইয়াছে। তবেই দেখুন কি দুর্দ্দশা!

হস্তের গতি নীচের দিকে; * আর পদের গতি উপরের দিকে। সুতরাং হস্ত ও পদ ইহাদিগের দুইয়ের পরস্পর মিলিত হইবার চেষ্টায় গরীব মানব-জাতির কি দশা হইবে, তাহা অনায়াসেই কল্পনা করা যাইতে পারে। যাহা হউক, এই চিন্তার ভার আপনাদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া, আমি বুক ও পীঠের অবস্থার পর্য্যালোচনা করি।

হাত ও পায়ের কথা বলিতেই প্রসঙ্গক্রমে বুক ও পীঠের বিষয় কিছু বলিতে হইয়াছে। এক্ষণে আরও কয়েকটা জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইতেছে। পূর্ব্বেই

বুক ও পীঠ।

বলা হইয়াছে যে, পৃষ্ঠবংশ হইতে দুই দিকে পঞ্জর বাহির হইয়া বক্ষাস্থির (Sternum) সহিত মিলিত হইয়াই বক্ষোগহ্বর ও পৃষ্ঠের

* Whereas the shifting of the forelimb takes place from before backwards, that undergone by the hindlimb is from behind forwards, i. e. towards the head Ibid p 94—95.

রচনা করিয়াছে। অতিনিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণীরও (কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি) দেহের এক দিক উপরে, আর এক দিক নীচে থাকায়,বুক পীঠ পৃথকরূপে দেখা যায়। কিন্তু উহাদিগের অস্থি না থাকায়, বুক ও পীঠে বড় বেশী প্রভেদ নাই। ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবগণের বুক পীঠের প্রভেদ বাড়িয়াছে। পরিশেষে আমাদিগের অত্যন্ত বিভিন্নরূপ বুক ও পীঠ উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমেই মানবের ও উচ্চশ্রেণীস্থ বানরের সহিত নিম্নতর প্রাণীর বুক পীঠের আকারের এক বাহ্যিক প্রভেদ লক্ষিত হয়। আমাদিগের বুক পীঠের দৈর্ঘ্য পাশাপাশি, অর্থাৎ এক কক্ষ হইতে আর এক কক্ষ পর্য্যন্ত মাপে যতটা হয়, তাহাই দৈর্ঘ্য। এবং গলমূল হইতে বক্ষাস্থির (Sternum) শেষ পর্য্যন্ত মাপে যতটা হয়, তাহাই প্রস্থ। প্রথমোক্তটা শেষোক্ত অপেক্ষা মাপে বেশী। কিন্তু নিম্নতর প্রাণিগণের শেষোক্তটি প্রথমোক্ত অপেক্ষা মাপে বেশী। আমাদের উঠিয়া দাঁড়াইবার ফলে দেহের ভারকেন্দ্র নীচের দিকে ও পীঠের দিকে সরিয়া গিয়াছে; আর চতুষ্পদ-গণের দেহের ভারকেন্দ্র বুকের দিকে সরিয়া গিয়াছে; ইহার ফলে শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ডাদির ভার চতুষ্পদ অবস্থায় যেমন বুকের দিকের পঞ্জরকে বহন করিতে হইত, দণ্ডায়মান অবস্থায় তেমনই পীঠের দিকের পঞ্জরকে বহন করিতে হই-তেছে। তাহাতেই, অর্থাৎ ঐ যন্ত্র সকল পীঠের দিকে সরিয়া যাওয়াতে, পঞ্জর সকলেরও যেদিকে পৃষ্ঠবংশে সংলগ্ন, সেই দিক শক্ত ও সবল হইয়াছে; এবং ঐ সংযোগ দৃঢ়তর হইয়াছে। আর পঞ্জরের যে ভাগ বক্ষাস্থির দিকে, তাহার কার্য্যের ভার হ্রাস হওয়ায়, বক্ষাস্থির সহিত পঞ্জরের সংযোগ দুর্ব্বল ও নরম হইয়া যাইতেছে; এবং কোনও কোনও পঞ্জরের সংযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পৃষ্ঠবংশের (৮ম) অষ্টম খণ্ডাস্থি হইতে এক্ষণে পঞ্জর আরম্ভ হইয়াছে। আর সর্ব্ব সমষ্টিতে আমাদিগের দ্বাদশটী পঞ্জর আছে। উপরের চিত্র * হইতে দেখিবেন যে, ঐ দ্বাদশটীর মধ্যে সাতটী পঞ্জর বক্ষাস্থি সংলগ্ন। তাহাদিগের নীচের তিনখানি কোমলাস্থি দ্বারা যথাক্রমে উর্দ্ধতর পঞ্জরের সহিত সংলগ্ন। আর অবশিষ্ট দুই-
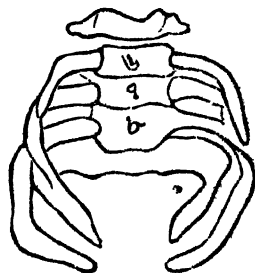
* (চ) চিত্র দেখুন।

খানি, অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ পঞ্জর বক্ষাস্থিতেও লগ্ন নহে, ঊর্দ্ধতর পঞ্জরেও যুক্ত নহে; তাহাদিগের অগ্রভাগ মুক্ত। অতি পূর্ব্বে এমন ছিল না। অদ্যাপি কোনও কোনও ব্যক্তির ও উন্নত বানরগণের অষ্টম পঞ্জর বক্ষাস্থির সহিত সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু কালক্রমে এখন অধিকাংশ স্থলেই মানবগণের সেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। প্রথম ৭টি পঞ্জরের পৃষ্ঠবংশের সংযোগ দৃঢ় এবং দৈর্ঘ্যেও তাহারা ক্রমেই বেশী, অর্থাৎ প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি, তদপেক্ষা তৃতীয়টি, এইরূপে সপ্তমটি পর্য্যন্ত পঞ্জরের দৈর্ঘ্য ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অষ্টম পঞ্জর হইতে দৈর্ঘ্য কমিতে থাকে; অবশেষে কমিতে কমিতে একাদশ ও দ্বাদশটি অতি ছোট হইয়া গিয়াছে। এই দুই পঞ্জরের দৈর্ঘ্য আবার অস্থায়ী। উহারা দুইটি কখনও একটু বড়, কখনও একটু ছোট, এইরূপ হইতেছে। যখন এইভাবে পরিবর্ত্তনের পথে পড়িতে পড়িতে অস্থায়ী দৈর্ঘ্য লাভ করিয়াছে ও ক্ষুদ্রতম হইয়াছে, তখন উহারা নিশ্চয়ই ধ্বংসের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। উহাদিগের একেবারে লোপ পাওয়া কালসাপেক্ষ মাত্র, কিন্তু নিশ্চিত। প্রথম সাতটি পঞ্জরের পৃষ্ঠবংশের সংযোগ দৃঢ়, তাহা বলাই হইয়াছে, কিন্তু অষ্টম হইতে দ্বাদশ পঞ্জর পর্য্যন্ত পাঁচখানি পঞ্জরের ঐ সংযোগ দুর্ব্বল ও বিকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অগ্রভাগ মুক্ত, অথবা বক্ষাস্থির সহিত অসংলগ্ন; পশ্চাৎভাগের সংযোগও বিকৃত হইতেছে। সুতরাং এই কয়েকখানি পঞ্জর যে অদূর ভবিষ্যতে লোপ পাইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তাহা হইলেই উদর-গহ্বর আর একটু বাড়িল। এই সর্ব্বনাশী অন্নকষ্টের দিনে উদর-গহ্বরের আয়তন-বৃদ্ধি দুশ্চিন্তার বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদিগের বর্ত্তমান দ্বাদশ পঞ্জরের নীচে চতুষ্পদগণের আরও কয়েকটি পঞ্জর আছে। আমাদিগেরও ঐ পঞ্জরের নীচে পৃষ্ঠবংশের যে সকল খণ্ডাস্থি আছে, তাহাদিগের আকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদিগের সংলগ্ন আরও পঞ্জর পুরাকালে বর্ত্তমান ছিল। দ্বাদশ পঞ্জর পৃষ্ঠবংশের উনবিংশ খণ্ডাস্থির সংলগ্ন। বিংশ খণ্ডাস্থি হইতে আর আমাদিগের পঞ্জর নাই। কিন্তু বিংশ হইতে চতুর্ব্বিংশ খণ্ডাস্থির দুই দিকেই, অর্থাৎ বুকের ও পীঠের দিকে অতি ক্ষুদ্র অস্থি বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, এইরূপ কারণে গতকালে পঞ্জরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। সুতরাং ঐ পাঁচখানি খণ্ডাস্থিতেও পূর্ব্বে পঞ্জর সংযুক্ত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তখন উদর কত ছোট ছিল? আর বুক? সে ত একেবারে মস্তক হইতে প্রায় নাভিমূল পর্য্যন্তই ছিল;

কারণ গ্রীবাপ্রদেশেও পঞ্জর থাকা উপযে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এইজন্যই চতুষ্পদগণের বক্ষ, গলা হইতে পেট পর্য্যন্ত যত বেশী লম্বা, কক্ষ হইতে কক্ষ পর্য্যন্ত তত নহে। ইহা উপরেও দেখা গিয়াছে। পঞ্জরের সংখ্যা যে পূর্ব্বে দ্বাদশটি অপেক্ষা অধিক ছিল, ইহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, মানবের ভ্রূণের ঐরূপ অদ্যাপি দেখা যায়। ভ্রূণ বড় হইলে আর ঐ অতিরিক্ত পঞ্জর সকল থাকে না।

আমরা দেখিলাম,পঞ্জরগুলি উপর হইতে লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান প্রথম পঞ্জরে, এখনই ধ্বংসের পূর্ব্বলক্ষণ অনেক সময় দেখা যাইতেছে। আর একাদশ ও দ্বাদশ পঞ্জর ধ্বংসের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং অতি দূর ভবিষ্যতে বুকেরও যে অনেক অংশ লুপ্ত হইবে, ইহা বলা যাইতে পারে। তবে উপরের দিক অপেক্ষা বুকের নীচের দিকেই পঞ্জরের ধ্বংসের গতি কিছু দ্রুততর। উপরের দিকে পঞ্জর শীঘ্র লুপ্ত হইবার যে সকল বিঘ্ন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সেই জন্যই ডাক্তার ওয়েডারশেম বলেন যে, "Should reduction at the upper end of the thorax advance, it will do far more slowly than at the lower"*

তা'র পর বক্ষাস্থির কথা। উহা নিম্ন জীবগণের এক খণ্ড ছিল। আমাদিগের বেলায় যেন ফাটিয়া তিন খণ্ড হইয়াছে। তাহার তিনটি ভাগ এখন স্পষ্টই দেখা যায়। আর নিম্নভাগে পঞ্জরের পূর্ব্ব সংযোগস্থানও যেন স্পষ্টই

বক্ষাস্থি।

বুঝা যায়। সুতরাং বক্ষাস্থিও ধ্বংসের দিকে অগ্রসর। আমাদিগের পঞ্জর কমিতেছে, বুক সুতরাং পীঠ কমিতেছে। আর সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, পৃষ্ঠবংশের খণ্ডাস্থিগুলিও সংখ্যায় কমিয়াছে। সুতরাং ইহাদিগের পরিণাম বুঝিতে আর বাকী থাকিল না।

আভ্যন্তরিক যন্ত্র; পাকস্থলী।

বুক ও পীঠের কথা বলিতে, উদর-গহ্বরের কথা বলিতে হইয়াছে। আমরা দেখিলাম যে, এই গহ্বর বাড়িতেছে; কিন্তু নিম্ন প্রাণিগণের সহিত তুলনায় মানবের পাকস্থলী ও গলনালী (œsophagus) বৃহৎ অন্ত্র,ক্ষুদ্র অন্ত্র ও নিম্ন অন্ত্র (cœcum) প্রভৃতি সকলই ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। পাকস্থলীর অভ্যন্তর যেন একাধিক অংশে বিভক্ত হইয়া একাধিক কামরা প্রস্তুত হইতেছে। পাকস্থলীর বহিরাবরণ স্থানে স্থানে সঙ্কুচিত ও খণ্ডিত হইবার সূত্রপাত দেখা যায়। তাহা হইলে এই যন্ত্রের আয়তনের হ্রাস হইবে, এবং উহার অভ্যন্তর নানা ভাগে বিভক্ত হইবে। সুতরাং প্রত্যেক ভাগ

---

* Structure of Man· p. 43.

স্বল্পায়তন হইবে। † যে সকল স্থলের সংকোচবশতঃ পাকস্থলী নানা ভাগে বিভক্ত হইতেছে, ঐ সকল স্থানের অবস্থা শ্রীযুক্ত হাউস সাহেব (G.B. Howes) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।—"There was at the constricted part a ring like specialisation of the circular musculature" এইরূপে বিভাগের সূত্রপাত হয়। একটি ভাঙ্গিয়া একাধিক হইতেছে; বৃহৎ, ক্রমে ক্ষুদ্র হইতেছে। শেষে থাকিবে ত? বিকৃত হওয়া একবার আরম্ভ হইলে, শেষ ফলের আশঙ্কা সঙ্গতরূপেই উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এই যন্ত্রটা যদি লুপ্ত হয়, অথবা গুরুতররূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমরা মানব-জন্ম হইতে উদ্ধার পাইব। এই অন্নময় কোষ, এই জরা-ব্যাধি-প্রপীড়িত স্থূলদেহ, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত হইবে। এ চিন্তা, এ কল্পনা হৃদয়কে আনন্দে মাতাইয়া তোলে। যাহা হউক, যেমন পাকস্থলীর এই অবস্থা হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, তেমনই অন্ত্রও দৈর্ঘ্যে কমিয়া আসিতেছে। চতুষ্পদদিগের, এমন কি, নিম্নশ্রেণীস্থ বানরগণের অন্ত্র অপেক্ষাও সভ্য মানবের অন্ত্র ক্ষুদ্র। সবই যেন সেই এক পরিবর্ত্তনের দিকেই যাইতেছে।

অন্ত্র।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, শ্বাস-যন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড এখন বুকের দিক হইতে পীঠের দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া আসিয়াছে। কেবল তাহাই নহে; চতুষ্পদ অবস্থায় উহারা মস্তকের নিকটবর্ত্তী ছিল; এক্ষণে কিছু নীচে নামিয়াছে। শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড যদি স্থানচ্যুত হইতে আরম্ভ করিল, তবে মানবজীবনের আর কি আশা করা যাইতে পারে?

শ্বাসযন্ত্র।
হৃৎপিণ্ড।

এই অঙ্গকে উত্তমাঙ্গ কহে। বস্তুতঃ ইহার মধ্যস্থ মস্তিষ্ক-পদার্থই মানবকে উন্নত ও মানব-নামকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। এই অঙ্গকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভ্রূযুগের ঊর্দ্ধভাগ; এবং ভ্রূযুগের অধোভাগ। ঊর্দ্ধভাগে কপাল ও মাথার খুলি, এবং অধোভাগে চক্ষু, কর্ণ, তালু, উভয়-হনু ও দন্ত আছে। প্রথমতঃ ঊর্দ্ধভাগের কথা বিবেচনা করুন। নিম্নতম জীবগণের ও বানরাদিরও মস্তকের তুলনায় কপাল অতি ছোট

মস্তক।

---

† Attention may however be drawn to the Saccus Coecus which is as it were indicative of the commencement of process of chambering in the stomach, the autrum polyricum, and a constriction.

I bid p. 165

কিন্তু মানবের কপাল, তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক বড়। মাথার খুলিও অন্য জীবগণের অপেক্ষা মানবের বড়। কিন্তু প্রকৃত মুখ-অংশ অনেক ছোট। পার্শ্বে তিনটি চিত্র অঙ্কিত হইল। ১নং চিত্র একটী হরিণের মস্তক; ২নং চিত্র একটি ওরাংওটাং, অর্থাৎ বানরের ও ৩নং চিত্র একটি মানুষের মস্তক। ১নং চিত্রের মাথার উপরিভাগ অতি ছোট; এবং মুখ-অংশ অনেক বড়, এবং সম্মুখের দিকে অনেক দূর বাহির হইয়া আসিয়াছে। ২ নং চিত্রের মাথার খুলি, অর্থাৎ উপরিভাগ, ১নং চিত্র অপেক্ষা বড়; কিন্তু মুখ-অংশ সম্মুখের দিকে অগ্রসর, এবং এই অংশই খুলি অপেক্ষা বড়। কিন্তু ৩নং চিত্রের মস্তকের খুলি অনেক বড়। মুখ-অংশের প্রায় তিনগুণ। এবং মুখ-অংশ সম্মুখের দিকে বাহির হইয়া আসে নাই। মুখ-অংশ এক ও দুই নম্বর চিত্র অপেক্ষা অনেক ছোট। এই তিনটি চিত্র মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মানবের চোয়াল ও মুখভাগ ক্রমে খর্ব্ব হইয়া ভিতরের দিকে আসিয়াছে। এই ভাগ চতুষ্পদদিগের অপেক্ষা অনেক ছোট হইয়াছে; কিন্তু মস্তকের উপর ভাগ অপরিমিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মানবের মাথার খুলি এত বড় হইবার প্রধান কারণ এই যে, তাহার মস্তিষ্ক অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এত বড় মস্তিষ্ক আবরণ করিবার জন্যই এত বড় মাথার খুলি আবশ্যক। মাথার খুলিও বড় হইয়াছে; কপালও বড় হইয়াছে। সুতরাং ভ্রূযুগের উপরের অংশ সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।
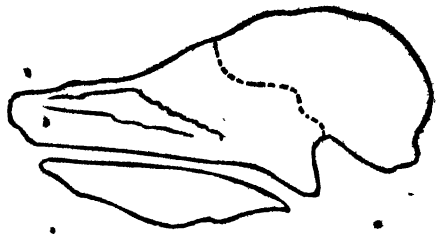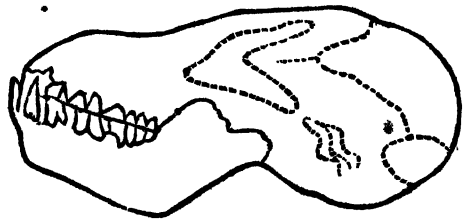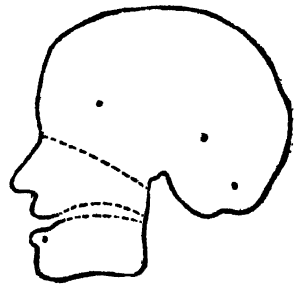
২

ভ্রূযুগের নীচের কথা বিবেচনা করিতে, প্রথমে দন্তের কথা বিবেচনা করিব।

জীব-রাজ্যে অতি নিম্ন শ্রেণীতে, দন্তের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, কঠিন মাংস ও ত্বকে দন্তের কার্য্য সম্পন্ন হইত। পরে একটি গোটা আইলের মত অস্থি সঞ্জাত হইলে; এবং তাহাতেই দন্তের কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। সর্ব্বশেষে ঐ এক অবিভক্ত গোটা অস্থি, নানাখণ্ডে বিভক্ত হইয়া, পৃথক পৃথক দন্তের উৎপত্তি হইল। দন্তের আরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে জীবের যেরূপ আহার, তাহার দন্তও সেইরূপ হইয়াছে। যাহারা গোটা মৎস্য খায়, তাহাদিগের দন্ত তীক্ষ্ণ শূলাগ্রের ন্যায়; এবং মুখের ভিতরের দিকে দন্তের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বক্র। মৎস্য তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু বাহির হইতে পারে না। তাহারা চর্ব্বণ করে না। সেই জন্য অন্য প্রকার দন্তের আবশ্যক নাই। যাহারা গোটা জন্তুর আম-মাংস খায়, তাহাদিগের তীক্ষ্ণ, সরল ও উচ্চ দন্তের আবশ্যক; ঐ দন্ত পরস্পর কিছু ব্যবধানে থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে, ঐ দন্ত শিকারের শরীরে একাধিক স্থানে সুবিধা মত বিঁধাইয়া দিতে পারে। কিন্তু তাহাদিগের শিকারের আম-মাংস ও অস্থি চর্ব্বণ করিবার আবশ্যক থাকায়, অসম চ্যাপ্টা ও বিস্তৃত পেষণ-দন্ত থাকে। যাহারা দূর্ব্বা অথবা অন্য কোনও শস্য আহার করে, তাহাদিগের কর্ত্তনোপযোগী দন্ত থাকা প্রয়োজন হয়। সুতরাং দন্তও তদ্রূপ হইয়াছে। প্রয়োজন অনুসারে তীক্ষ্ণ ও উচ্চ শ্ব-দন্ত, বিস্তৃত ও অসম পেষণ-দন্ত ও ছেদন-দন্তের উৎপত্তি হইয়াছে। * আমরা মানবজাতি সর্ব্বভূক্; আমাদিগের দন্তের গঠন সর্ব্বপ্রকারই আছে। যাহার যেরূপ দন্তের আবশ্যক নাই, তাহার সেইরূপ দন্ত বর্ত্তমান থাকিলে, তাহার উৎপত্তির ও বংশক্রমের পরিচয় দেয়। ইহা অভিব্যক্তিবাদের একটি আনুষঙ্গিক প্রমাণ। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার দন্তের সমষ্টি, আমাদিগের বত্রিশটি (৩২) মাত্র; বানরগণেরও তাহাই; তবে কোনও কোনও বিশেষ শ্রেণীর বানরের ৩৪ চৌত্রিশটি দন্ত দেখা যায়। আর নিম্নতর স্তন্যপায়ী জীবগণের মধ্যে অনেকের ৪৪ চুয়াল্লিশটি দন্ত আছে। তাহার নিম্নে জীবরাজ্যে দন্তের সংখ্যা অনেক বেশী দেখা যায়। যাহা হউক, উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবগণের দন্তের সংখ্যা যে ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল সংখ্যায় নহে; বর্ত্তমানকালে দুই পাটি দন্তমাত্র আছে। পূর্ব্বে অনেক অধিক ছিল। তালুর অগ্রভাগ হইতে প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ কঠিন তালু ভাগ সমস্তই (Hard palate) এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত দন্তশ্রেণী-

দন্ত।

* Molar, canine and incisor.

বিশিষ্ট ছিল। এক শ্রেণীর পশ্চাৎভাগে অন্য শ্রেণী, এইরূপ বর্ত্তমান উপর পাটির পশ্চাদ্ভাগে আরও কতিপয় দন্তপাটি বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে সেই সকল দন্তপংক্তির স্থলে কেবল কয়েকটি ঈষৎউচ্চ মাংস ও ত্বকের রেখামাত্র বর্ত্তমান আছে। তালুর অগ্রভাগে এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত ঐ সকল রেখা সেই বিলুপ্ত দন্তপংক্তির পূর্ব্বস্থান দেখাইয়া দিতেছে। বর্ত্তমান উপরপংক্তির পশ্চাতে এক্ষণে আর দন্ত উৎপন্ন হয় না; কিন্তু সময় সময় কাহারও কাহারও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, কোনও কোনও ব্যক্তির উপর পংক্তির পশ্চাতে দুই একটি দন্ত আছে; আমার এক জন বন্ধু, যিনি সাহিত্য-জগতে অপরিচিত নহেন, তাঁহার এইরূপ আছে। তালুর এই সকল প্রস্থব্যাপী (Transverse) দাগ বৃদ্ধ বয়সে প্রায় থাকে না, বাল্যাবস্থায় অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট থাকে। সুতরাং প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদিগের দন্তসংখ্যার এক্ষণে অনেক হ্রাস হইয়াছে। আর উহারা দুর্ব্বলও হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় সবল নাই। কোনও কোনও দন্ত উপরস্থ মাংস ভেদ করিয়া উঠিতেই সক্ষম হয় না। বাল্য অথবা যৌবনে ত্বক্ ছিন্ন করিয়া না দিলে উহারা ত্বকের নীচেই থাকিয়া যায়। আহারেই দেহধারণ; আর সেই আহার সম্পর্কীয় তিনটি প্রধান যন্ত্র, (দন্ত, পাকস্থলী ও অন্ত্র) ক্রমেই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ক্ষীণ, খর্ব্ব, বিভক্ত ও হ্রস্ব হইতেছে। সুতরাং এই যন্ত্র সকলের শেষ পরিণাম ধ্বংস, ইহা বুঝিতে পারা যায়। তবে এই দেহ? ইহার কি হইবে?

হনু। উভয় চোয়ালের আকার, আয়তন ও প্রসার যে ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে, তাহা উপরের চিত্র-ত্রয় পর্য্যালোচনা করিয়া পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

এক্ষণে চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। আপনাদিগের সহিষ্ণুতার উপর অতিরিক্ত আক্রমণ করিতে সাহস করি না। সেই জন্য এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল। সম্প্রতি

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্রম-অভিব্যক্তির দিকে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করুন। কেঁচো শ্রেণীর জীবগণের চক্ষু নাই; তাহাদিগের ত্বকেই সূর্য্যালোক প্রবেশ করে, এবং শিরোভাগের গাঁইটকে উত্তেজিত করে। বোধ হয়, ইহাতেই তাহাদিগের দৃষ্টিশক্তির কার্য্য হয়। তাহার পর চিংড়ি মাছ শ্রেণীতে বহু চক্ষু থাকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ, তাহাদিগের শুঁড়ের

অগ্রভাগে যে কাল ক্ষুদ্র গোলক আছে, উহাই চক্ষু; এবং প্রত্যেকটীতে বহু স্বচ্ছ বৃত্তসূচি (Pyramid) বিদ্যমান থাকিয়া নিম্নস্থ কাল-কোষে বিষয়কে প্রতিফলিত করে, এবং তাহাতেই দৃষ্টির কার্য্য সম্পন্ন হয়। মক্ষিকা-শ্রেণীতেও ঐরূপ বহু সংখ্যক স্বচ্ছ ক্ষুদ্র পর্দ্দা দ্বারা চক্ষু গঠিত। এই জন্য তাহারা সকল দিক হইতেই দেখিতে পায়। সেই স্থলে আমাদিগের চক্ষুতে একটি মাত্র স্বচ্ছ পর্দ্দা বর্ত্তমান। কীটও সরীসৃপ শ্রেণীস্থ কোন কোন জীবের মস্তকের উপরি ভাগের কিছু নিম্নে একটী স্থানে পূর্ব্বে একটী অতিরিক্ত চক্ষু ছিল, এমত অনুমান করিবার কারণ আছে।* এক্ষণে ঐ চক্ষু উচ্চশ্রেণীস্থ জীবের নাই। ফলতঃ চক্ষুর সংখ্যা নিম্ন জীবের অনেক বেশি ছিল, উচ্চতর জীবরাজ্যে ক্রমে সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। তার পর, পক্ষিশ্রেণীস্থ কতিপয় প্রাণীর তিনটি অক্ষিপত্র বিদ্যমান আছে, কিন্তু আমাদিগের দুইটি মাত্র। তৃতীয়টি লোপ পাইয়া চক্ষুর নাসিকাসংলগ্ন কোণে একটু চিহ্নমাত্র রাখিয়াছে। পরিশেষে আমাদিগের চক্ষুর অসাধারণ বলক্ষয়ের কথা আর বলিতে হইবে না। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় আমাদিগের চক্ষু প্রায় গিয়াছে বলিলেই হয়, আর কিছুদিন পরে চশমা চক্ষে দিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে। আমাদিগের দৃষ্টির তীক্ষ্নতা ও প্রসার একেবারেই কমিয়া গিয়াছে; এমন কি, অসভ্য মনুষ্য যত দূর যেরূপ স্পষ্টভাবে দেখিতে পায়, সভ্য মনুষ্য তাহাও পায় না। আমি ১৮৭৬।৭৭ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের নিকট রাজপথে একটি ব্যক্তিকে বসিয়া ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছিলাম। সে অন্ধ বলিয়া পরিচয় দিতেছিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহার চক্ষু-কোটরই ছিল না; সুতরাং তাহার চক্ষু আদৌ নির্ম্মিত হয় নাই, কেবল নাসিকামূলের নীচে দুই দিকে দুইটি সমান চ্যাপ্টা স্থান মাত্র ছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া চক্ষুর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আশা করা যায় না।

আর কর্ণের ব্যবহার আমাদিগের অনেক অল্প। নিম্নপ্রাণিগণের জীবন নানা বিপদ-সঙ্কুল। সুতরাং বিপদনিবারণের ও আহারান্বেষণের জন্য কর্ণের সর্ব্বদিকে প্রয়োগ অত্যাবশ্যক হয়। তাহারা নানা দিকে কর্ণ ফিরাইতে ঘুরাইতে পারে।

---

* In the centre of the top of the head (of a lizard— Lacerta agilis) was a peculiar spot. * * On the head of the slow worm (Anguis fragilis) there is a dark spot * * over the pineal gland * * It was a rudimentary eye.—Lubbock, The senses of animals, p 126.

তাই,বাহ্যকর্ণসংলগ্ন পেশী কর্ম্মক্ষম। কিন্তু আমাদিগের ঐ পেশী প্রায় অকর্ম্মণ্য। আমরা কর্ণ ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি না। তবে কচাচিৎ দুই এক জন ব্যক্তি কর্ণ-সঞ্চালন করিতে পারেন। আমি দুই জনকে অতি সামান্যভাবে কর্ণসঞ্চালন করিতে দেখিয়াছি। যাহা হউক, এই শক্তি মানবের অনাবশ্যকতা বশতঃ লুপ্ত হইয়াছে।

আমাদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিম্নস্থ অনেক জীব অপেক্ষা দুর্ব্বল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এবং নাসিকাও ক্ষুদ্র।

এক্ষণে পূর্ব্ববিভাগ স্মরণ করুন। ভ্রূযুগের নিম্নে সকলই পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ, ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইয়াছে। আর ভ্রূযুগের উপরে সকলই বড় হইতেছে। ইহার কারণ এই যে, আমাদিগের মস্তিষ্ক সকল প্রাণী অপেক্ষা বৃহৎ ও গুরু। উহা সর্ব্বাপেক্ষা ক্রিয়োপযোগী। এই জন্যই জীবরাজ্যে আমরা জ্ঞান ও বুদ্ধিতে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছি।

আমরা দেখিলাম যে, হস্ত,পদ, পৃষ্ঠবংশ, পঞ্জর, পাকস্থলী,অন্ত্র,হনু,চক্ষু,কর্ণ, নাসিকা, সকলই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধি ক্রমেই উন্নত হইতেছে। একের ধ্বংস অপরের উন্নতি; এই স্থূল-দেহের ধ্বংসের সহিত যেন বিপরীত অনুপাতে জ্ঞান ও বুদ্ধির বৃদ্ধি হইতেছে। জন্তুযুগে (Tertiary age)স্থূলদেহ প্রকাণ্ড ছিল; জীব ও অতি বৃহৎ ছিল। তৎপর হইতেই বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত দেহ ক্রমে খর্ব্ব হইতেছে, কিন্তু মস্তিষ্ক বর্দ্ধিত হইতেছে। ইদানিং মানব কথঞ্চিৎ সভ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পর কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়াশক্তিই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, উহার আয়তন আর বাড়িতেছে না। পূর্ব্বে মস্তিষ্ক ও তাহার শক্তি অল্প ছিল, দেহ বৃহৎ ছিল। বর্ত্তমান যুগে দেহ কমিতেছে এবং মস্তিষ্কের শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে।* এই স্থূলদেহ ক্রমে যেরূপ ক্ষীণ, খর্ব্ব ও ক্ষুদ্র হইতেছে, তাহাতে সুদূর ভবিষ্যতে ইহার অস্তিত্বলোপ হওয়া সম্ভব। ক্রম-অভিব্যক্তি মানবকে সেই দিকেই লইয়া যাইতেছে। কিন্তু মন, বুদ্ধি ও জ্ঞান, ক্রমেই উন্নত, পরিষ্কৃত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবকোষ হইতে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি; আবার এই দেহ যখন পরিত্যক্ত হইবে, তখন উন্নত জ্ঞান, উন্নত চৈতন্য সেই অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করিয়াই স্বকার্য্য-সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইব। দেহ সহ চৈতন্যের ক্ষয় বা বিকৃতি কখনও হয় নাই, হইবেও না; বরং দেহক্ষয়ে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, এবং হইবেও।

পঞ্চকোশ ও মুক্তি।

* Ray Lankester, Nature and Man p 17—20

আমরা এই অন্নময় কোষে আচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ থাকিয়া অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশ। ইহার পরের অবস্থা এতদপেক্ষা সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয়, এবং অনেকাংশে মুক্ত ও স্ফুরণপ্রাপ্ত। মৌলিক জীব নানা শাখা প্রশাখায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবনতি ও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া যুগযুগান্তর হইতে উন্নত হইতেছে। সুতরাং এই স্থূলদেহ, এই অন্নময় কোষ হইতে মুক্ত হইয়া উন্নত চৈতন্যময় জীবরূপে এত দিন যে কোনও জীবই পরিণত হয় নাই, এ কথা সম্ভবপর নহে। উচ্চ ও নিম্ন, উন্নত ও অনুন্নত জীব পাশাপাশি জগতে বাস করিতেছে। এক সম্প্রদায় উন্নত হইতেছে, কিন্তু তাহার পার্শ্বেই অনুন্নত সম্প্রদায়ও বাস করিতেছে। অবশ্য কালে অনেক জীব লোপ পাইয়াছে। কিন্তু তথাপি উন্নত অনুন্নতের একত্র বাস প্রকৃতিরই নিয়ম। আমাদিগের নিম্নতর জীবগণ সকলে উন্নত হয় নাই; তথাপি তাহাদিগের সম্প্রদায়বিশেষ উন্নত হইয়া মানবরূপে তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিতেছে। তেমনই মানব যদিও সকলে উন্নত হয় নাই, তথাপি তাহাদিগের মধ্যেও কোনও সম্প্রদায় উন্নত হইয়া মানবের সহিত বর্ত্তমান সময়ে একত্র বাস করিতেছে, একথা সাহস করিয়া বলা যায়। মানব আরও উন্নত ও অভিব্যক্ত হইয়া সূক্ষ্মদেহময় হওয়া অতীব সম্ভব; হয় ত সে অবস্থা মানবের কোনও সম্প্রদায় এত দিন প্রাপ্ত হইয়াও থাকিবে, এবং আমরা তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিতেছি। এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। তবে সেই উন্নত সূক্ষ্মদেহধারী অতীন্দ্রিয় জীবগণ, বোধ হয়, এই ঘনবায়ু-প্রপীড়িত, প্রখর-সূর্য্যকিরণদগ্ধ কঠিন ক্ষিতিপৃষ্ঠে বাস করিতে সক্ষম নহেন। এ ধরা বোধ হয় তাঁহাদিগের উপযুক্ত নহে। কিন্তু এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদিগের বাসোপযোগী স্থানের অভাব নাই। সেই সূক্ষ্মদেহধারী জ্ঞানোন্নত পবিত্র প্রাণিগণ, (তাঁহাদিগকে দেব যক্ষ, গন্ধর্ব্ব যে নামেই অভিহিত কর) তাঁহাদিগের উপযুক্ত লোকে স্বকর্ম্ম সাধন করিতেছেন, ইহাই প্রকৃষ্ট সিদ্ধান্ত। আমরাও তদবস্থ হইলে উপযুক্ত লোকে উন্নীত হইবার আশা করিতে পারি। কিন্তু অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চ কোষের প্রত্যেকটির অভিব্যক্তি ব্যতীত অপরটিতে উন্নীত হইবার আশা করা যায় না। যে স্থূলদেহের ধ্বংস আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিতেছি, তাহার ক্ষয়েই প্রাণময় কোষ প্রাপ্তি। প্রাণের ক্রীয়াই সে অশান্ত কোষকে তদীয় (পৃথক) জীবনব্যাপারে লিপ্ত রাখে। এই চাঞ্চল্য * অপগত হইলেই মনোময় কোষ প্রাপ্তি। এ

* তৈত্তীরীয় উপনিষৎ দ্রষ্টব্য।

অবস্থায় প্রাণ শান্ত, এবং নিষ্ক্রিয়। কিন্তু মনের ক্রিয়া বশতই এই কোষ ক্রিয়াশীল। এই ক্রিয়া স্তম্ভিত অর্থাৎ শান্ত হইলেই জ্ঞানময় কোষ প্রাপ্তি। এই অবস্থায় প্রশান্ত জীবাত্মা স্বীয় বিশুদ্ধ ও অবিকৃত জ্ঞান লাভ করতঃ আত্ম-ধ্যানেই নিমগ্ন থাকেন। সর্ব্বশেষে সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিণতিতে, সেই একাগ্রধ্যানের সফলতাতে আনন্দময় কোষে নিত্যানন্দ উপভোগ করিয়া জীবাত্মা পরম মুক্তিপ্রাপ্ত হন। এই অবস্থাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক, এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এই পথই মানবের প্রকৃত পথ, এই গতিই জীবের পরমগতি। অভিব্যক্তিমূলক জীব-বিজ্ঞান এই কথা লইয়াই ধীরে ধীরে আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। †

---

† এই প্রবন্ধ রাজসাহী সাহিত্য সভায় পঠিত।

বিহগের দেশ-ভ্রমণ।

কোনও কোনও পাখী বারমাসই এক দেশে থাকে; আর কোনও কোনও পাখী এক ঋতুতে থাকে, অন্য ঋতুতে থাকে না। ইহারা যথাসময়ে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হয়। আমাদের চিরপরিচিত কোকিল ইহার এক দৃষ্টান্তস্থল। কোকিল বসন্ত ঋতুতে এ দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ খঞ্জন, চড়াই ইত্যাদি পাখী আপন আপন সময়মত দেশান্তর হইতে এ দেশে আসে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পক্ষিগণের ব্যবহার এইরূপ। কোনও পাখী দেশ-ভ্রমণ করে, কেহবা করে না।

কিন্তু এই দেশভ্রমণ ব্যাপারটা কেবল পাখীরই স্বভাব নহে। মাছেরাও যথাসময়ে দলে দলে সাঁতরাইয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যায়। কখনও বা ভাটির দিকে, কখন বা উজানের দিকে যায়। পশুর মধ্যে হস্তী প্রভৃতিও যথাকালে এক স্থান হইতে দলে দলে অন্য স্থানে যায়। কেবল যে নিম্ন-শ্রেণীস্থ জীবগণই দেশভ্রমণ করে, তাহা নহে; মানুষও অসভ্যাবস্থায় দলে দলে স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করে। এক স্থানে থাকে না। তবেই দেখা যাইতেছে যে, দেশভ্রমণ কাণ্ডটা অনেক জীবের মধ্যেই স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু পক্ষিগণের দেশভ্রমণে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহারা আদিকাল হইতে যে যে পথে ভ্রমণ করিতেছে, সে সেই পথেই বংশানুক্রমে ভ্রমণ করে। যে জলের ঊর্দ্ধ দিয়া যায়, সে চিরদিনই ঐ পথে যায়। যে স্থলের উপর দিয়া যায়, যে চিরদিনই তদ্রূপ করে। ইহাদিগের এই স্বভাব জানা থাকিলে ভ্রমণ-পথ দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, কোন্ স্থান পূর্ব্বে জলময় ছিল, কোথায় বা স্থল ছিল। কোকিলের স্বভাব স্থলপথের ঊর্দ্ধ দিয়া ভ্রমণ। যদি কখনও কোকিলকে জলরাশির ঊর্দ্ধ দিয়া যাইতে দেখা যায়, তবে মনে করিতে হইবে যে, ঐ স্থানে পূর্ব্বে স্থল ছিল, এখন জল হইয়াছে। তাই কোকিল চির-স্বভাব বশতঃ ঐ পথেই যাইতেছে। ইহা হইতে ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থার পরিবর্ত্তন অনেক সময় জানা যায়।

আর পক্ষিগণের দেশভ্রমণের যেমন নির্দ্দিষ্ট পথ আছে, তেমনই নির্দ্দিষ্ট দিকও আছে। উহারা প্রায়ই উত্তর হইতে দক্ষিণে, অথবা দক্ষিণ হইতে উত্তরে যায়। পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধের পক্ষিগণ দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণার্দ্ধের

পক্ষিগণ উত্তর দিকে ভ্রমণ করে। ইহাও একরূপ পরীক্ষিত হইয়াছে। যদিও এ নিয়মের ব্যভিচার কোনও কোনও স্থলে দৃষ্ট হয়, তথাপি মোটের উপর এ কথা সত্য।

দেশভ্রমণ যখন অনেক জীবেরই স্বভাবসিদ্ধ দেখা যাইতেছে, তখন ইহার কারণও সাধারণ হইবে। এই কারণ কি? অনেকেই মনে করেন যে, আহার-অন্বেষণই ইহার কারণ। যখন একস্থানে আহারের অসদ্ভাব ঘটে, তখন অন্য স্থানে যায়। পক্ষিগণও আহারের নিমিত্তই দেশভ্রমণ করে। এই মত সত্য হইলেও, আমার বোধ হয় যে, ইহা ব্যতীত অন্য কারণও আছে। ডিম্বপ্রসবও ইহার অন্যতর কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। চড়াই শ্রেণীর মধ্যে ইহা আমি অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহারা গ্রীষ্ম-কালে ও বর্ষার প্রারম্ভে এই দেশে থাকে। একটা চড়াই আমার বসিবার ঘরে ছাদের নীচে তারের উপর বাসা করিত। সে প্রতি বৎসরই এক স্থানে বাসা করিত। আর বাসা করিয়া অল্পদিন পরে ডিম পাড়িত। মৎস্য-গণ দলে দলে ভ্রমণ করে, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু ডিম পাড়িবার সময় হইলেই ঐরূপ করে। উহারা ভ্রমণ করিতে করিতে যে যেখানে সুবিধা বোধ করে,—তীরের মধ্যে, অথবা তীরের উপর, জলের মধ্যে, কি নদীর তলায়, যেস্থানে সুবিধা পায়, সেই স্থানেই ডিম্ব প্রসব করে। ডিম প্রসব যেন ভ্রমণ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই এ সকল ক্ষেত্রে অনুমান হয়। যাহা হউক, আহার-অন্বেষণ ও প্রসব, এতদুভয়কেই দেশভ্রমণের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

আহারের অভাব হইলে সভ্য মানুষও দেশ হইতে দেশান্তরে যায়, কেবল মরা মানুষই যায় না। ভ্রমণকাল উপস্থিত হইলে পক্ষিগণ এত উত্তেজিত হয় যে, উহাদিগকে কোনও প্রকারেই নিবৃত্ত করা যায় না। সে সময়ে যদি বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বদা বাহির হইয়া যাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করে। পিঞ্জরপার্শ্বে মাথা ঠুকিতে থাকে, এবং বারংবার এইরূপ করিতে করিতে মরিয়া যায়; তথাপি বহির্গত হইবার চেষ্টা ত্যাগ করে না। এ বৃত্তি এতই প্রবল। কিন্তু ইহাকে বৃত্তি বলাও সঙ্গত হয় না; কারণ, বৃদ্ধ পক্ষিগণ ছানাগুলিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া ক্রমশঃ ভ্রমণ শিক্ষা দেয়। ইহাদিগের প্রত্যেক পুরুষ পরবর্ত্তী পুরুষকে ভ্রমণ শিক্ষা দিয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে বৃত্তি বলাও ঠিক হয় না। যাহা হউক, দেশভ্রমণ ব্যাপারটী প্রায় বংশানু-

ক্রমিক বৃত্তির মতই হইয়া গিয়াছে। নতুবা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতে যাওয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাওয়া এবং বহুদিন পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসা, এ সকল কেমন করিয়া হয়, তাহা বুঝা যায় না। অষ্ট্রেলিয়া হইতে নিউজিলাণ্ড, এত দূরের পথ মনে রাখা ও যাওয়া আসা কিরূপে সম্ভব হয়? আহার-অন্বেষণ বা ডিম্ব-প্রসব, যাহাই কারণ হউক, নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বহু দূরের পথ, বহুদিন পরে কিরূপে ইহারা যাওয়া আসা করে, তাহা বুঝা সহজ নহে। এ নিমিত্ত ইহাকে বৃত্তির ন্যায় বলিতেছি। ইহার কারণ এ পর্য্যন্ত বুঝা যায় নাই। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, ইহা অতীব আশ্চর্য্য-জনক ব্যাপার, সন্দেহ নাই।

কোথায় যাইবে, কোন্ পথে যাইবে, কোথায় ফিরিয়া আসিবে, এ সকল পক্ষিগণ কিরূপে স্মরণ রাখে? যাহাদিগের স্মৃতিশক্তি এত প্রবল, তাহাদিগের মস্তিষ্ক অত অনুন্নত কেন? এ সকল কথার আলোচনা আবশ্যক। অন্যত্র এ পর্য্যন্ত ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। এ দেশে কেহ চেষ্টা করিবেন কি? এক জনের চেষ্টায় এ সকল কার্য্য হওয়া কঠিন। অনেকের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। এ কার্য্য এতদ্দেশীয়গণের অসাধ্য নহে। আমরা পূর্ব্বে প্রেমিক ছিলাম; এখন রাজনৈতিক হইয়াছি। জ্ঞানপিপাসু কখনও হইব কি? প্রশ্নের উত্তর প্রতীক্ষায় রহিলাম।

বর্ণ।

অনেকের বিশ্বাস যে, শীতপ্রধান দেশের লোক শাদা ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক কাল হয়। শীত ও গ্রীষ্মের সহিত তাঁহারা বর্ণের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। কৃষ্ণবর্ণের অপরাধ, তাঁহারা সূর্য্যদেবের উপর চাপাইয়া দেন, আর শ্বেতবর্ণের গৌরব তাঁহারা শীতের উপর আরোপ করেন। এই প্রচলিত মত কত দুর সত্য, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

বর্ণানুসারে মনুষ্যজাতিকে চারি অথবা পাঁচ শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। ১। শ্বেতাঙ্গ; ২। পীতাঙ্গ ও কটা; ৩। লোহিতাঙ্গ; ৪। কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতাঙ্গদিগকে আমরা উত্তমরূপেই চিনি, সুতরাং তাহাদিগের অন্য পরিচয় অনাবশ্যক। পীতাঙ্গগণের মধ্যে জাপানী ও চীনাগণ বিশেষ পরিচিত। কটা মধ্যে হিন্দুজাতিকে গণ্য যাইতে পারে। (১) লোহিতাঙ্গগণ আমেরিকার আদিম-নিবাসী ছিল। এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতার গৌরব রক্ষার্থ তাহারা অন্তর্ধান হইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ জাতির মধ্যে কাফরিগণ প্রসিদ্ধ।

জাপানের অনেক উত্তরে কামস্কটকা দেশ; ইংলণ্ডের অনেক উত্তরে আইস্‌ল্যাণ্ড; আমেরিকরে উত্তর পূর্ব্বে গ্রীনল্যাণ্ড; রুশিয়ার উত্তরাংশে লাপল্যাণ্ড;—এই সকল দেশ প্রায় চিরতুষারাবৃত, সুতরাং অত্যন্ত শীত-প্রধান। প্রচলিত মত সত্য হইলে এই সকল দেশের অধিবাসীগণ সকলেই শ্বেতবর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা নহে। লাপল্যাণ্ডীয়গণ, কামস্কাডলিয়গণ এবং এস্কুইমক্স জাতীয়গণের বর্ণ শ্বেত হইতে অনেক বিভিন্ন। গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কুইমক্স জাতি কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগের কেশও কাল। লাপল্যাণ্ডীয় ও কামস্কা-ডেলিয়গণ কটা, একটু পীতাঙ্গ, ইহাদিগেরও কেশ কাল। তৎপর দক্ষিণ আমেরিকার পেটাগণিয়া ইংলণ্ডের ন্যায় শীতপ্রধান দেশ, তথাপি তত্রত্য লোক কটা, শ্বেত নহে। এইরূপ নিউজিলাণ্ড ও ভ্যান্‌ডিম্যান্‌ল্যাণ্ড দেশেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ সকল স্থান অত্যন্ত শীতপ্রধান এবং অনেক স্থলে তুষারাবৃত; তথাপি তথায় কৃষ্ণবর্ণ জাতির অভাব নাই। শীতপ্রধান দেশের এই কৃষ্ণবর্ণ মানবগণ কে? তাহারা মানবজাতির শ্বেতাঙ্গশাখাভুক্ত

(১) ইহারা বৈদিক সময়ে শ্বেতবর্ণ ছিলেন।

নহে; ইহা তাহাদিগের আকৃতি ও অস্থিবিধানেই প্রকাশ পায়। আইস-ল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড ও লাপল্যাণ্ড দেশে পীতাঙ্গ জাতির এক শাখা বসতি করে; তাহাদিগের মধ্যেই কোন কোন প্রশাখা (যথা এস্কুইমক্স) কৃষ্ণবর্ণ। অন্যান্য প্রশাখা উজ্জ্বল পীত বর্ণ। এই সকল দেশে অথবা পেটাগণিয়া, নিউজিল্যাণ্ড কিম্বা ভানডিম্যানসল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে শ্বেতাঙ্গ শাখাভুক্ত মানব শ্বেতবর্ণ; কিন্তু লোহিতাঙ্গ কিম্বা পীতাঙ্গবর্ণের কোন কোন প্রশাখা কৃষ্ণবর্ণ। উহারা মুখের আকৃতি ও অস্থিবিধান অনুসারেও পীতাঙ্গ অথবা লোহিতাঙ্গ বলিয়া পরিচিত হয়। তবেই দেখা যাইতেছে যে, এই সকল দারুণ শীতপ্রধান দেশেও অ-শ্বেত শাখাভুক্ত মানব কটা অথবা কৃষ্ণবর্ণ। এমন নিদারুণ শীতেও তাহাদিগকে শ্বেতবর্ণ করিতে পারে নাই। তাহারা কৃষ্ণচর্ম্ম বহন করিয়াই যুগযুগান্তর হইতে শ্বেতাঙ্গগণের পার্শ্বে বসতি করিতেছে।

তৎপর, উষ্ণদেশেও শ্বেত-অধিবাসীর অসম্ভাব নাই। যে উত্তর আফ্রিকার অগ্নিকুণ্ড-তুল্য সাহারা মরুভূমির নিকটস্থ অন্যান্য জাতি কৃষ্ণবর্ণ, সেই অগ্নি-কুণ্ডের মধ্যেই টুরেগ জাতি (Touaregs) স্বীয় শ্বেত চর্ম্মের গৌরব করিয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান মধ্য আফ্রিকা, সুদান প্রভৃতি স্থানেও যে সকল শ্বেতবর্ণ জাতি যুগযুগান্তর হইতে বাস করিতেছে, উল্লিখিত প্রচলিত মত সত্য হইলে, তাহাদিগের কৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচিত ছিল। অন্যান্য নাতিশীতোষ্ণ দেশের অধিবাসিগণের বর্ণ বিবেচনা করিতে গেলেও দেখা যায় যে, প্রচলিত মতের ব্যভিচার এত অধিক যে, তাহা কখনই সুধিসমাজে গ্রহণীয় নহে।

উপরে যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, তাহা এবং তদ্রূপ অপরাপর দৃষ্টান্ত হইতে তিনটী তথ্য সপ্রমাণিত হইতেছে :—

(ক) উষ্ণদেশে শ্বেতাঙ্গ মানব পুরুষানুক্রমে স্মরণাতীত কাল হইতে বাস করিতেছে।

(খ) শীতপ্রধান দেশেও কৃষ্ণবর্ণ মানব ঐরূপ পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছে।

(গ) উহারা উভয়েই,—অর্থাৎ উষ্ণদেশবাসী শ্বেতবর্ণগণ মানবজাতির শ্বেতাঙ্গ শাখাভুক্ত, এবং শীতপ্রধান দেশেস্থ কৃষ্ণবর্ণগণ মানবজাতির অ-শ্বেতাঙ্গ (১) শাখাভুক্ত। তাহাদিগের আকৃতিতেই তাহা স্পষ্ট প্রকটিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, কৃষ্ণবর্ণ উৎপাদনে সূর্য্যদেবই

(১) পীত কটা অথবা লোহিতাঙ্গ।

যে বিশেষ অপরাধী, তাহা নহে, আর শ্বেতবর্ণ উৎপাদনে শীতই যে বিশেষ সক্ষম, তাহাও নহে। আর, একটী অতীব গুরুতর কথা এই দেখা যাইতেছে যে, আকৃতি ও অস্থিবিধান অনুসারে যাহারা মানবজাতির শ্বেত শাখাভুক্ত, তাহারা পুরুষানুক্রমে স্বীয় শাখা অমিশ্র রাখিয়া উষ্ণদেশে বাস করিলেও সূর্য্যদেব তাহাদিগের বিশেষ কিছু করিতে পারেন না; আর আকৃতিতে যাহারা অশ্বেত শাখাভুক্ত, তাহাদিগকে চিরতুষার রাশিও শ্বেতে পরিণত করিতে পারে না। (২) শীতোষ্ণ এ সম্বন্ধে বিশেষ কার্য্যকর নহে, বর্ণ প্রধানতঃ জাতিগত।

এক্ষণে, মনুষ্যেতর জীবগণের বর্ণ বিবেচনা করিলেও ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, উহাদিগের মধ্যে যে জীব যে জাতিভুক্ত, তাহার বর্ণ সকল দেশেই প্রায় সমান থাকে। উষ্ণ দেশেও শ্বেতবর্ণ জন্তু, এবং শীত প্রধান দেশেও কৃষ্ণবর্ণ জন্তু সমভাবে বাস করিতেছে, আর উদ্ভিদগণের তো সেই এক সাধারণ সবুজবর্ণ সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। যাহারা অন্য বর্ণ-বিশিষ্ট, তাহাদিগের বর্ণও জাতিগত, স্থানগত নহে। এই সকল বিবেচনা করিলে জীব-জগতে বর্ণ-ভেদের জাতিগত অর্থাৎ দেহগত কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। শীতোষ্ণ কল্পনা পরিত্যজ্য।

জীবদেহের বাহ্যত্বকে বর্ণের যে উপকরণ (Pigment), নিহিত আছে, তদনুসারেই দেহের বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হয় (৩)। মানব এবং ইতর জন্তুগণের বর্ণের হেতু এই পিগমেণ্ট এবং উদ্ভিদগণের বর্ণের হেতু chlorophyle ও Lipochrome মানব ও ইতর জন্তুগণের ত্বক্ মধ্যস্থিত ঐ উপকরণের নিম্নে যদ্যপি বর্ণ-প্রতিফলিত করিবার উপযোগী কোন বিশেষ স্তর থাকে ("reflecting layer," E.B. Vol 27. P 150.) তবে বর্ণ আরও উজ্জ্বল হয়। বাহ্যত্বকের কোষ সংস্থানের উপরও বর্ণ কিয়দংশে নির্ভর করে (৪) এই বর্ণোপকরণ (পিগমেণ্ট) কখন বা

---

(২) The belief was long entertained that the colour of the Blacks resulted from the prolonged action of the sun on their bodies, but observation has shown that such is not the cause.—Figuir—The Human race, p 572.

(৩) The black color resides in a carbonaceous substance, the Pigmentum which is deposited in a layer in the mucous tissue on the cuticle. Figuier—the Human Race p 572.

(৪) The coloration of the surface of animals is caused either by pig-

আহারের সহিত দেহ মধ্যে গৃহীত হয়; কখন বা দেহ মধ্যে নিরন্তর যে ধ্বংস ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহারই ফলে উৎপন্ন হয়। সকল দেহই ধ্বংস ক্রিয়া ও গঠন ক্রিয়া, এতদুভয়ের আধার। যুগপৎ এই উভয় ক্রিয়াই দেহস্থ কোষ সমূহে সম্পন্ন হইতেছে। ধ্বংস ক্রিয়ার ফলে(Katabolism)অনাবশ্যক পদার্থ পরিত্যক্ত হইতেছে; এবং গঠন ক্রিয়ার ফলে (Anabolism) আবশ্যকীয় বস্তু গৃহীত হইতেছে। উল্লিখিত বর্ণোপকরণ, পরিত্যক্ত পদার্থ সকলের ন্যায় একটী বস্তু; উহা ধ্বংস ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হইয়া বাহ্যত্বকের মধ্যে ও নিম্নে আসিয়া অবস্থিতি করে। উহা দৈহিক ক্রিয়া সমষ্টির ফল (৫)। মানব ও পশু পক্ষীর দেহে এই উপকরণ অঙ্গার, উদজান, অম্লজান, যবক্ষারজান ও লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত। অবশ্য উপকরণ সকলের মাত্রা ভেদ আছে; তজ্জন্যই বর্ণও এই সকল জীবে নানা প্রকার লক্ষিত হয়। উদ্ভিদের বর্ণোপকরণে কেবল যবক্ষারজান ব্যতীত অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি সমস্তই আছে। এই উপকরণের বর্ণানুসারেই বাহ্যত্বকের বর্ণ নিয়মিত হয়।

শ্বেত, কৃষ্ণ,সকল মনুষ্যেরই পুংকীট এবং স্ত্রী ডিম্ব (spermatozoon and ovum) বর্ণহীন অথবা শ্বেতবর্ণ। কিন্তু উহাদিগের সংযোগে যখন ভ্রূণ-দেহ গঠিত হয়, তখন হইতেই জাতীয় বর্ণ অনুসারে তাহার বাহ্য ত্বকের বর্ণ নিয়মিত হয়। পুংকীট দ্বারা অনুপ্রাণিত স্ত্রী ডিম্ব ক্রমে বিভক্ত ও বর্দ্ধিত হইয়া দেহ গঠন করিতে অনেক ধ্বংস ক্রিয়া ও গঠন ক্রিয়া সম্পাদন করে। তাহারই ফলে বর্ণোপকরণের উৎপত্তি। পুংদেহে ধ্বংস ক্রিয়ার আধিক্য; সুতরাং সাধারণতঃ পুরুষ স্ত্রী জাতি অপেক্ষা উজ্জ্বল বর্ণ হয়। শ্বেতাঙ্গগণের উজ্জ্বল বর্ণ এবং কৃষ্ণাঙ্গগণের মলিন বর্ণও দেহজ কারণসম্ভূত। বর্ণ শারীরিক ক্রিয়ার বাহ্য

---

ments, or by a certain structure of the surface by means of which the light falling on it, or reflected through its superficial transparent layers, undergoes diffraction or other optical change. Encycl. Britt. Vol. 27 p, 150.

(৫) Pigments of many kinds are physiologically regarded as of the nature of waste products. * * * Abundance of such pigments and richness of variety in related series point to pre-eminent activity in chemical processes in the animals which possess them. Technically expressed, abundant pigments are expressions of intense metabolism. – Geddes & Thomson. The evolution of Sex, p 23.

লক্ষণ মাত্র। উহা কোন দেশ বিশেষের শীতোষ্ণতার প্রতি নির্ভর করে না।

বর্ণ উৎপাদনে মনের এক্‌রূপ ক্রিয়া আছে; কিন্তু তাহাও শরীর-উপাদানের ধ্বংস গঠন সাধিত করিয়া পরিচালিত হয়। মন বিষণ্ন থাকিলে অনেক সময় মুখ বিবর্ণ এবং দেহ মলিন হয়; আর মন প্রফুল্ল থাকিলে বর্ণও উজ্জ্বল হইয়া থাকে। যদিও ইহা কোন কোন সময়ে রক্ত সঞ্চালনের বেগবত্তা অথবা মৃদুতার উপর নির্ভর করে, কখন বা রক্তাধিক্য কিম্বা রক্তাভাবের ফলে ঘটিয়া থাকে; তথাপি উহা অনেক সময়ে ধ্বংস বা গঠন ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, সন্দেহ নাই। ফলতঃ বর্ণ মুখ্যরূপে জাতিগত দৈহিক কারণে উৎপন্ন হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ণোৎপাদনে মনের ক্রিয়া জীবরাজ্যে আর এক প্রকারে বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ জীবগণ সময় সময় আত্ম রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইলে চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থ নিচয়ের তুল্য বর্ণ ধারণ করে। যাহাতে অপর জন্তু উহাদিগকে চিনিয়া লইয়া বধ করিতে না পারে, এই জন্য ঐরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তন (Protectve coleration) সংসাধিত হয়। ক্রমে ইহার উপকারিতা উপলব্ধি হইয়া বংশানুক্রমে ঐ পরিবর্ত্তিত-বর্ণযুক্ত জন্তুই রক্ষিত হয়, অপরে বিনষ্ট হয়। চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থের সহিত একবর্ণ হইলে অন্য কোন খাদক জন্তু খাদ্য জীবকে পৃথকরূপে সহজে চিনিয়া লইতে সক্ষম হয় না, এই কৌশলেই ঐ বর্ণ-পরিবর্ত্তনের প্রধান উপকারিতা। যাহাদিগের দৈহিক ক্রিয়া এই পরিবর্ত্তন সিদ্ধ করিতে পারে, সেই সকল জন্তু রক্ষিত হয়, অন্যে বিনষ্ট হয়। ফলত জীবরাজ্যে যে দিক দিয়াই দেখা যায়, তাহাতেই জাতিগত ও ব্যক্তিগত কারণ ভিন্ন বর্ণের অন্য কোন বিশেষ কারণ লক্ষিত হয় না। যৌবনের প্রারম্ভে এবং ইতর প্রাণীদিগের বংশ বৃদ্ধির সময়ে বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া থাকে। ইহাও ব্যক্তিগত মানসিক চাঞ্চল্যের ফল। তবে, শীতোষ্ণতা যে বর্ণের কোনই পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয় না, এরূপ নহে। শ্বেতাঙ্গগণ দীর্ঘকাল উষ্ণ দেশে বাস করিলে কিঞ্চিৎ মলিন হয়, এবং কৃষ্ণবর্ণও শীতপ্রধান দেশে কিঞ্চিৎ শ্বেতাভ হয়। এই পরিবর্ত্তন অতি যৎসামান্য; ইহাতে জাতীয় বর্ণের প্রকৃত পরিবর্ত্তন হয় না। জাতীয় বর্ণ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় সমান থাকে। এক কারণেই জাতীয় বর্ণের মৌলিক পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কারণ দেখা যায় না। সেই কারণ—বিভিন্ন-বর্ণ নর-নারীর সংমিশ্রণে অপত্যোৎপাদন। এই কারণ ঘটিলে তিন চারি পুরুষেই জাতীয়

বর্ণের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। কেবল মানব জাতির নহে, এই কারণে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গগণের মধ্যেও নানারূপ বিস্ময়কর ও অদ্ভুত বর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কারণেই ভারতীয় ফিরিঙ্গি, ইউরোপিয়ান, এবং কৃষ্ণবর্ণ ইহুদীগণ, (৬) আফ্রিকার মুলেটোগণ, এবং অন্যান্য দেশের শঙ্কর জাতি স্বকীয় বর্ণ হইতে মৌলিকরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জতীয় বর্ণ পরিবর্ত্তনের এমন কারণ আর নাই। অতি উজ্জ্বল শ্বেতাঙ্গও এই কারণে গাঢ় কৃষ্ণ হইতে পারে, এবং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণও শ্বেত হইতে পারে (৭)। যদি কোন শ্বেতাঙ্গ জাতি প্রকৃত পক্ষে স্থায়ীরূপে কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইয়া থাকে, তবে নিতান্ত সম্ভব যে, তাহারা বর্ণ-শঙ্কর। তাহাদিগের আকৃতি এবং অস্থি বিধান নিশ্চয়ই এই অনুমান দৃঢ় করিবে।

কদাচিৎ শ্বেতবর্ণ জনক জননীর কৃষ্ণবর্ণ সন্তান সন্ততি হয়; অথবা কৃষ্ণবর্ণ জনক জননীর শ্বেতবর্ণ সন্তান সন্ততি হয়। উহা ব্যক্তিগত কোন বিশেষ কারণের ফল; অথবা পূর্ব্বানুবৃত্তি (৮)। কোন শ্বেতাঙ্গ সাধ্বী এক কৃষ্ণবর্ণ পুত্র প্রসব করিয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহার স্বামী তাঁহাকে ভ্রষ্টা বিবেচনা করেন। কিন্তু অবশেষে জানা গেল যে, ঐ সাধ্বী একজন কৃষ্ণকায় কাফ্রিকে সতত দেখিতেন; ও তাহার বর্ণের বিষয় অনেক সময় চিন্তা করিতেন। পক্ষী ব্যবসায়ীগণ (৯) ক্রেতার ইচ্ছানুরূপ বর্ণ বিশিষ্ট পক্ষী দিতে হইলে, পক্ষিণীর গর্ভ সঞ্চারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এবং পরে আদিষ্টরূপ চিত্রিত আলেখ্য তাহার সম্মুখে সর্ব্বদা ধারণ করিয়া, এবং তদ্রূপ পক্ষীর সংযোগ ঘটাইয়া, ঐ আদেশ প্রতিপালনের চেষ্টা করে এবং অনেক সময়ে কৃতকার্য্য হয়। এই প্রকার কোন বিশেষ ব্যক্তিগত কারণ থাকিলে, অপত্য অন্য বর্ণ হইতে পারে। কিন্তু ঐ কারণ সর্ব্বত্র বোধগম্য হয় না। যাহা হউক, ইহা নিঃশঙ্কোচ বলা যাইতে পারে যে, বর্ণ জাতিগত; উহা ত্বকের মধ্যস্থিত উপকরণের এবং বাহ্যত্বকের কোষ সংস্থানের উপর নির্ভর করে; শীতোষ্ণতার সহিত জাতিগত বর্ণভেদের সংস্রব নাই।

---

(৬) ইহারা কোচিন প্রদেশে বাস করে।

(৭) In succeeding mixed generations * * * the complexion would grow lighter and darker, until at last a white or a black being was brought into the world. Such is the course of physical (শারীরিক) influence and the cause of deterioration or relapse in the color of the human species. Only four or five generations of mixed blood are required in order to render the negro stock white and no more are wanted to make the white black,—Figuier—The Human Race, p 573.

(৮) Reversion ইহার ফলে পূর্ব্ব পুরুষের কোন লক্ষণ থাকিলে পরবর্ত্তীরও হইতে পারে।

(৯) Bird-fanciers.

স্বপ্ন।

"ইন্দ্রিয় নিষ্পন্দ হ'লে সুপ্ত দেহীগণ।" (কৈবল্য) উপনিষদ গ্রন্থাবলী।

যে নিদ্রায় স্বপ্ন দর্শন হয়, তাহা গাঢ়নিদ্রা নহে। তাহাতে কেবল ইন্দ্রিয়গণ নিষ্পন্দ হয়, এইমাত্র। অর্থাৎ তাহারা বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে না। স্বপ্নে ইন্দ্রিয়গণ মনে প্রবেশ করে। এই সময় মন পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ একটী মিথ্যা জগৎ প্রস্তুত করে; এবং সেই মিথ্যা জগতেই নানাবিধ কর্ম্ম করত সুখ-দুঃখের অধীন হয়। যতক্ষণ স্বপ্ন দর্শন হয়, ততক্ষণ ঐ সমস্ত কর্ম্মকে সত্য এবং ঐ সুখদুঃখকে প্রকৃত বলিয়াই বোধ হয়। নিদ্রাভঙ্গ হইলেও কিয়ৎকাল ঐ স্বপ্নকে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বোধ হইতে পারে; এবং তজ্জনিত সুখ দুঃখকেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সত্য বলিয়া বিবেচনা হইতে পারে। স্বপ্নে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে না সত্য; কিন্তু মনঃকল্পিত অন্তর্জগতে ঐ সকল ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কর্ম্ম করে। মুদিত চক্ষু দর্শন করে, অপ্রযুক্ত কর্ণ শ্রবণ করে। যাহার বাহ্য অস্তিত্ব নাই, তাহাই দেখে ও তাহাই শুনে। বাহ্য বস্তু হইতে আলোক-তরঙ্গ চক্ষুতে, এবং বায়ুমণ্ডলের তরঙ্গ কর্ণে প্রবেশ করিয়া উপযুক্ত শিরা-সংযোগে মস্তিষ্কে নীত হইলে দর্শন বা শ্রবণ ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু যখন চক্ষু মুদিত, কর্ণ অপ্রযুক্ত, বাহ্যবস্তু অথবা বায়ুমণ্ডল হইতে কোনরূপ তরঙ্গ চক্ষুকর্ণে প্রবেশ করে না, এবং উপযুক্ত শিরাযোগে মস্তিষ্কেও নীত হয় না, তখন দর্শন ও শ্রবণ কার্য্য কিরূপে হয়? শরীর-তত্ত্ব ইহার কোনই উত্তর দেয় না। যদি বা কিঞ্চিৎ উত্তর দিবার চেষ্টা করে, তাহাও মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম তন্তুর পূর্ব্বানুভূত স্পন্দনের সহিত সংযুক্ত করিয়া একরূপ দুর্ব্বোধ ও নিষ্ফল করিয়া তোলে। তাহার মর্ম্ম এইরূপ যে, আমরা মস্তিষ্কে যে সকল ভাব পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছি, তাহারই স্পন্দন যেন মস্তিষ্কে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে; স্বপ্নাবস্থায় উহাই উদ্দীরিত হয় মাত্র। এ কথায় কিছুই বুঝা যায় না; এবং অনেক ঘটনার সদুত্তর হয় না। প্রথমতঃ একটী সর্ব্বজন-জ্ঞাত বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইবে। সকলেই জানেন অনেক স্বপ্ন সত্য হয়। যাহা ভূতকালে ঘটিয়াছে, কিন্তু আমার জানা নাই, তাহাই হয়ত

স্বপ্নে দর্শন করিলাম। অথবা যাহা এখনও ঘটে নাই, তাহাই দর্শন করিলাম। তৎপরে জ্ঞাত হইলাম যে, ঐ স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা প্রকৃত পক্ষেই ঘটিয়াছিল অথবা ঘটিল। এরূপ স্বপ্ন অনেকেই দর্শন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এরূপ হয় কেন? আমার মস্তিষ্কে ঐরূপ ঘটনার কোনই অনুভূতি অথবা প্রতীতি নাই, তথাপি উহা আমি স্বপ্নে দর্শন করিলাম, আর ঐ স্বপ্ন সত্য হইল। এই অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপারের মূল কি?

স্বপ্নকে, আমার বোধ হয়, দুইভাগে বিভাগ করা যায়; (১) দেহজ ও (২) মনোজ। অনেক সময় দেখা যায় যে, দেহের ভাবান্তর হইলে স্বপ্ন দর্শন হয়। গুরুতর ভোজনের পর নিদ্রিত হইয়া দেখিয়াছি যে, যদি উদর স্ফীত হইয়াছে অথবা স্ফীত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা হইলে নানারূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। বৈকারিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মস্তকে অধিক রক্ত উঠিলে, কিম্বা রক্তহীনতা হইলেও রোগী নানারূপ দৃশ্য দর্শন করে। উহাকে ঠিক স্বপ্ন না বলিলেও একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, উদরের অজীর্ণাবস্থা এবং শরীর-যন্ত্রের অস্বাভাবিক অবস্থায় নিদ্রাযোগে নানারূপ স্বপ্ন দর্শন হইয়া থাকে। ইহাই দেহজ স্বপ্ন। আর যে স্বপ্নের সহিত দেহের সংশ্রব নাই, কেবল মনেরই কার্য্য, তাহাই মনোজ স্বপ্ন। ইহা সম্পূর্ণরূপে মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। কিন্তু মনের অনুভূত পদার্থ স্বপ্নে দৃষ্ট হইতে পারে এবং যাহা অনুভূত নহে, তাহাও দৃষ্ট হইতে পারে। এই শেষোক্ত স্বপ্নগুলিই আমার আলোচ্য বিষয়। যে সকল স্বপ্ন আমার পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের নহে, তাহা কিরূপে সত্য হয়? অনেকেই নিজ নিজ স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা আলোচনা করিলে স্মরণ করিতে পারিবেন যে, এই শ্রেণীর স্বপ্নের প্রায়ই কোন নিকট-আত্মীয় অথবা বন্ধুর সহিত সংশ্রব থাকে। আমি স্বপ্নে দেখিলাম, অমুক বন্ধুকে মৃত অবস্থায় আঙ্গিনাতে বাহির করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃতপক্ষেই অত্যল্প কাল পরে সংবাদ পাইলাম যে, সেই বন্ধু ঐ স্বপ্নদৃষ্ট সময়েই মৃত হইয়াছেন। (১) রংপুর জেলার পুলিস্ আফিসের হেড ক্লার্ক শ্রীমান রজনীকান্ত মৈত্রেয় তাহার পিতৃবিয়োগ সময়ে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিল; এবং পরে সেই স্বপ্ন সত্য বলিয়া জানা গিয়াছিল। (২). একটী ভদ্রমহিলা আমাকে বলিয়াছেন যে তাঁহার স্বামী কখনই সুরাপান করিতেন না; কিন্তু যে দিন দূরদেশে বন্ধুবর্গের অনুরোধে তিনি প্রথম সুরাপান করেন, সেই দিনই রাত্রে ঐ মহিলা সেই বিষয় স্বপ্ন দেখেন এবং অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পতিকে পত্র লিখিয়া জ্ঞাত হইয়াছিলেন যে ঐ স্বপ্ন সত্য।

পাঠকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই এইরূপ দুই একটি কিম্বা ততোধিক সত্য স্বপ্নের বিষয় স্মরণ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ইহারই মূল অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এ প্রবন্ধে যে সকল স্বপ্নের উল্লেখ করা হইল, সে সমস্তই সত্য; তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

স্বপ্ন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। ঐ বিষয় কোন কোন উপনিষদ এবং সিফাৎইস্রিরোজা নামক গ্রন্থে প্রাচ্য ও প্রাচীন মত আলোচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য মত প্রাচীন কালে প্লেটো, সিসিরো প্রভৃতি বিবৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে মরে, উন্ট, কার্পেণ্টার, স্কানার, ভকেণ্ট প্রভৃতি এ বিষয়ে বিশেষরূপে অনুশীলন করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান এবং শরীর বিজ্ঞানের দিক হইতে স্বপ্ন নানারূপেই বিবেচিত হইয়াছে। সে সকল কথার পুনরালোচনা করিবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। কেবল যে সকল স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়, তাহাই এ প্রবন্ধে বিবেচনা করিব। অনেক সময় দেখা যায় যে স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, কিন্তু স্বপ্ন-দ্রষ্টার জানা ছিল না; অথবা ঐ বৃত্তান্ত ভবিষ্যৎকালে প্রকৃত পক্ষেই ঘটিয়া গেল। এইরূপ হইবার কারণ কি? যাহা সত্যই ঘটিয়াছে, অথবা ঘটিবে তাহা স্বপ্নে কেমন করিয়া জানা যায়? এই অতি আশ্চার্য্যজনক ঘটনার মূল অনুসন্ধান করিতে পারিলে জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে; এই জন্যই এ বিষয় অতীব গুরুতর এবং এই জন্যই ইহার সম্যক্ আলোচনা হওয়া উচিত।

অনেকেই জীবনে সত্য-স্বপ্ন * দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে ভালরূপ বলিতে পারেন না। কিছু দিন হইল আমি একটি সত্য-স্বপ্নের তালিকা প্রস্তুত করিতেছিলাম; উদ্দেশ্য এই ছিল যে বহুসংখ্যক সত্যস্বপ্নের বৃত্তান্ত জানা গেলে, এই বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিবার সুবিধা হইবে। সেই তালিকা হইতে কতিপয় স্বপ্ন এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। পরে যথাসাধ্য মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

(৩) রাজসাহী জেলার জজ কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘটক স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার পিতা ভিজা গায়ে, ভিজা কাপড়ে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পিতার আর্দ্র কেশ এবং আর্দ্র বস্ত্র হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে; এবং তিনি শীতে পীড়িত হইয়াছেন। এই স্বপ্ন দেখিবার পর মোহিনীমোহনের নিদ্রাভঙ্গ হয়। পরদিন তিনি জানিতে

* এইরূপ স্বপ্নকে "সত্য স্বপ্ন" বলা যাইবে।

পারিলেন যে তাঁহার পিতা ঐ স্বপ্ন দৃষ্ট সময়েই নৌকা ডুবিয়া গোয়ালন্দের নিকট নদী মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলেন; এবং তখনই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

(৪) চতুর্থ স্বপ্নটী এইরূপ। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী জেলা পাবনা, মহকুমা সিরাজগঞ্জের অধীন মেটুয়ানী গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্রবধূ অন্তঃসত্বা ছিলেন। তিনি স্ব প্ন দেখিলেন যে, তাঁহার একটী পৌত্র ভুমিষ্ঠ হইয়াছে। সত্যই প্রায় এক মাস পরে তাঁহার একটী পৌত্র জন্মিল। এই ব্যক্তি অল্প দিন হইল স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে (৫) তাঁহার পৌত্রী আসিয়া বলিতেছে, "দাদা, তুমি আমাকে আনিলে না; আমি একাই আসিলাম।" পৌত্রী তখন নিকটবর্ত্তী কানসোনা গ্রামে বাস করিত। এই স্বপ্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভাত সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দর্শন করেন। পরে, বেলা ৯।১০ টার সময় সংবাদ পাইলেন যে, ঐ স্বপ্নদৃষ্ট সময়ে তাঁহার পৌত্রীর অভাব হয়।

(৬) গত ২০শে শ্রাবণ (১৩১৩) জেলা রাজসাহী, ষ্টেশন বড়াইগ্রামের অধীন, নগরগ্রাম-নিবাসী জানকীনাথ রক্ষিত রামপুর-বোয়ালিয়াতে শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার স্বগ্রামবাসী এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছে, "আপনি এখানে কি করিতেছেন? আপনার কন্যা বাঁচে না!" কন্যা ইন্দুপ্রভা তখন নগর গ্রামে তাঁহার নিজ বাটীতে ছিল। রক্ষিত মহাশয় এই স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হন। তৎ পরদিন বেলা ২টার সময় টেলিগ্রাম সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, তাঁহার কন্যা অত্যন্ত কাতর। ঐ টেলিগ্রাম প্রাতে ১০॥০ টার সময় নগরের নিকটবর্ত্তী চাটমোহর আফিসে করা হইয়াছিল। এই স্বপ্নটীর সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবেন যে, তৃতীয় ব্যক্তি কন্যার কাতর সংবাদ বলিয়াছিল, কন্যা স্বয়ং বলে নাই।

(৭) এস্থলে আমার নিজের জন্ম সম্বন্ধে আমার স্বর্গগতা মাতৃদেবী যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিতেছি। এই বৃত্তান্ত আমি প্রাপ্ত-বয়স্ক হইলে আমার মাতা, এবং পিতামহী ঠাকুরাণীর নিকট শুনিয়াছি। আমার দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, মাতৃদেবী পুত্রশোকে অতীব কাতরা হন। তৎপর দীর্ঘকাল তাঁহার আর সন্তান হইল না। এই অবস্থায় আমার পিতামহী আমার পিতৃদেবের পুনরায় দার-পরিগ্রহের প্রস্তাব করেন। তাহাতে মাতৃদেবী আরও ব্যথিতা হন। তিনি এক দিন শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার পরলোকগত পিতা তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুই আর দুঃখ করিস না, আগামী অগ্রহায়ণ মাসে আমাকে কোলে পাইবি; আমার

পৃষ্ঠে যে ছিদ্রটী তুই বাল্যকালে টিপিয়া দিতিস, সেই চিহ্ন দ্বারাই আমাকে চিনিতে পারিবি।" এস্থলে বলা আবশ্যক যে, আমার মাতামহ আমার মাতৃদেবীকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। মাতৃদেবী এই স্বপ্ন দেখিয়া তখনই জাগ্রত হইয়া আমার পিতৃদেবকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন। বাবার আর বিবাহ করা হইল না। আমার পিতামহীও এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বীয় পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ বন্ধ করিলেন। মা এই স্বপ্ন মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসে দেখিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে মায়ের গর্ভসঞ্চার হয়, এবং সত্যই সত্যই আমি অগ্রহায়ণ মাসে ভূমিষ্ঠ হই। আমার পৃষ্ঠে ঐ ছিদ্রটী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। আমার মাতৃদেবী অতীব ধর্ম্মপরায়ণা ও শুদ্ধচিত্তা ছিলেন।

(৮) রাজসাহী জেলার নওগাঁও মহকুমার অধীন মৈনমগ্রামে হারাণচন্দ্র রায় মহাশয় বাস করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পর এক রাত্রিতেই তাঁহার মাতা ও পত্নী প্রায় এক মুহূর্ত্তেই স্বপ্ন দেখেন যে, হারাণ রায় মহাশয় বলিতেছেন "আমি বেশীদিন থাকিতে পারিলাম না, আবার তোমাদের নিকটই আসিতেছি।" উভয়ে এইরূপ স্বপ্ন দেখিবার ৩।৪ দিন পরে রায় মহাশয়ের পুত্রবধূ স্বপ্ন দেখিলেন যে, রায় মহাশয় তাঁহাকে বলিতেছেন "আমি আবার আসিতেছি, তোমার সন্তান হইলে তাহাকে বলিও না যে, সে আমিই। আমার মাকে ও স্ত্রীকে এই কথা পূর্ব্বে জানাইয়াছি, অদ্য তোমাকেও জানাইলাম।" রায় মহাশয়ের পুত্রবধূ এই সময়ে চার কি পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, পরে যথা সময়ে এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। এই বালকের বর্ত্তমান নাম হেমচন্দ্র রায়, বয়স এখন ১০।১১ বৎসর। হারাণ রায় মহাশয় স্বপ্ন-দর্শন কালে "আসিয়াছি" কি "আসিতেছি" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে জানা যায় নাই।

(৯) নাটোর-নিবাসী মৌলবী এসাদ আলী খাঁ চৌধুরী শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তিনি মেদিনীপুর জেলায় গিয়াছেন। তথায় তাঁহার গুরুদেবের পিতার সমাধি-মন্দিরের নিকট বসিয়া আছেন, নিকটে একটী মস্‌জিদ আছে; কিন্তু সমাধি-মন্দিরের চূড়া মস্‌জিদ অপেক্ষা উচ্চ। মৌলবী সাহেব কিছুক্ষণ তথায় বসিয়া থাকিলে পর একজন কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে "আপনার গুরু তাঁহার পিতার সমাধি-স্তম্ভ ঐ মস্‌জিদ অপেক্ষা উচ্চ করিয়া নির্ম্মিত করায় বড়ই গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। একথা আমি একা বলি না, শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলি প্রভৃতি অনেকেই বলেন।" ঐ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি

নিজ পরিচয় দিয়াছিল এবং মৌলবী সাহেবেরও পরিচয় লইয়াছিল। পরে ১৪।১৫ দিন অন্তে মৌলবী সাহেব সত্যই মেদিনীপুর যান, এবং তাঁহার গুরুদেবের পিতার সমাধি-স্তম্ভের নিকট বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সত্যই এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করেন এবং আত্মপরিচয় দিয়া, স্বপ্ন দৃষ্টমত কথা বলিয়াছিলেন। স্বপ্নে ঐ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তির যেরূপ আকৃতি দৃষ্ট হইয়াছিল, সত্যই সে তদ্রূপই; এবং স্বপ্নে মস্‌জিদের চূড়া অপেক্ষা সমাধি-স্তম্ভের চূড়া উচ্চ হওয়ায় সে যে সকল দোষারোপ করিয়াছিল, এবং মহম্মদ আলি প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছিল, সত্যই সে ঠিক সেইরূপ কথাই মৌলবী সাহেবকে বলিয়াছিল। এস্থলে লক্ষ্য করিবেন যে, স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত নিজ বা নিজের কোন আত্মীয়ের সুখদুঃখের সহিত জড়িত নহে, এবং স্বপ্নের ঐ কৃষ্ণকায় ব্যক্তি মৌলবী সাহেবের কেহই নহে। বলা বাহুল্য যে, মৌলবী সাহেব মেদিনীপুর যাওয়ার এবং ঐ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করার পূর্ব্বে স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত কাহাকেও প্রকাশ করেন নাই এবং পূর্ব্বে তিনি কখনও মেদিনীপুর যান নাই।

(১০) বগুড়ার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী মহাশয়ের মাতা অতি প্রাচীনা। তিনি দীর্ঘকাল পীড়িত থাকায় নানারূপ চিকিৎসাতেও কোন ফল হয় নাই। অবশেষে তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাযুক্ত হইয়া উঠিল। এই সময় তিনি একদিন শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, কে যেন তাঁহাকে একটী ঔষধ বলিল, এবং তাহা সেবন করিলে তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন, একথাও বলিয়া গেল। তিনি ঐ কথা স্বীয় পুত্রের নিকট প্রকাশ করায় মাতৃবৎসল পুত্র অবিলম্বে ঐ ঔষধ সংগ্রহ করিয়া দিলেন, এবং সত্যই ঐ ঔষধ সেবনে চাকী মহাশয়ের মাতা অবিলম্বে আরোগ্যলাভ করিলেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন। এস্থলে লক্ষ্য করিবেন যে স্বপ্নে ঔষধের বস্তু পাওয়া যায় নাই; কেবল ঔষধের উপকরণ গুলির বিষয় উপদেশ পাওয়া গিয়াছিল।

(১১) ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাওয়ালি গ্রামে শ্রীযুক্ত গুরুদাস আদক বাস করেন। তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর। ৭।৮ মাস মাস হইল বাওয়ালিতে একদিন প্রায় শেষ রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন, তাঁহার ঠাকুরমাকে গঙ্গাযাত্রা করিতেছে এবং তিনি কাঁদিতেছেন। ঠাকুরমা তৎকালে ভবানীপুরে চিকিৎসা করাইতে-ছিলেন। ঐ স্বপ্ন দেখিবার পর দিবস এক ব্যক্তি আদক মহাশয়কে বলিল

"তোমার ঠাকুরমা মারা গিয়াছেন।" তাঁহার ঠাকুরমার প্রকৃতই সেই রাত্রেই মৃত্যু হইয়াছিল।

(১২) বগুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্রের ভ্রাতৃজায়া ক্ষয়কাশি পীড়াতে অত্যন্ত কাতরা ছিলেন। তাঁহার বয়স তখন ১৬।১৭ বৎসর। এই বালিকা একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি যে ঘরে শুইয়াছিলেন ঐ ঘর সহসা আলোকে পূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে সেই বিস্তৃত আলো যেন এক স্থানে একত্রিত হইল এবং কেন্দ্রস্থানে তাঁহার একজন আত্মীয়ার মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। ঐ আত্মীয়া অনেক দিন পূর্ব্বে মরিয়াছিলেন। আত্মীয়া স্ত্রীলোকটী বালিকাকে একটী জবাফুল ও বেলের পাতা ও একটী অপরিচিত ফল দেন, এবং তাহা খাইলে ঐ ক্ষয়কাশি আরাম হইবে এই কথা বলেন। পরে পীড়িতা সেবন করায় রোগ আরাম হইয়াছিল।

(১৩) রাজসাহীর উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাতুলালয়েই প্রতিপালিত। তাঁহার মাতুল তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁহার মাতুলানী বিধবা হইয়াছেন। মাতুলের স্বাস্থ্য সে সময় ভাল ছিল, তাঁহার মৃত্যুর কোন আশঙ্কা ছিল না। পরে দেবেন্দ্র বাবু জানিতে পারিয়াছিলেন যে, যে রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন সেই সময়েই তাঁহার মাতুলের মৃত্যু হইয়াছে।

(১৪) বগুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রের নাম যামিনীকান্ত ও স্ত্রীর নাম ছিল কুমুদিনী। ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে যামিনী তাঁহার স্ত্রীকে নিজবাড়ী ঢাকা জেলাস্থ কোরহাটি গ্রামে আনিলেন। তখন ঐ গ্রামে ওলাউঠা হইতেছিল। কুমুদিনী স্বীয় পতিকে বলিলেন যে, তাঁহাকে "এ সময় আনা হইল, পাছে কি হয়।" এই কথায় বোধ হয় যে কুমুদিনী ওলাউঠার ভয়ে ভীতা হইয়াছিলেন। ইহার দুই তিন দিন পর যামিনী কলিকাতা আসিলেন; তথায় অল্পদিন থাকিবার পর ১৫ই অগ্রহায়ণ রাত্রি প্রভাত হইবার সময় (তখন ৫টা বাজিয়াছিল) যামিনী স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার স্ত্রীর তলপেটে ব্যথা, হাতে খিঁচুনি (Cramp) হইতেছে, এবং তিনি বারম্বার জল খাইতে চাহিতেছেন। যামিনীর তখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি স্বীয় পত্নীর ওলাউঠা হওয়া বিবেচনা করিলেন। স্বপ্নে তিনি কয়েকটী আত্মীয়স্বজনকে কুমুদিনীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন; এবং কুমুদিনীকেও শয়ানা দেখিয়াছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে (১৬ই

অগ্রহায়ণ) তিনি সেই স্বপ্নের কথা আত্মীয়গণকে বলিয়া সেই দিনই বাড়ী রওনা হইলেন; এবং সেই দিনই রাত্রি ৮৷৯টার সময় বাড়ী পৌছিলেন। তখন দেখেন যে, সত্যই তাঁহার স্ত্রীর পূর্ব্বরাত্রি দুই তিন ঘটিকার সময়, অর্থাৎ তাঁহার স্বপ্ন দেখিবার দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে, ওলাউঠা হইয়াছিল। যামিনী স্বপ্নে যে সকল লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, এবং যে ব্যক্তিদিগকে কুমুদিনীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন; তাহাই প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাইলেন। শেষ রাত্রি (১৬ই অগ্রহায়ণ) প্রায় প্রভাতের সময় কুমুদিনীর মৃত্যু হয়।

(১৫) রাজসাহীর উকিল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র মাহিন্তা একরাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিতেছেন "তোমার খুল্লপিতামহ আর দীর্ঘকাল বাঁচিবেন না।" ঐ খুল্লপিতামহ মহিমচন্দ্রের পিতার লোকান্তর হইতে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়া লালনপালন করিতেন। যখন মহিমচন্দ্র স্বপ্ন দেখেন, তাহার অনেক দিন পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষেও এই স্বপ্নদর্শনের ১৫৷১৬ দিন পরেই, তাঁহার খুল্লপিতামহের মৃত্যু হয়।

(১৬) একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটী সত্য-স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। তাঁহার প্রথম স্বপ্নটী গেলাসের বিষয়। ঐ গেলাসটী হারাইয়া গিয়াছিল; অনেক অনুসন্ধানেও তাহা পাওয়া গেল না। যে দিন ঐ গেলাসটী হারায়, সেইদিন রাত্রেই মহিলা স্বপ্ন দেখেন যেন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহাকে বলিতেছে;—"মা, তুমি গেলাস খুঁজিতেছ, গেলাস ময়লা-ফেলা নর্দ্দামায় পড়ে আছে।" পরদিন প্রাতে ঠিক্ সেই স্থানেই গেলাসটী পাওয়া গিয়াছিল।

মহিলার আর একটী স্বপ্ন এইরূপ—(১৭) তাঁহার অতি নিকটবর্ত্তী কোন আত্মীয় ৺ পুরীধাম দর্শন জন্য গিয়াছিলেন। তৎপরে দীর্ঘকাল ঐ আত্মীয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। একদিন রাত্রে মহিলা স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, "ঐ আত্মীয়া এক-মাথা রুক্ষকেশ লইয়া মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া নামাবলী গায়ে দিয়া তাঁহাদের বাড়ী আসিয়াছেন।" সত্য সত্যই পরদিবস ঐ আত্মীয়া ঠিক্ সেই বেশে তাঁহাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন।

(১৮) মহিলার তৃতীয় স্বপ্ন তাঁহার গৃহপালিত হাঁসের বিষয়। হাঁসগুলির

ডিম হইত না। তিনি সে জন্য অনেক সময় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। একরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার হাঁস ডিম পাড়িয়াছে। যথার্থই পরদিবস হইতে হাঁসগুলি ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল।

(১৯) শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। ১৩১২ সালের ১৯ কার্ত্তিক তারিখে তাঁহার অভাব হয়। অভাব হইলে কিছু দিন পরে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (ইনি ঐ হাইকোর্টের এটর্ণি), এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে অমরেন্দ্র তাঁহার কন্যাকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন; কিন্তু তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা তত্ত্বময়ী দেবী নিষেধ করিতেছেন। কন্যার নাম শ্রীমতী গোঁসাঞীদাসী দেবী। তাঁহাকে তাঁহার স্বামী বড়ই কষ্ট দিতেন) অমরেন্দ্র তাহা জীবমানে দেখিয়া গিয়াছেন। এই স্বপ্নের প্রায় দুই সপ্তাহ পরে শ্রীমতী গোঁসাঞীদাসীর মৃত্যু হয়।

(২০) ডাক্তার যোগেশচন্দ্র রামপুর বোয়ালিয়া চিকিৎসা করেন। তাঁহার একটী মূল্যবান ঘড়ী ছিল, তাহা সময় সময় চলিত না। একবার মেরামত করিয়া লইবার পরই বন্ধ হইল। তিনি দুঃখিত হইলেন। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন যে, ঘড়ীটী চলিতেছে। পর দিন প্রাতে জাগ্রত হইবার পর দেখিলেন যে সত্যই ঘড়ীটী চলিতেছে।

(২১) (২২) (২৩) একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা * লিখিতেছেন যেঃ—

প্রায় দুই বৎসর হইল আমাদের একটী ওয়াচ্ ঘড়ী ছিল। সেটী অল্প দিনের মধ্যে দুই তিন বার ভাঙ্গিয়া যায়। তজ্জন্য সেটীকে খুব সাবধানে দম দেওয়া ও ব্যবহার করা হইত। একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম, ঘড়ীটীতে দম দিতেছি, আর একপ্রকার শব্দ করিয়া ঘড়ীটী ভাঙ্গিয়া গেল। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে দম দিতে গিয়া আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় খুব সাবধানে দম দিতেছিলাম; কিন্তু হঠাৎ ঠিক্ সেই রকম শব্দ করিয়া সত্য সত্যই ঘড়িটী ভাঙ্গিয়া গেল।

আমাদের বৃদ্ধা দাসী কয়েক দিনের জন্য অন্যত্র গিয়াছিল। তার অসিবার পূর্ব্ব দিন রাত্রে স্বপ্ন দেখি যে, আমার কনিষ্ঠ পুত্রটীকে বাহির হইতে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে বাড়ীর ভিতর আসিল। তাহার হাতে একটী ভিজা কাপড়ের পুঁটুলী, পায়ে খুব বেদনা ও ফুলা পথচলার জন্য হইয়াছে।

* শ্রীমতী অনুজা ঘোষজায়া, তুফানগাও।

পরদিন অবিকল সেই ভাবে সে বাড়ী আসিল; এবং যথার্থই পায়ে ফুলা ও বেদনা হইয়াছিল।

আমার স্বামী সরকারী কার্য্য উপলক্ষে ঘোড়ায় চড়িয়া স্থানান্তর গিয়াছিলেন। পথে ঘোড়া হইতে পড়িয়া যান। সে স্থান এখান হইতে প্রায় ৭।৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। আমি সে দিন কোনরূপ সংবাদ পাই নাই। কিন্তু পড়িয়া যাইবেন, এরূপ সম্ভাবনাও নাই। তথাপি রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যে, তিনি পড়িয়া গিয়াছেন, দুই তিন জন লোকে তাঁহার কোমরে তোক মালিস্ করিয়া দিতেছে। আমি পর দিন অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া পত্র দিয়া লোক পাঠাইলাম। সে সন্ধ্যাকালে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিল, স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্যাপার সমস্তই সত্য।

স্বপ্ন তিনটীর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়টী ভোর রাত্রে দেখা; তৃতীয়টী মধ্য রাত্রের।

(২৪) (২৫) (২৬) (২৭) (২৮) শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বপ্ন পাঁচটী বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

আমার খুল্লতাত ৺রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের আবাসবাটীতে পীড়িত ছিলেন। আমি সে সময় হাজারিবাগ কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য্য করিতাম। একদিন রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিলাম যে, খুল্লতাত মহাশয়কে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিতেছি—দেহ অসাড়; প্রাতঃকালেই আমি উঠিয়া সেই তারিখটি ও আনুমানিক সময়টি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলাম। তাহার কয়েক দিন পরই বাটীর পত্রে জ্ঞাত হইলাম যে, খুল্লতাত মহাশয় ঠিক সেই তারিখেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ মহাশয় কলিকাতা সেণ্ট্রাল কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক। তিনি বলিয়াছেন যে, যখন আমাদের তৃতীয়া মাসীমাতাঠাকুরাণীর পরলোক প্রাপ্তি হয়, তখনও তিনি সেই ঘটনার বিষয় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, একদিন প্রভাতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে নোয়া মাসীমা হরিনামের মালা হাতে করিয়া শীর্ণ দেহে তাঁহার নিকট বলিতেছেন—"ত্রৈলোক্য, তোরা খুব সংকীর্ত্তন কর।" দাদামহাশয় তৎপর দিবসই বাটী হইতে পত্র পাইলেন যে, ঠিক সেই দিন এবং ঠিক সেই সময়েই মাসীমাতাঠাকুরাণী দিব্যধামে প্রস্থান করেন।

যখন আমি সোণবর্ষায় মহারাজ ৺হরবল্লভ নারায়ণ সিংহ মহোদয়ের

অধীনে কার্য্য করিতাম, তখন মান্‌সী ষ্টেসন হইতে সোণবর্ষা যাইবার পথে একটি স্থান দেখিয়া তাহা আমার পূর্ব্ব পরিচিত বলিয়া বোধ হইল, অথচ আমি তৎপূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে কোন দিনই যাই নাই। সেই স্থানটীতে আমার যান নামাইয়া বাহকেরা বিশ্রাম করিতেছিল; আমি যান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক স্থানটি বেষ্টন করিয়া দেখিতে লাগিলাম। যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই আমার নিকট উহা পরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তারপর ভাবিতে ভাবিতে আমার বেশ মনে পড়িল যে, ঠিক এক বৎসর কি দশমাস পূর্ব্বে এক দিন রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে,আমি এই পথে যাইতেছি। স্বপ্নের অন্যান্য ঘটনার সহিত বর্ত্তমান গমনের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না; কিন্তু এই স্থানটি দিয়া যাইতেছিলাম এবং এখানে বিশ্রাম করিয়াছিলাম; তাহা আমার নিকট সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল এবং ইহাও মনে পড়িল যে আমার স্বপ্নে সেখানে একটি দেবীমন্দির দেখিয়াছিলাম। এই কথা মনে হইবা মাত্র আমার বাহকগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার নিকটে কোন দেবীমন্দির আছে কিনা। তদুত্তরে তাহারা অদূরস্থিত একটি আম্রকুঞ্জ দেখাইয়া বলিল যে, সেখানে "মাই কাতানি কি স্থান" অর্থাৎ কাত্যায়নী দেবীর মন্দির আছে। ইহা জানিয়া আমি এক বৎসর পূর্ব্বের স্বপ্নের সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। বলা বাহুল্য ইতিপূর্ব্বে আমি এই দেবীস্থানের বিষয় কিছুই অবগত ছিলাম না।

কয়েক মাস পূর্ব্বে সিটি কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ খালি হয়। আমিও ঐ পদের একজন প্রার্থী ছিলাম। একদিন আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, শ্রীযুক্ত হরনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয় ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তৎপর দিবসই আমি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর মহাশয়ের নিকট কলিকাতায় আমার এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাইয়া ইহা সত্য কিনা তাহা জানিতে চাহিলাম। দাদা আমাকে প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে "তোমার স্বপ্ন আশ্চর্য্যরূপেই ফলিয়াছে; হরনাথ বাবুই ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন" অথচ শ্রীযুক্ত হরনাথ বাবু যে ঐ পদের প্রার্থী আছেন, তাহা পর্য্যন্তও আমি অবগত ছিলাম না।

আজ কয়েক মাস হইল একদিন শেষ রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখিলাম যে, আমার নিকট একটি টেলিগ্রাম আসিল; অথচ সে সময় কোন টেলিগ্রাম আসিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিলনা, অথবা আমি সে বিষয়ে কোনও চিন্তা করি নাই। পরের দিবস সত্য সত্যই এক টেলিগ্রাম আমার নামে আসিল;

এবং স্বপ্নের টেলিগ্রামে যে যে কথা লিখা ছিল এবং যেখান হইতে আসিল, দেখিয়াছিলাম, এই প্রকৃত টেলিগ্রামও ঠিক সেখান হইতেই আসিয়াছিল, এবং তাহাতে ঠিক ঐ সব কথাই ছিল।

(২৯) স্বদেশপ্রেমিক শ্রীযুক্ত লালা লজপৎ রায় ও শ্রীযুক্ত অজিৎ সিংহজি ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া মান্দালয়ে কারারুদ্ধ থাকা কালে গত ৫ই আশ্বিন সিংহজি স্বপ্ন দেখেন যে, পরলোকগত কর্ত্তার সিংহ তাঁহাকে বলিতেছেন, "তোমরা উভয়েই ১১ নবেম্বর (২৫ কার্ত্তিক) কারামুক্ত হইবা। * প্রকৃত প্রস্তাবেও অকস্মাৎ তাহাই হইয়াছিল।

সত্য স্বপ্ন এত অধিক ব্যক্তি দেখিয়া থাকেন যে, তাহার তালিকা করিতে গেলে বোধ হয় উহা কখনই শেষ হইবে না। কিন্তু উহার সংখ্যা অপেক্ষা উহা কি প্রকারের, তাহাই বিবেচনা করা অধিকতর আবশ্যক। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই শ্রেণীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত অনুশীলন করিলে জীবাত্মার স্বরূপ ন্যূনাধিক পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায়। তন্নিমিত্তই এ বিষয়টি এত গুরুতর।

আমি সূচনায় স্বপ্নকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলাম; দেহজ ও মনোজ। অজীর্ণতা ইত্যাদি শারীরিক কারণে যে সকল স্বপ্ন দেখা যায়, তাহাকে দেহজ বলিয়াছি। আর যে সকল স্বপ্ন মনের কার্য্য, তাহাকে মনোজ নামে অভিহিত করিয়াছি। মনোজ স্বপ্ন দ্বিবিধ। (১) মনের অনুভূত পদার্থ অথবা চিন্তিত বিষয়ের অনুরূপ স্বপ্ন। (২) মনের অননুভূত পদার্থ এবং অচিন্তিত বিষয়ের স্বপ্ন। স্বপ্ন-দর্শক যাহা কখন অনুভব করেন নাই, যে বিষয় কখন চিন্তাও করেন নাই; যাহা অতীত অথচ অজ্ঞাত ঘটনা, যাহা ভবিষ্যৎ ঘটনা সুতরাং

---

* To Sirdar Ajit's dream the late Kartar Sing appeared in dream on the 22nd Sept. and told he would be released on the 11th Nov.

Bande Mataram.

ঐ বন্দেমাতরং পত্রিকাতেই পুনরায় প্রকাশিত হয় যে "On a certain night in the month of October he (Ajit) had a dream Kartar Singh a friend of his (accused in the Lahor Riot case who died about 20 days ago) told him in a dream that both the deportees would be released on the 11th November.

সুতরাং স্বপ্নের তারিখ সম্বন্ধে গোলমাল হইতেছে। এ সম্বন্ধে নিশ্চয় অনুসন্ধান করিতে পারি নাই।

জানা সম্ভবই নহে ;—তাহা স্বপ্নে দৃষ্ট হইল এবং সেই স্বপ্ন সত্য হইল। ইহার কারণ কি ? ইহার অর্থ কি ? এই প্রকার স্বপ্নই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম।

উপরে যাহা বলা হইল, তদনুসারে স্বপ্নকে এইরূপে বিভাগ করা যাইতে পারে।
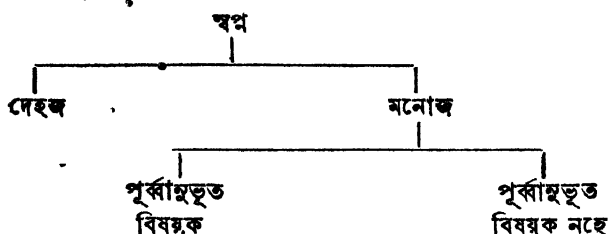
এই চিত্রে যাহাকে "পূর্ব্বানুভূত বিষয়ক নহে" বলিলাম, সে প্রকার স্বপ্ন সত্য হয় কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, ঐরূপ স্বপ্নের সার-সংগ্রহ করতঃ দেখিতে হয় যে, উহাদিগের মধ্যে সাধারণ লক্ষণ কিছু আছে কিনা ? ঐ শ্রেণীর সকল স্বপ্নের প্রতিই প্রযোজ্য হইতে পারে, এরূপ বিষয় আবিষ্কৃত হইলে তাহারই কারণ কল্পনা করা আবশ্যক। এই কল্পিত কারণ যত অধিক সংখ্যক স্বপ্ন-বৃত্তান্তের সহিত সামঞ্জস্য হইবে, ইহার সাহায্যে যত অধিক সংখ্যক বৃত্তান্ত বুঝা যাইবে, ততই এই কল্পিত কারণ দৃঢ়ীভূত হইয়া সিদ্ধান্তে পরিণত হইবে। তখন ইহাকে প্রকৃত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এক্ষণে স্মরণ করিতে হইবে যে, হিন্দু দর্শন-শাস্ত্রানুসারে মন একটি ইন্দ্রিয় মাত্র। যেমন চক্ষু-কর্ণাদি বাহ্য-ইন্দ্রিয়, তেমনই মন একটি অন্তর-ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানের দ্বার ; মন যখন ইন্দ্রিয়, তখন অননুভূত বিষয় মন দ্বারা কখনই জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে না। যাহা কোন-না-কোন রূপে মনে প্রতিফলিত হয় নাই, মন তাহা জানিতে পারে না। সুতরাং যে শ্রেণীর স্বপ্ন পূর্ব্বানুভূত বিষয়ক নহে, মনে তাহার কর্ত্তৃত্ব আরোপ করা যায় না। এই নিমিত্তই অন্য কারণ অনুমান করিতে হয়। সেই "অন্য". কি ? উহা কি প্রকার ? উহার স্বরূপ কি ? উহা কি প্রণালীতে কার্য্য নিষ্পন্ন করে ? এই সকল বিষয় আমা-দিগের বিবেচনা করা আবশ্যক হইয়াছে। উহা নিশ্চয়ই স্থূল দেহের অতীত পদার্থ ; কারণ স্বপ্ন-দর্শক মুহূর্ত্তমধ্যে দূর দেশের সত্য ঘটনা, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সত্য ঘটনা, স্বপ্নে দেখিয়া থাকেন। এ নিমিত্তই ঐ কারণ দেহাতীত পদার্থ, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু দেহের অবস্থা বিশেষে নিদ্রা এবং নিদ্রার অবস্থা বিশেষে স্বপ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐ কারণ দেহাতীত

হইলেও দেহের সহিত সম্বন্ধশূন্য নহে। এমন পদার্থ কি আছে, যাহা স্থূল দেহের অতীত অথচ দেহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত? এই স্থলেই সূক্ষ্মদেহের কল্পনা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এইভাবে বিবেচনা করিলে স্বপ্নকে তিন ভাগে বিভাগ করিতে হয়। (১) দেহজ, (২) মনোজ, (৩) সূক্ষ্মানুভূত।* উপরের চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে, যাহাকে "পূর্ব্বানুভূত বিষয়ক নহে" বলিয়াছি, এক্ষণে তাহাকেই সূক্ষ্মানুভূত বলিলাম।

পূর্ব্বে যে সকল স্বপ্নবৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছি, নিম্নে তাহার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম। অন্য যে সকল স্বপ্ন আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাও প্রায় ঐ প্রকারেরই; সুতরাং তাহার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক। নিম্নের সংগ্রহ পাঠ করিতে এই কয়েকটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

(১) স্বপ্ন-দর্শক নিদ্রিত অবস্থাতেও চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

(২) স্বপ্ন-দর্শক স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্বয়ং স্বপ্নে অন্যত্র গিয়া অবগত হইলেন? কি অন্যে আসিয়া তাঁহাকে জানাইল।

(৩) অন্যে জানাইয়া থাকিলে, তিনি তৎকালে জীবিত ছিলেন, কি মৃত হইয়াছিলেন? তিনি দর্শকের আত্মীয় কি নিঃসম্পর্কীয়? তাঁহার সহিত স্বপ্ন-দর্শকের কিরূপ ভাব?

(৪) স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত অতীত কি ভবিষ্যৎ? অতীত হইলে বহু পূর্ব্বের কি অল্প পূর্ব্বের ঘটনা? ভবিষ্যৎ হইলে, বহু পরে কি অল্প পরে ঘটিয়াছিল?

(৫) স্বপ্ন-দর্শনের সময়।

(৬) ঐ সময়ে দর্শকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা।

(৭) কোন বস্তু স্বপ্নে পাওয়া গিয়াছিল কিনা।

এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নের সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি করিলে আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও স্বরূপ যেরূপ ভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, তাহা পশ্চাৎ আলোচনা করিব।

সারসংগ্রহ।

প্রথম স্বপ্ন*। মৃত পিতা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দর্শকের নিকট আসেন। দর্শক পুরুষ, শেষ রাত্রির স্বপ্ন।

---

* এই শব্দ দ্বারা সূক্ষ্মদেহের অনুভূত বোধ করিলাম।

* উপরে যথাক্রমে যেরূপ ভাবে স্বপ্ন সকল উল্লেখিত হইয়াছে, প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি শব্দ সেইরূপ ভাবে বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় স্বপ্ন। দর্শক স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্যক্তির স্ত্রী। স্বপ্নাবস্থায় নিজে যাইয়া দেখেন। ইহা ঘটনার কিছু পরে দেখা।

তৃতীয় স্বপ্ন। শেষ রাত্রে দৃষ্ট হয়। পিতা অব্যবহিত পূর্ব্বে মরেন। তিনি আসিয়া স্বপ্ন দেখান। দর্শক পুরুষ।

চতুর্থ স্বপ্ন। পৌত্র জন্মিবার স্বপ্ন নিজেই দেখেন অর্থাৎ কেহ আসিয়া স্বপ্ন দেখায় নাই। স্বপ্নের প্রায় এক মাস পরে পৌত্র জন্মে। দর্শক পুরুষ।

পঞ্চম স্বপ্ন। পৌত্রী আসিয়া স্বপ্ন দেখায়। সে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। পৌত্রী অব্যবহিত পূর্ব্বে মরিয়াছিল। শেষ রাত্রের স্বপ্ন। দর্শক পুরুষ।

ষষ্ঠ স্বপ্ন। শেষ রাত্রের স্বপ্ন। কন্যার স্বগ্রামবাসী একজন জীবিত ব্যক্তি আসিয়া স্বপ্ন দেখায়। তাহার সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। দর্শক পুরুষ।

সপ্তম স্বপ্ন। মৃত পিতা আসিয়া স্বপ্ন দেখান। পিতা বহুদিন মরিয়াছিলেন। স্বপ্ন দর্শনের ১০।১১ মাস পরে কুমার ভূমিষ্ঠ হয়। দর্শক নারী।

অষ্টম স্বপ্ন। মৃত ব্যক্তি আসিয়া স্বপ্ন দেখান। অল্পদিন হইল মরিয়াছিলেন। আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। স্বপ্ন দর্শনের অল্প দিন পরে পুত্র জন্মে। দর্শক নারী।

নবম স্বপ্ন। শেষ রাত্রের স্বপ্ন। অপরিচিত জীবিত ব্যক্তি আসিয়া স্বপ্ন দেখান। কিন্তু স্বপ্ন-দর্শক দূরস্থ মসজিদ্ গোরস্থান ইত্যাদি দেখিয়াছিলেন। দর্শক পুরুষ।

দশম স্বপ্ন। শেষ রাত্রের স্বপ্ন। দর্শক কাতরা ছিলেন। স্বপ্নে ঔষধের নাম জানিতে পারিয়াছিলেন। অন্যে বলিয়াছিল। সে অপরিচিত। দর্শক নারী।

একাদশ স্বপ্ন। শেষ রাত্রে দেখেন। অন্যত্র গিয়া স্বয়ং দেখেন; কেহ দেখায় নাই। দর্শক পুরুষ।

দ্বাদশ স্বপ্ন। দর্শক নারী। শেষ রাত্রে দেখেন। যেন বিস্তৃত আলোক কেন্দ্রীভূত হইয়া মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। ঐ মূর্ত্তি ঔষধ দিল। পীড়িতা দর্শক ঔষধ পাইলেন।

ত্রয়োদশ স্বপ্ন। মাতুলানিকে বিধবা দেখেন। মাতুলকে মৃত দেখেন না। স্বয়ং অন্যত্র গিয়া দেখেন। পূর্ব্বে জানিতেন না। দর্শক পুরুষ।

চতুর্দ্দশ স্বপ্ন। দর্শক পুরুষ। শেষ রাত্রে দেখেন। স্বয়ং গিয়া দেখেন। দর্শকের মন উদ্বিগ্ন ছিল।

পঞ্চদশ স্বপ্ন। পিতা অনেক দিন মরিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া স্বপ্ন দেখান। স্বপ্নদেখার ১৫।১৬ দিন পরে ঘটনা ঘটিয়াছিল। দর্শক পুরুষ।

ষোড়শ স্বপ্ন। পুত্র জীবিত। তিনিই প্রকৃত স্থানের স্বপ্ন দেখান। দর্শক উদ্বিগ্না ছিলেন। তিনি নারী।

সপ্তদশ স্বপ্ন। নিজালয়ে স্বপ্ন দেখেন। দর্শক উদ্বিগ্না ছিলেন। দর্শনের পরদিবস নিজালয়েই ঘটনা ঘটে। দর্শক নারী।

অষ্টাদশ স্বপ্ন। রাত্রে দেখেন। পরদিন ঘটে। নিজবাড়ীতে দেখেন; সেখানেই ঘটে। দর্শক মনে মনে অসুখী ছিলেন। দর্শক নারী।

ঊনবিংশ স্বপ্ন। দর্শক পুরুষ। তিনি জীবিত কালে কন্যার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। স্বপ্ন দর্শনের অল্পদিন পরে ঘটনা ঘটে।

বিংশ স্বপ্ন। দর্শক পুরুষ, শেষ রাত্রের স্বপ্ন। দর্শক চিন্তিত ছিলেন।

একবিংশ স্বপ্ন। দর্শক নারী। যাহা দেখিয়াছিলেন, পরদিন নিজেই তাহা করিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশ স্বপ্ন। দর্শক নারী। দর্শনের পরই ঘটনা ঘটে। দর্শক স্বপ্নে দূরে যাইয়া দেখেন।

ত্রয়োবিংশ স্বপ্ন। ঘটনার সময়ই দূর হইতে স্বপ্ন দেখেন। দর্শক নারী। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই জীবিত।

চতুর্ব্বিংশ স্বপ্ন। দর্শক পুরুষ। দূরস্থ ঘটনা দেখেন।

পঞ্চবিংশ স্বপ্ন। ঐ

ষড়বিংশ স্বপ্ন। দর্শক পুরুষ। অদৃষ্ট—পূর্ব্বস্থান ও তাহার অবস্থা স্বপ্ন দেখেন। পরে ঐ স্থানে যাইয়া দেখেন যে, স্থান ও অবস্থা প্রকৃতই পূর্ব্ব দৃষ্টবৎ।

সপ্তবিংশ স্বপ্ন। দর্শক পুরুষ। দর্শক নিজালয়ে থাকিয়া দূরস্থ ঘটনা দেখেন যে, অন্যে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। দর্শক পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না। সন্দেহ করিবার কারণও ছিলনা।

অষ্টাবিংশ স্বপ্ন। দর্শক পুরুষ। পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না। কিন্তু স্বপ্নে সংবাদ পাইলেন। নিজ বাড়ীতে দূরস্থ বিষয় দেখেন।

ঊনত্রিংশ। দর্শক পুরুষ। অন্যে আসিয়া স্বপ্ন দেখায়। সম্ভবত অনেক সময় চিন্তা করিতেন। যিনি স্বপ্ন দেখান, তাঁহার সহিত দর্শকের বন্ধুত্ব ছিল।

আমরা স্বপ্নকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি;—দেহজ ও মনোজ। তৎপরে মনোজ স্বপ্নকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগকে পূর্ব্বানুভূত

বিষয়ক এবং অপর ভাগকে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ক নহে, এইরূপ নাম দিয়াছি। যাহা পূর্ব্বানুভূত, তাহার স্মৃতি মস্তিষ্কে অঙ্কিত থাকিয়া যায়; এবং উপযুক্ত উত্তেজনা বশতঃ মনোমধ্যে উদিত হয়। এ সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ নাই; কিন্তু যাহা পূর্ব্বানুভূত নহে, তাহা লইয়াই তর্ক। যাহা জীবনে কখনো অনুভব করিনাই, তাহা হঠাৎ দেখিলাম, আর তাহাই সত্য হইল! যে স্থানে দেখিলাম, তাহা প্রকৃত ঘটনার স্থল হইতে বহু দূরে; যে সময় দেখিলাম, তাহা প্রকৃত ঘটনার সময় হইতে বহুপূর্ব্বে কিম্বা পরে; কেন এমন হয়? এ সকল কথার উত্তর দিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক ইহাকে তুচ্ছ করিতে পারেন না। অবিশ্বাস করিবার সময় আর নাই। এত বিশ্বস্ত প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে যে, তাহা অবিশ্বাস করা যায় না। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘটকের স্বপ্ন স্মরণ করুন। তিনি আমার পরিচিত, রাজশাহীর জজ-আদালতের উকীল। তাঁহার স্বভাব-চরিত্র আমি জানি। তিনি প্রাতে এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত যাঁহাদিগেকে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা ভদ্রলোক; একজন উকীল। এ বৃত্তান্ত অবিশ্বাস করিব কেমন করিয়া? কিছুতেই পারিনা, বাধ্য হইয়া বিশ্বাস করিতে হয়। মোহিনী-মোহনের পিতার যে সময়ে জলে ডুবিয়া মৃত্যু হইয়াছিল, ঠিক্ সেই সময়েই মোহিনীমোহন তাঁহাকে স্বপ্নে দেখেন। পিতা ডুবিলেন গোয়ালন্দে; মোহিনী মোহন স্বপ্ন দেখিলেন রাজশাহীতে! আর সেই স্বপ্নে দেখিলেন যে, পিতার আর্দ্র কেশ ও আর্দ্র বস্ত্র হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে এবং তিনি শীতে পীড়িত হইয়াছেন।" পিতার স্বপ্নদৃষ্ট শরীর কখনই স্থূল শরীর নহে; কারণ তাহা ত গোয়ালন্দে নদীগর্ভে পড়িয়া রহিয়াছে। রাজশাহীতে দেখা দিল কোন্ শরীর? অবশ্যই অন্য কোন শরীর। অথবা আত্মা! অথবা উভয়-ই! তাহা পরে বলিব; কিন্তু যে শরীর রাজশাহীতে মোহিনীমোহনের নিকট দেখা দিয়াছিল, তাহার গায়ে ভিজা কাপড় কেন? মাথায় ভিজাচুল কেন? গায়ে ও কাপড়ে জল ছিল; তাহা গোয়ালন্দের পদ্মার জল। তাহা ত রাজশাহীতে আসে নাই। আর চুল স্থূল দেহের; কাপড়ও স্থূলদেহে পরা ছিল, এবং তাহা গোয়ালন্দের মৃতদেহের সহিত সংলগ্ন ছিল। এসকল রাজশাহী আসিল কেমন করিয়া? কেই বা আনিল? আর যে অবস্থা এইরূপ স্বপ্নে দেখা গেল, তাহা সত্যই বা হইল কেন? সত্যই পিতা জলে ডুবিয়া মারা যান। এ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর হইতে পারে না। স্থূল দেহের অতিরিক্ত একটী সূক্ষ্ম দেহ দেশকালের নিয়ম সকল দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, তাহা স্বীকার না করিলে

ইহার কোনই উত্তর হয় না। স্বীকার, বাধ্য হইয়াই, করিতে হইবে।

তার পর দেখিতে হইবে, যে স্থূলদেহেও যেমন আত্মা প্রতিষ্ঠিত, সূক্ষ্মদেহেও তেমনই সেই আত্মই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ঐ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও উত্তর হইল না। মোহিনীমোহনের পিতার আত্মা থাকুক; কিন্তু সেই আত্মা, স্থূল দেহ হইতে বিমুক্ত হইলেও স্নেহাদির অধীন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে পুত্রকে দেখিতে আসিল কেন? স্থূল দেহের বিলোপ হইলেই আত্মার স্নেহ, মমতা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি যায় না। এ সকল সূক্ষ্ম দেহেও থাকে। এই দেহে আরো আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে হয়; নচেৎ আত্মার উন্নতি হইতে পারে না। স্থূল দেহে যেমন মৃত্যু আছে, সূক্ষ্মদেহেও মৃত্যু আছে। এই মৃত্যুর পর আত্মা কারণ দেহে অবস্থিত হন। তৎপর মুক্তি। কিন্তু সে অনেক কথা।

এক্ষণে নাটোরের মৌলবী এর্সাদ আলি খাঁ চৌধুরীর স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করুন। ইনি সজ্জন এবং বিশেষ ধর্ম্মভীরু। ইঁহাকে যিনি জানেন, তিনি এ কথা কখনই অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। ইনি মেদিনীপুরের সেই কৃষ্ণকায় ব্যক্তিকে কখন দেখেন নাই। তাহার সহিত পরিচয়ও নাই। মেদিনীপুরের মস্‌জিদ ও সমাধিমন্দির সম্বন্ধে ঐব্যক্তি স্বপ্নে তাঁহাকে যাহা বলিল, তাহা কেমন করিয়া সত্য হইল? মৌলবী সাহেবের অন্তত্র হইতে মেদিনীপুরের অদৃষ্ট ঘটনা সত্য বলিয়া জানিতে পারিবার কারণ কি?— এস্থলেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা ভিন্ন উপায় নাই। তিনি না গেলেও স্বপ্নে তাঁহার সূক্ষ্মদেহস্থ আত্মা মেদিনীপুরে গিয়াছিল। সেই কৃষ্ণকায় ব্যক্তি মৌলবী সাহেবের কেহই নহে; সুতরাং তাহার আত্মা মৌলবী সাহেবের নিকট আসা সম্ভব নহে। সে যাহাই হউক, যদি কৃষ্ণকায় ব্যক্তির আত্মাই মৌলবী সাহেবের নিকট আসিয়া থাকে, তাহা হইলেও আত্মার অস্তিত্ব এবং তাহা যে দেশকালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, এ কথা প্রতিপন্ন হইতেছে। এস্থলে দেখিবেন যে কৃষ্ণকায় ব্যক্তিও জীবিত, মৌলবী সাহেবও জীবিত; সুতরাং আত্মা স্থূল দেহে বাস করা কালেও অর্থাৎ জীবিত অবস্থাতেও আত্মা স্থূল দেহ ত্যাগ করতঃ সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বন করিয়াই অন্তত্র যাইতে পারিয়াছিল।

তৎপরে সেই ভদ্রমহিলার গেলাস হারাইবার কথা বিবেচনা করিলে জিজ্ঞাস্য এই যে, স্বপ্নে তাঁহার পুত্র গেলাসের সংবাদ কিরূপে দিল? "অনেক

অনুসন্ধানেও গেলাসটি পাওয়া যায় নাই।” তবে উহা যেস্থানে ছিল, তাহা স্বপ্নে কেমন করিয়া জানা গেল? এইরূপ স্থলে দুই সিদ্ধান্ত হইতে পারে। হয় আত্মা সর্ব্বজ্ঞ; নচেৎ পুত্রের আত্মা স্থূল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া মহিলাকে আসিয়া স্বীয় অনুসন্ধানের ফল জানায়। এই দুইএর মধ্যে যে সিদ্ধান্তই অবলম্বন করুন, আত্মা (অর্থাৎ জীবাত্মা) সুখদুঃখের অধীন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। একটী সামান্য গেলাসের জন্য যে দেশময় ঘুরিয়া বেড়ায়, সে সুখদুঃখের অধীন, সন্দেহ নাই। পুত্রের আত্মাই হউক, আর মাতার আত্মাই হউক, অবশ্যই ব্যাকুল না হইলে কখনই অনুসন্ধান করিত না।

কিন্তু এই মহিলার হংসডিম্ব দেখিবার কথা অতীব বিস্ময়কর। তাঁহার গৃহপালিত হংসীর ডিম হইত না। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, হংসী ডিম পাড়িয়াছে; আর যথার্থই পরদিবস হংসীর ডিম হইল!! এরূপ ঘটনায় বলিতে হইবে হঠাৎ মিলিয়া গেল; নচেৎ আত্মার ভবিষ্যৎজ্ঞান সম্ভব, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল দৃষ্টান্ত যখন বিরল নহে, যখন অনেক পাওয়া যাইতেছে, তখন ‘হঠাৎ’ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। আত্মার ভবিষ্যৎ-জ্ঞান সম্ভব, ইহা স্বীকার করাই অপেক্ষাকৃত ন্যায়সঙ্গত। অন্যান্য বহু দৃষ্টান্ত হইতে, যাহার দেশকালের অধীন না থাকা প্রতিপন্ন হইয়া উঠিতেছে, তাহার ভবিষ্যৎজ্ঞান থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাহার পর, শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বপ্ন স্মরণ করুন। তিনি সিটি কলেজের হেড্ মাষ্টারের পদপ্রার্থী ছিলেন। শ্রীযুক্ত হরনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহা জানিতেন না। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা কিরূপে সম্ভব? আত্মা সর্ব্বজ্ঞ; অথবা স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বন করিয়াই কলিকাতা গিয়া প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইয়াছে। এই দুইএর এক সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতেই হইবে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে টেলিগ্রাম পাইয়াছিলেন, তাহাই বা তিনি পূর্ব্ব রাত্রে কেমন করিয়া দেখিলেন? যেখান হইতে উহা আসিয়াছিল, উহাতে যাহা লিখা ছিল, সকলই তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। এ সকল স্থলে সূক্ষ্মদেহের ও আত্মার অস্তিত্ব, এবং ঐ দেহ ও আত্মা দেশ কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে— ইহা স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর দেখি না।

আমাদিগের পূর্ব্ব-প্রকাশিত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, প্রায় অর্দ্ধেক স্থলে মৃত ব্যক্তি আসিয়া স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত বলিয়া দিয়াছেন। শতকরা ১২।১৩টী

স্থলে জীবিত ব্যক্তি আসিয়া স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। জীবিত অথবা মৃত সংবাদদাতা প্রায় সকল স্থলেই স্বপ্নদর্শকের আত্মীয়। দুই একটি স্থলে নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি। এই সকল ঘটনার প্রায় এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ শতকরা ৩০।৩২টী স্থলে স্বপ্ন দর্শকের আত্মা স্থূল দেহত্যাগ করত * অন্যত্র গিয়া দৃষ্ট ঘটনা অবগত হয়। সত্য স্বপ্ন প্রায় শতকরা ৮০।৮৫টী শেষরাত্রে দৃষ্ট হইয়াছিল। সত্য স্বপ্ন পুরুষ অধিক দেখেন, না নারী অধিক দেখেন? আমার সংগৃহীত স্বপ্ন হইতে, পুরুষেরা অধিক সংখ্যক স্বপ্ন দেখেন, জানা যায়। শতকরা প্রায় ৬০।৬২টী সত্য স্বপ্ন পুরুষ-দৃষ্ট; কিন্তু এই বিষয়ে আরো অনেক দৃষ্টান্ত সংগৃহীত না হইলে কিছু বলা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সংগৃহীত বৃত্তান্ত সকল হইতে বুঝা যায় যে, নারীই অধিক সংখ্যক সত্য স্বপ্ন দেখেন। এই মত যখন অনেক দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিপন্ন, তখন আমি কেবল আমার সংগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া মত দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। এ বিষয়ে আরো দৃষ্টান্ত এতদ্দেশে সংগ্রহ হওয়া উচিত। যদি তাহার পরও পুরুষের সত্য স্বপ্ন দেখাই অধিক বলিয়া জানা যায়, তবে নিশ্চয়ই বলিব, এ বিষয়ে ভারতবর্ষের পুরুষ পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীলোকের ন্যায়। শুধু কি এই বিষয়ে? তাহা হইলেও একরূপ হইত। কিন্তু বোধ করি, অনেক বিষয়েই এ দেশের পুরুষ অন্য দেশের স্ত্রীলোকের মত হইয়াছে। অথবা তাহা অপেক্ষাও হীন। যাক্, স্বপ্নের কথা লিখিতেছিলাম, তাই ভারতবর্ষীয় পুরুষজাতীর অবস্থাও স্বপ্নবৎ বোধ হইল।

এক্ষণে স্বপ্ন-দর্শকের মানসিক চিন্তা ও শারীরিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, শারীরিক কোন বিশেষ অবস্থার সহিত সত্য স্বপ্নের যোগ নাই। স্বাস্থ্যে এবং পীড়ায়, সকল সময়েই সত্য স্বপ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু মানসিক অবস্থা একটু চিন্তাকুল কিম্বা বিষণ্ণ থাকিলে, অনেক সময় দেখা যায়, সত্য স্বপ্নই বেশী হয়।

স্বপ্নে বস্তু পাওয়ার দৃষ্টান্তও সময়ে সময়ে সংগৃহীত হয়; কিন্তু কোন কোন্ স্থলে আমার বোধ হইয়াছে যে স্বপ্নদর্শক নিজেই নিদ্রিতাবস্থায় চলিয়া গিয়া ঐ বস্তু লইয়া আসিয়াছেন। পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সে কথা মনে না থাকায়, ঘুমের মধ্যে বস্তু পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বিবেচনা করেন। এই সকল somnambulism এর দৃষ্টান্ত বাদ দিলেও দুটি একটী প্রকৃত বিশ্বস্ত ঘটনা

* সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া।

থাকিয়া যায়। পীড়িত ব্যক্তির স্বপ্নে ঔষধ পাওয়ার একটী দৃষ্টান্ত আমি কখনই অবিশ্বাস করিতে পারি না। বগুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্রের ভ্রাতৃজায়া ক্ষয়কাশীর ঔষধ স্বপ্নে পাইয়াছিলেন, এটা প্রকৃত ঘটনা। ঐ ভ্রাতৃজায়ার একটী মৃত আত্মীয়া তাঁহার কষ্ট দেখিয়া দয়া পরবশ হইয়া ঔষধ দেন, এবং তাহাতেই ভ্রাতৃজায়া আরোগ্য লাভ করেন। এ সকল স্থলেও সূক্ষ্ম দেহাবস্থিত আত্মার অস্তিত্ব, এবং তাহার দয়াবৃত্তি থাকা, প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সত্য স্বপ্নের মূল অনুসন্ধান করিলে "জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।" এই জন্যই এ বিষয় এত গুরুতর। এতদ্দেশে শ্রমসাধ্য অনুশীলনে কেহই বড় ব্রতী হন না; কিন্তু যে তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে জীবাত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়, তাহা অপেক্ষা মানবের প্রয়োজনীয় বিষয় আর কি হইতে পারে! সত্য স্বপ্ন আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে জীবাত্মা অবশ্যই আছে; এই স্থূল দেহই যে শেষ, তাহা নহে। এই দেহ মরিলেই যে সব ফুরাইল, তাহা কখনই নহে। জীবাত্মা আছে, মরণান্তেও সূক্ষ্ম-দেহাধিষ্ঠিত থাকে; এবং তখনও সুখদুঃখের অধীন থাকে; কিন্তু এই অবস্থায় জীবাত্মা দেশ কালের অধীন নহে; বরং কোন ব্যক্তির জীবিত কাল অপেক্ষা মরণান্তে তাহার জীবাত্মা আরও স্বাধীনতা লাভ করে। স্থূল দেহাধিষ্ঠিত থাকা কালেও অর্থাৎ জীবিত অবস্থাতেও এ দেহ ত্যাগ করতঃ আত্মা সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বনে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে সক্ষম হয়। এ সকলই সংগৃহীত দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়। সত্য স্বপ্নের আলোচনা অতীব শিক্ষাপ্রদ, এতদ্দেশে এ বিষয়ের আলোচনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

উদ্ভিদের দুষ্টামি।

আমার মনে হয় যে, উদ্ভিদের চরিত্র ভাল নয়। তবে সম্পাদক মহাশয়ের ভয়ে মুখ ফুটিয়া বলি না। আজি একটা আরোহীলতার * ব্যবহার দেখে মন বড় চটে গেছে; তাই নিশ্চয় দু'কথা শুনাইয়া দিব।

নিকটবর্ত্তী একটী জঙ্গলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, জঙ্গলটী অন্ধকার। জঙ্গলে একটী লতা ছিল। ঐ লতাটী উপরেও উঠিতে পারিত না, আলোও পাইত না। উহার উদ্ভিদ-জন্ম ঐখানেই শেষ হইত। একটা মোটা আমগাছ ছিল; তার পায়ে-হাতে ধরে কান্নাকাটী করায় সে ভালমানুষ ওকে আশ্রয় দিল। তখন তাঁ'র উপর দিয়া জড়িয়ে উঠে, একবারে মাথায় চড়ে বসিল। এতক্ষণ বেশ নিরীহ ভদ্রলোকের মত ছিল। যেই মাথার উপর চড়েছে, অমনি নিজমূর্ত্তি ধারণ করে, কোথা থেকে কতকগুলো পাতা বাহির করে, নিজে সমস্ত আলোটাকে দখল করে বসেছে; সমস্ত হাওয়াটাকে নিজেই নিয়েছে। গরীব আমগাছটাকে একটুও রৌদ্র দিতেছে না।

সে বেচারী রৌদ্র না পাইয়া মরার মত হইয়াছে। কি ভয়ানক বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং কৃতঘ্নতা। ইহাদের দলের আর একজন (লতা) আর একটী গাছকে মারিয়া ফেলিবার জো করিয়াছে। যতক্ষণ ইহারা নীচে থাকে, ততক্ষণ যেন শুধু একটী ক্ষীণ, দুর্ব্বল, নিরাশ্রয় লতাই। তা'রপর যেই আশ্রয়দাতার মাথার উপর উঠে, অমনি ছোট ছোট ডাল, গাঁইট এবং পাতাগুলি বাহির করে, আশ্রয়টার রৌদ্র আলো একবারে নিজেই সব লয়; সেটাকে দুষ্টামি করে ঠকাইয়া অবশেষে মারিয়া ফেলে। † এমন দুশ্চরিত্র! এই ত গেল লতার কথা। এখন একটী সর্ব্বজন-প্রশংসিত বটগাছের কথা শুনিবেন? ইনি নিকটস্থ আশ্রয়-দাতা একটী দেবদারু বৃক্ষের চারিদিকে এমনই জড়াইয়া ধরিয়াছেন;—তাহাকে নাগ-পাশে এমনই দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছেন, দেবদারুটী এখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত; আর তাহার খরচায় বট মহাশয় বিলক্ষণ পরিপুষ্ট। এমন কত গাছ দেখা যায়। উদ্ভিদের মধ্যে অনেকের গোড়া দুর্ব্বল; তাহাদিগের গোড়াতে উপরের ভার বহন করিতে সমর্থ হয় না। তাই তাহারা আস্তে

---

* Climbing plant.

† Taylor's sagacity and morality of plants p. 47—8.

আস্তে অপর বৃক্ষের নিকট গিয়া কতই ভালবাসা জানায়; বাহু প্রসারিয়া আলিঙ্গন করে। শঠতাপূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ করতঃ অবশেষে আশ্রয়-বৃক্ষের স্কন্ধে উঠিয়া দাঁড়ায়। তখন আশ্রয়ের রসভাগ এমন করিয়া টানিয়া লইতে আরম্ভ করে যে, অবিলম্বেই তাহার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি হয়। ইহাদিগের নৃশংসতা কি ভীষণ।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গাছগুলিকে নিতান্ত অসচ্চরিত্র মনে হয়। ইহাদিগের বুদ্ধি নাই, কে বলে? অন্য বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক, দুষ্ট বুদ্ধি নিশ্চয়ই আছে। এবিষয়ে ইহারা মানুষের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। ইহারা যে কৌশলে পতঙ্গগুলিকে ভুলাইয়া নিজের বংশবিস্তারের কার্য্যটী সমাধা করিয়া লয়,* তাহা নিতান্ত শঠেরও অকর্ত্তব্য। তা'রপর অনেক সময় এমন চতুরতার সহিত নিজের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া আত্মরক্ষা করে (Protective coloration) যে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমি বলি, ইহারা যেমন দুষ্ট, তেমনি চতুর।

পরনিন্দাটা না থাকিলে জীবন নীরস হয়; আর উহা অনেকেই শুনিতেও ভালবাসেন। তাই, আরও দুই এক কথা বলিব।

আমরা দেখিলাম যে বৃক্ষজাতি কেমন নিরীহ ভাবে হাতে-পায় ধরে এসে অবশেষে মাথায় চড়িয়া বসে; এবং আশ্রয়দাতার জীবন সংশয় করিয়া তুলে। মানুষের মধ্যেও এই স্বভাবের আততায়ীর অভাব নাই। বর্ত্তমান সময়ে এ কথার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ইহা আমরা হাড়ে-হাড়ে অনুভব করিতেছি। এবারে গাছের আর এক দুষ্টামির কথা বলিব; ইহা আমাদিগের বিশেষ বিবেচ্য কথা।

যে দুর্ব্বল, তাহার অন্যের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। নতুবা তাহার অদৃষ্টে মৃত্যু। আমার বাড়ীতে কতকগুলি ঝুম্‌কো জবার গাছ বুনিয়াছিলাম। তাহার চারাগুলি প্রত্যেকে এত সরু ও ক্ষীণ ছিল যে একাকী নিজের দেহভার কিছুতেই বহন করিতে পারিত না। সুতরাং একটু উঠিয়াই মাটীতে পড়িয়া যাইত। তখন করিল কি? একটী পার্শ্ববর্ত্তী আর একটীর সহিত মন্ত্রণা করিল। উহারা কি উপায়ে পরস্পর কথা কহিল, বলা যায় না। কিন্তু উহারা নিশ্চয় মন্ত্রণা করিয়াছিল, একথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি; নচেৎ দুইটী পার্শ্ববর্ত্তী সম-দুর্দ্দশাগ্রস্ত গাছের চারা পরস্পরের দিকে একটু একটু

* Taylor's sagacity and morality of plants p,47—8.

হেলিতে লাগিল কেন? তাহারা পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল কেন? তখন উভয়ের আশ্রয়ে উভয়ে আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল কেন? এই ভাবে উহারা অনেকগুলি পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। এখন সকলে মিলিত হইয়া প্রায় সাত হাত উচ্চ গুচ্ছ সাজিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন উহাদিগের সকল ডালেই লালফুল ফুটিয়া কেমন সুন্দর শোভা-বিকাশ করিতেছে। যে স্বয়ং পতিত অবস্থা হইতে এক হাতও উঠিতে পারিত কিনা সন্দেহ; সে কেবল একতার গুণে পরস্পর মিলিত হইয়া সাত হাত উচ্চ গুচ্ছ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আর আশ্চর্য্য মনোহর বেশে সাজিয়া পতিত জাতি-সকলকে কি মহাশিক্ষাই দিতেছে!

তারপর আর এক দুষ্টামি দেখুন! এই জবাগাছ দুর্ব্বল, তাহা বলিয়াছি। ইহার বৃন্তও দুর্ব্বল, সুতরাং ফুলের ভার বহন করিতে একরূপ অক্ষম। উপরের দিকে ফুলকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সুতরাং ফুলগুলি নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে। কিন্তু এই অবস্থায় সাধারণ জবার ন্যায় হইলে ইহার চলে না। ইহার পরাগরেণু ফুলের কড়ির দ্বারা অর্থাৎ পাঁপড়ির দ্বারা ঘেরা কিম্বা ঢাকা থাকিলে পতঙ্গজাতি তাহা দেখিতেও পাইত না; এ বেচারীও নির্ব্বংশ হইত। সুতরাং জল-পিণ্ড রক্ষার্থ ইহার অন্য কোন কৌশল না করিলেই হয় না। ইহারা বড় বুদ্ধিমান লোক, তাই ফুলের পাঁপড়িগুলিকে আংশিকরূপে গুটাইয়া উপরে তুলিল; পাঁপড়িগুলির শেষাংশ সেকেলে মানুষের মাথার বাবড়ির মত উঁচু করিয়া বাঁকাইয়া তুলিল। তাহাতেই উহার রেণু-সূত্র বাহির হইয়া পড়িল। অর্থাৎ যে সূত্রের সহিত পরাগ-রেণু সজ্জিত থাকে, তাহা এই উপায়ে বাহির করিয়া রাখিল। যাহাতে নির্দ্দিষ্ট পতঙ্গজাতির মন ভুলাইতে পারে, এই তাহার প্রথম চেষ্টা। তাহার পর, ইহারা পতঙ্গজাতির ব্যবহার বেশ ভাল করিয়া পরিদর্শন করিয়াছে। ইহাদের পতঙ্গসকলের একটু বেলা হইলে ঘুম ভাঙ্গে, তারপর তাহারা প্রাতঃভ্রমণে হাওয়া খাইতে বাহির হয়। এটা জবা ফুলেরা বেশ বুঝে। তাই তাহারা রাত্রের সাদার-মত-ক্ষীণ-লাল বর্ণ বেলা ৬টা ৭টার মধ্যে মাজিয়া ঘসিয়া উজ্জ্বল লালে পরিণত করে; আর এই মনোহর উজ্জ্বল লাল বর্ণে সজ্জিত হইয়া, পাঁপড়িগুলি খুলিয়া দিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। এই বর্ণ-পরিবর্ত্তন, ও পাঁপড়ির শেষাংশ উত্তোলন কতবড় চালাকি, একবার ভাবিয়া দেখুন ত! এই দুইটী দুষ্টামি না করিলে

পতঙ্গজাতি ইহাদিগকে গ্রাহ্যও করিত না। কে উহাদের পরাগ-রেণু এক ফুল হইতে অন্য ফুলে লইয়া গিয়া তাহার গর্ভকেশরে মিলিত করিত? ইহাদের এই দুষ্টামি সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু পতঙ্গগুলি অতিশয় বোকা। তাহারা চিরদিন এই ঝুম্‌কো জবা-গুলির বেগার দেয় কেন? অন্য ফুলের নির্দিষ্ট পতঙ্গগুলি যা'হউক পেট ভরিয়া দুইটা খাইতে পায়। এই ফুলগুলি এত কৃপণ যে একদানাও পতঙ্গকে দেয় না। কেবল উজ্জ্বল লালবর্ণ-পোষাক পরেই উহাদের মন ভুলাইতে চেষ্টা করে! পতঙ্গেরাও এমন গণ্ড মূর্খ যে শুধুই রং আর পোষাক দেখেই পাগল হয়। সমস্তদিন না খেয়ে খাটিয়া খাটিয়া সারা হয়। রেণু ব'য়ে ব'য়ে মারা যায়। খাটে খুব! রেণুর বোঝা বহেও খুব; কিন্তু পেট-ভাতও জোটে না। এ পতঙ্গগুলির সহিত কি বাঙ্গালীজাতির কোন নিকট-সম্বন্ধ আছে না কি? দেখি কথাটা ভাবি, তা'রপর আর এক দিন উত্তর দিব।

ইহাদের দুষ্টামির অন্ত নাই; এরা জো পাইলে মানুষকেও ছাড়ে না। তাঁকেও ঠকাইয়া আপন কাজ উদ্ধার করিয়া লয়। কাজটা আর কিছুই নয়; সেই এক কাজ। সকলেরও যা, এদেরও তাই; অর্থাৎ বংশবিস্তার। এই যাদের আমরা বড় প্রশংসা করি, ভালবাসি, তাদের ব্যবহারটাই একবার দেখুন না কেন? কুল, আম, লেবু ইত্যাদি, এঁরা ত ফল। পেটুক এবং বৈজ্ঞানিক উভয়েই এঁদের ফল বলেন। তবে পেটুকের মন ভোজনে, তাই তিনি আঠি ও খোসার মধ্যস্থলে যে রসাল ভাগ থাকে, সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল ফলের আদর করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাহা বড় একটা করেন না। তিনি ঐ আঠিটারই বেশি আদর করেন। ঔদরিক ও বৈজ্ঞানিকে এই প্রভেদ। কিন্তু দুষ্টামিতে আঠি, খোসা ও রসাল ভাগের মধ্যে বেশি প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ্।

কথাটা তবে খুলেই বলি। আর ওদের খাতির করিবার কোন আবশ্যক নাই। দেখুন, এই আম। জঙ্গলা আম নিতান্ত ছোট। কুলও তাই। অতি ক্ষুদ্র, অতি গরিব। তখন এদের ছোট আঠি, ছোট খোসা; আর এ উভয়ের মধ্যের ভাগ ত নাই বলিলেও হয়। কোন পাখী, কি মানুষ, যার বুদ্ধি আছে, সে ঐ শুধু আঠি সার ক্ষুদ্র ফলটী কেয়ারও করে না। তবে কোন কোন বোকা পাখী, কিম্বা বোকা ছেলের একটু দৃষ্টি পড়ে। তাই তারা খায়। হয় ত এক জায়গায় খায়, আর এক জায়গায় আঠি ফেলে।

পাখী একটা ফল আস্ত খেয়ে যদি উড়ে গেল, তবে দূর দেশেও আঠিটি পাখীর মলত্যাগের সঙ্গে পড়ে যেতে পারে। এইরূপে কোন প্রকারে অতি কষ্টে এদের কিঞ্চিৎ বংশ বিস্তার হইতে পারে। কিন্তু এ অবস্থায় এই ক্ষুদ্র ফলগুলির যেরূপ দুর্দ্দশা,—না আছে রূপ, না আছে স্বাদ,—তাতে পাখী কিম্বা ছেলেপিলে কেহই এদের কাছে বড় বেশি ঘেঁষে না। এদের বংশ-বিস্তারও ভাল রকম হয় না। এদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যায়। তখন ইহারা কেমন দুষ্টামি করে দেখুন। আঠিকে রক্ষা করার জন্যই বিশেষ চেষ্টা, আঠিকে নানাস্থানে মাটিতে ফেলিবার জন্যই বিশেষ উদ্যোগ। এদের গাছগুলি ত আর চলে গিয়া নিজের আঠি নিজে নানাস্থানে ফেলিয়া আসিতে পারে না; পারিলে বংশ-বিস্তার নিজেই করিত। কিন্তু সে সাধ্য নাই। * তাই ঔদরিকের সাহায্য লওয়া ভিন্ন উপায় কি? তাই তাকেই ভুলাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি ত আঠিও খাবেন না, খোসাও খাবেন না। কাজেই পরম নৈয়ায়িকের মত, ও-দুটাকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেয়। তখন অবশিষ্ট থাকে, কেবল মাঝের রসাল ভাগটা। সেইটাকে ক্রমে ক্রমে এমন মধুর এবং উপাদেয় করে তুলে, যে পাখী কেন, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যও লোভসম্বরণ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু তা হলেই ত বড় আয়তন হ'তে হয়; মাঝের রসাল ভাগটা শুধু মধুর নয়, পেট ভরার মত হ'তে হয়। এক দিনে ত বেশি বড় হওয়া যায় না; তাই ক্রমে ক্রমে বড় হইয়াছে। প্রথমে জঙ্গলা কুল, কিম্বা আম অতি ছোট ছিল; তারপর একটু বড় হল; কিন্তু আস্বাদটা বড় ভাল হ'ল না। কারণ, তখনও উহারা সুবিজ্ঞ মানবজাতির পাতে পড়িবে, এমন উচ্চাশা হৃদয়ে স্থান দেয় নাই। পাখীরাই ঠুক্‌রে অথবা গিলে খাইত, এবং বংশবিস্তারের কিঞ্চিৎ সাহায্য করিত; ইহাই উহাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সে পাখীরা কষায় এবং অম্ল স্বাদ ভালবাসে; তাই উহারাও ঐ স্বাদবিশিষ্ট হইত। কিন্তু কালে পাখীরাও চালাক হইল। একটু ফলের জন্য কেন তাহারা একটা আঠির বোঝা পেটে করে ব'য়ে বেড়াবে? তাতে তাদের স্বাস্থ্যভঙ্গও হ'তে পারে। এই সব কারণে তাহারা আর আস্ত ফলটা বড় একটা গিলিত না; ঠুক্‌রে খেয়ে নিজের কার্য্য সিদ্ধ করে চলে যেতো। কিন্তু পাখীদের এই কু-ব্যবহারে

* এস্থলে লতা-আমের গতিশক্তির কথা ভাবিবেন না। লতারা চির দিনই কিছু বেশি বুদ্ধিমতী।

ফলগুলির বিশেষ বিপদ উপস্থিত হইল। পাখীরা তাদের খাবার ভাগটা খেয়ে চলে যায়, আঁঠিটি বোঁটার সঙ্গে ডালে ঝুলিতে থাকে। ইহাতে বংশ-বিস্তার হওয়ার বিশেষ বিঘ্ন হইতে লাগিল। তখন পাখীদের চতুরতার সঙ্গে না পারিয়া, বোকা মানবজাতির মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল।* খোসাটি নানাবিধ সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত করিল, পাখী তাহাতেও ভুলিল না; মানবের কিন্তু চক্ষু পড়িল। তখন আঁঠি ও খোসার মধ্যভাগের পদার্থকে অতি সুস্বাদ ও সুমধুর করিয়া মানবের মন ভুলাইতে বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিল। উদর-পরায়ণ মানব তখন হইতেই অচ্ছেদ্য জালে বাঁধা পড়িয়া গেল। উহাদিগকে নানাপ্রকারে, নানাস্থানে বুনিয়া, বিবিধ উপায়ে উন্নতি-বিধান করিতে লাগিল। তখন দেখিল যে, সেই ক্ষুদ্র, কষায়, অথবা অম্ল ফলকে, নানা প্রযত্নে বৃহৎ কোমল এবং মধুর করিয়া না লইলে, আর মানবের রসনা তৃপ্ত হয় না। উহারাও সেইদিকেই ফাঁদ পাতিতে লাগিল। এখন কাশীর কুল, মালদহের আম আস্তে আস্তে কত বড় আকার ও কি রূপ ধারণ করিয়াছে, কেমন সুস্বাদু হইয়াছে! আর মানবকে বোকা বানাইয়া নিজেদের বংশ-বিস্তৃতির কেমন সুবিধা করিয়া তুলিয়াছে। এরা কি কম দুষ্ট! এই কুল আম ও লেবু,—ইহারা সবাই সমান; ইহাদের দুশ্চরিত্রের ইতিহাস একই প্রকার। কিন্তু তথাপি, ইহারা খাইতে দেয়। নিজেদের মতলব সিদ্ধ করে করুক, মানবজাতিকে খাইতে দেয়; আর সুখাদ্যই দেয়। পেটে মারে না। কিন্তু যাহারা মানুষ হইয়াও অন্যের দ্বারা কেবল নিজের কাজই সিদ্ধ করাইয়া লয়, পেট ভরিয়া খাইতে দেয় না, তাঁ'দের কথা আর কি বলিব? উদ্ভিদও তাহাদের অপেক্ষা ভাল।

যত বুদ্ধি, তত দুষ্টামি। তা মানুষেরও যেমন, গাছেরও তেমনই। আলুর বুদ্ধি, আলুর বিজ্ঞতা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আলু যেমন বিচক্ষণ, তেমনই ভবিষ্যৎদর্শী। দুষ্ট বটে, কিন্তু কাজের লোক।

কথাটা একটু গোড়া থেকে আরম্ভ করি। অধিকাংশ উদ্ভিদের স্ত্রী-পুংভেদ আছে। পরাগরেণু পুংশক্তি, গর্ভ-কেশর-স্থিত ডিম্ব স্ত্রীশক্তি। ঐ রেণুর সংমিশ্রনে ডিম্ব অনুপ্রাণিত হয়। তাহাতেই বীজ অর্থাৎ বীচি উৎপন্ন হইয়া বংশরক্ষা করে। এক ফুলেরই রেণু ও ডিম্ব মিশ্রিত হইলে বীচি হয় না, অথবা ভাল হয় না। তাহাতে নির্ব্বংশ হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়। অন্য গাছের

---

* Sagacity and Morality of Plants—Taylor; p 94—95

ফুল হইতে রেণু আসিয়া ডিম্বকে অনুপ্রাণিত করিলে বীচি ভাল হয়। ইহাই বংশরক্ষার প্রচলিত পদ্ধতি; কিন্তু রেণুত আপনা হইতে আসিবে না। তাহাকে আনিবে কে? বায়ু অথবা পতঙ্গ। বায়ুর মন ভুলাইবার চেষ্টা করা বৃথা। তিনি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী। তাই বায়ু-সেবিত উদ্ভিদের ফুলের বাহার নাই। কিন্তু পতঙ্গজাতির মন ভুলাইয়াই কার্য্য উদ্ধার করিতে হয়। এ নিমিত্ত পতঙ্গ-সেবিত উদ্ভিদ্ নানা রূপ সুন্দর মনোহর ফুলের শোভা বিস্তার করিয়া বসিয়া থাকে। আর সেই ফুলের মধ্যস্থলে পুরাগ-কেশর ও গর্ভ-কেশর রাখিয়া দেয়। অনেক সময় ঐ ফুলের মধ্যে সুখাদ্য মধুও সঞ্চয় করিয়া রাখে। তাই পতঙ্গজাতি আকৃষ্ট হয়; এবং এক ফুল হইতে রেণু আনিয়া অন্য ফুলে দেয়।

এক্ষণে দেখুন উদ্ভিদজাতির বংশরক্ষার উপায় কত অনিশ্চিত। বায়ু যদি যথা সময়ে দয়া না করিলেন, চঞ্চল পতঙ্গ যদি যথাকালে অনুকূল দর্শন না দিলেন, তবে উপায় কি? জল-পিণ্ড লোপ হওয়া ভিন্ন আর উপায় দেখি না। এত অনিশ্চিত উপায়ের উপর এত বড় গুরুতর কাজের ভার রাখা কি যুক্তিসঙ্গত?

তারপর আর এক কথা। ফুল তৈয়ারি ক'রে, বীচি ক'রে, বংশরক্ষা করিতে উদ্ভিদের অনেক বলক্ষয় হয়। ফুলের দলগুলি কি? উহাত পাতাই; না খেতে পেয়ে ফুলের দল রূপে পরিণত হয়। পত্রকলিকা গুলিকে না খেতে দিয়ে কাহিল করিলেই ত পুষ্পকলিকা হইল।* তাই ফুল তৈয়ারি করিতে হইলে উদ্ভিদকে অনাহারে † থাকিতে হয়। তাতে নিশ্চয়ই বলক্ষয় হয়। বোকা ভিন্ন বিজ্ঞ লোকে না খেয়ে কেন বলক্ষয় হইতে দিবে? উদ্ভিদ-সমাজে প্রচলিত বংশরক্ষার প্রণালী কত অনিশ্চিত ও বলক্ষয়কর।

এখন, আলুর বিজ্ঞতা দেখুন।

সে ঐ প্রচলিত নিয়মের কেমন অদ্ভুত পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে! সে আত্মনির্ভরপরায়ণ; নিজে না খেয়ে পরের মন জোগাতে রাজী নয়। সে বায়ু অথবা পতঙ্গের দাসত্ব করিতে স্বীকৃত নহে। সে নিজের চেষ্টায় স্ব-কার্য্য উদ্ধার

---

* Leaf buds can be changed into flower buds. This transformation is effected by starving and crippling the plant—Sagacity and Morality of plants—p, 11:

† অনাহার = অল্পাহার। এক সময় এ অর্থও ছিল।

করে। সে নীরবে, লোকলোচনের অন্তরালে, মাটীর নীচে, আপনার দেহে আপনি "চোখ" উৎপন্ন করে। মাটীর নীচে যে গোলক (tuber) জন্মায়, তাহারই মধ্যে স্থানে স্থানে বিন্দু বিন্দু কোষ উৎপন্ন করিয়া লয়। সেই গুলিই তাহার বংশরক্ষা করে। এই সুস্থ সবল "চোখ" গুলি তাহার আত্মনির্ভরতার ফল; মৌন নিভৃত সাধনার পুরস্কার। আমার মনে হয়, অনেকের চেয়ে আলুই মানব জাতির শিক্ষাগুরু পদের অধিকতর উপযোগী।

যার যত বিপদ তার তত বুদ্ধি। আর দুর্ব্বল হ'লে দুষ্টামি ভিন্ন উপায় কি? কাজেই দায়ে-ঠেকে উদ্ভিদকে দুষ্ট হইতে হইয়াছে। দেখুন, এই পৃথিবীটাতে, ওরাই আগেকার অধিবাসী। ওরা বহুকাল থেকে এখানে বাস করিতেছিল; ধনে-বংশে বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। জন্তুরা আসিবার কত আগে হ'তে ওরা নানাপ্রকারে উন্নতি করেছিল। জন্তুরা কোথা থেকে যে উপস্থিত হ'ল কিছুই বলিবার জো নাই; উদ্ভিদরা ভালমানুষ, তাই জন্তুদের জায়গা দিয়াছিল; কিন্তু আগে যদি ওরা জান্‌তো যে জন্তুরা এমন সর্ব্বনাশক, তা'হলে কি জায়গা দিত? জন্তুরা যেই এসে উপস্থিত হ'ল, অমনি ওদের সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বা ওদের পাতা, কেহ বা ছাল, কেহবা মূল, কেহ বা ফল, কেহ বা ডাল এমনি করে কাটিতে,ছিড়িতে, খাইতে আরম্ভ করিল; কেহ বা ওদের রস এমনই ক'রে চুপি চুপি শুষিয়া লইতে সুরু করিল; যে ওরা মহা বিপন্ন হইয়া পড়িল। জন্তুরা উদ্ভিদদিগকে একটু একটু সার কখন কখন দিত; কখন বা একটু রক্ষাও করিত; কিন্তু ওদের সার-সর্ব্বস্ব লইতে একদিনও ভুলে নাই। ওরা এই বিপদে পড়ে' করে কি? ওরা কি জন্তুদের শরণাপন্ন হইয়াছিল? তা ওরা কখনও হয় নাই, এটুকু গৌরব ওদের চিরদিনই আছে। ওরা নিজেই নিজের রক্ষার উপায় করিতে আরম্ভ করিল। কেহবা পাতা জড়িয়ে, কিম্বা পাতার জায়গায়, কাঁটা তৈয়ারী ক'রে ফেলিল। আর জন্তুরা খেতে পারে না, মুখে কাঁটা ফুটে, আর পলাইয়া যায়। উদ্ভিদের অস্ত্রধারণ নিষেধ ছিল না, তাই কাঁটা দিয়ে জন্তুদের হাত থেকে (অর্থাৎ মুখ থেকে) আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কেহ বা কিছু বৈষ্ণব রকমের, পরপীড়া জন্মাইতে ইচ্ছুক নহে। তারা নিজের ছালই কিছু পুরু ক'রে তুলিল; অথবা একটু তিক্ত রস রক্ষিত করে রাখিল; তাই জন্তুরা খাইতে পারিল না, খাইতে ইচ্ছাও করিল না। এমন যে নিরীহ পান, সেও কত চতুর! দেবতার মত মানুষ, সেও পানকে "চর্ব্বণে বিনিয়োগ" করিতে

আরম্ভ করিল! তখন সে অনন্যোপায় হ'য়ে একটু শুরু ও একটু বিস্বাদ হ'তে আরম্ভ করিল। তাতে যদিও কিছু রক্ষা পাইল, কিন্তু সম্পূর্ণ পাইল না। ঐ গুরু ও বিস্বাদ পানও মানুষ ছাড়ে না; পাইলেই খায়। এখন তা'রা কি করিবে? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যদি মানুষ এখনও ওদের না ছাড়ে, তবে উহারা আর কিছুদিন পরে তিক্ত হইবে।* তখন মানুষ জব্দ হ'বে। সত্য সত্যই অনেক উদ্ভিদ জন্তুর উৎপাতে না টিকিতে পারিয়া তিতো হ'য়ে উঠেছে। তাই কোনও রূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে।

কিন্তু সব চেয়ে দুষ্ট তারা, যারা বিষ তৈয়ারি করে তুলেছে। তাদের কাছে কারও যাবার জো নাই। যে যায় সেই মরে। কেউবা এমন দুষ্ট যে "মিঠাবিষ" তৈয়ারি করেছে। মিঠে ভেবে খেলে তখনই পঞ্চত্ব। তাদের কাছে আর জন্তু-গিরি ফলাতে হয় না। উদ্ভিদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু একটু সৌখীন; তারা পাতাতে কিম্বা ফলে এমনই রং ফলাইয়া তুলেছে যে সে রং দেখিলেই জন্তুদের মনে কেমন ভাব হয়—কখন বা ভয় হয় কখনও বা প্রীতি হয়—উহারা আর তাদের খায় না। কোন কোন উদ্ভিদ পাতায় কিম্বা গুঁড়িতে আঠা জমিয়ে রাখে; জন্তুরা গা বাহিয়া উঠিতে গেলেই জড়িয়ে পড়ে। প্রায়ই কীটপতঙ্গদের উৎপাতে ওরা এইরূপ করে। কেউবা একটু সৎস্বভাব কীটপতঙ্গদের আহারও দেয়, আর তাদের সাহায্যে নিজের বংশবৃদ্ধি করে লয়। তাদের গায়ে নিজের পরাগরেণু মাখিয়ে দেয় তা'ই তা'রা অন্য উদ্ভিদের গর্ভকেশরের উপর ফেলে; আর উদ্ভিদের উদ্দেশ্য* সিদ্ধ হয়। কিন্তু আর এক রকম উদ্ভিদ বেলট সাহেব দেখেছিলেন; তিনি তাদের কথা নিজের একখানি পুস্তকে † লিখিয়া রাখিয়াছেন। তারা জন্তুদেরই নিজের প্রহরী বানাইয়াছে। পিপড়ে, জানেন ত কত বড় চালাক আর কত বড় যোদ্ধা। এই উদ্ভিদ পাতার ঠোস বানাইয়া পিপড়েদের কেল্লা তৈয়ারি করে দেয়। তারই মধ্যে তারা থাকে। তাদের পেট ভরে রসদ দেয়। পাতার গোড়ায় গোড়ায় একটু একটু মিষ্ট রস জন্মায়। তাই পিপড়ে খায় আর পাহারা দেয়। অন্য কোন জন্তু পিপড়ের ভয়ে ওদের কাছেই আসিতে পারে না।

---

* কি উদ্ভিদ, কি জন্তু, সকলেরই উদ্দেশ্য বংশ-বিস্তার।

† Naturalist in Nicaragua.

কিন্তু সব চেয়ে বাহাদুর এক রকম উদ্ভিদ আছে। তারাই আসল বাপের বেটা। তারা জন্তুদের একেবারে খাইয়া ফেলে। তা'বলে হাতী ঘোড়া খায় না। হাতী ঘোড়া ওদের কাঁছে যায়ও না। যায় কীট পতঙ্গ, যারা নেহাত ছোট লোক। চুরি করে গিয়ে চুপি চুপি সর্ব্বনাশ করিতে চায়। তাদের ধরে একবারে হজম্ করে ফেলে। এদের "কীট-খোর" * বলে মানুষে ঠাট্টা করে। কিন্তু তা বলে হবে কি? এরা শত্রুকে রাখেই না, একবারে নিকেশ করে ফেলে।

কিন্তু ক্ষুদ্রের উৎপাত বড়ই কঠিন। যারা বড় লোক' তারা কোন্ কালে কি কাজ করে থাকে? ছোটতেই ত চিরদিন কাজ করে। উদ্ভিদের মধ্যে যারা অতি ছোট,—এমন কি খালি চোখে দেখাই যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিতে হয়,—তারাই ভারি মারাত্মক; জন্তুদের একবারে "অতীষ্ঠ" করে ফেলেছে। ওরা জাতি-শত্রু কি জাতি-শত্রু দেখিলে আর ছাড়ে না। যেমন করে হ'ক ঐ সকল জীবাণু † ঘুরে ঘুরে জন্তুদের মধ্যে পিকেটিং ক'রে বেড়ায়; শেষে তাদের দেহে প্রবেশ করে' এমন বিপদ ঘটায় যে, তারা দু'দিন পরেই নানারূপ ব্যামোতে ভুগে শেষে পঞ্চত্ব পায়। এই সকল উদ্ভিদের ছোক্‌রারা নিতান্ত ছোট ও অল্পবয়স্ক হইলেও, মস্ত মস্ত অশ্বত্থ মহাশয়েরা যে কাজ না করিতে পারেন, তা এরা পারে। নূতন বয়স, নূতন উদ্যম কিনা? এরা জাতি-শত্রুকে ধ'রে আস্তে আস্তে এমন কাহিল করে যে, তাকে চির-দিনের মত শিক্ষা দিয়া দেয়।

ফল কথা, জন্তুরা যেমন উদ্ভিদ্দের উৎপীড়িত করে তুলেছিল; কেটে, মেরে, ছিঁড়ে, খেয়ে, নানারূপে তাহাদের যেমন সর্ব্বনাশ করিবার যোগাড় করে নিয়েছিল, তা'তে ওরা যদি এই প্রকারে নানা রকম চেষ্টা ক'রে আত্মরক্ষা না করিত, তবে টিঁকিতেই পারিত না। নাম ক'রে আর কি হবে, সকলেই জানেন। এদের মধ্যে কেহ বা কাঁটা জন্মাইয়া, কেহ বা আটা জন্মাইয়া, কেহ বা বিস্বাদ হয়ে, কেহ বা বিবর্ণ হয়ে,' কেহ বা তিক্ত, কেহ বা বিষাক্ত হয়ে, কেহ বা নানাবিধ রাসায়নিক বস্তু তৈয়ারি করে, শত্রুদমন করিতে ও জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। নতুবা জন্তুরা এদের চিহ্নও রাখিত'না। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও এরা যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে টিঁকে আছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়; ইহারা দুর্ব্বল পতিত মানবের মহা শিক্ষার স্থল।

* Insectivorous. † Bacteria.

ত্বক্।

চক্ষু কর্ণাদি যেমন প্রত্যেকেই এক একটী ইন্দ্রিয়, ত্বক্ সেরূপ একটী ইন্দ্রিয় নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে এক্ষণে দুইটী বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি বলিতে হয়। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাকে যুগ্ম ইন্দ্রিয় বলাই অধিকতর সঙ্গত। কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ জীবগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, ত্বক-ইন্দ্রিয় সর্ব্বেন্দ্রিয়,সমষ্টি। প্রাথমিক জীবগণের কোন ইন্দ্রিয়ই নাই, কিন্তু ত্বক্ আছে। তদ্বারাই তাহাদিগের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। উচ্চতর জীবগণের ইন্দ্রিয় সকল ত্বক্ ইন্দ্রিয়েরই বিকার মাত্র। জীব যতই নিম্ন হইতে উচ্চ শ্রেণীতে আরোহণ করিয়াছে, ততই ত্বক্-ইন্দ্রিয় হইতে ক্রমশঃ চক্ষু কর্ণাদি জাত হইয়াছে। এই দিক হইতে দেখিলে ইহাকে অন্য ইন্দ্রিয়গণের পিতামহ বলা যায়। অন্যান্য বিশেষ ইন্দ্রিয় সমুদ্ভূত হওয়ার পর তাহারা স্ব স্ব কার্য্যভার ত্বকের নিকট হইতে গ্রহণ করায় ত্বক এক্ষণে সে সকল কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও তাহার প্রতি দ্বিবিধ কার্য্যভার ন্যস্ত আছে। এই নিমিত্তই তাহাকে যুগ্ম-ইন্দ্রিয় বলিয়াছি। নিম্নে এই তত্ত্ব যথাসাধ্য বিশদ করিতে ইচ্ছা করিব ; কারণ ইহার সহিত জীবের বুদ্ধি বিকাশের ইতিহাস ঘনিষ্টরূপে জড়িত রহিয়াছে।

ভ্রূণ তত্ত্বের আলোচনায় জানা যায় যে, জীবকোষ বহুভাগে বিভক্ত হইয়া জীবদেহ গঠিত করে। একটী কোষ দ্বিখণ্ডিত হইল, উহার প্রত্যেক খণ্ড আবার দ্বিখণ্ডিত হইল, এই খণ্ড চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটী আবার দ্বিখণ্ডিত হইল। এইরূপে মূলকোষ বহুভাগে খণ্ডিত হইতে থাকে। ক্রমে বিভাগ কার্য্য যতই অগ্রসর হয়, ততই কোষ খণ্ড সকল কখন বা পাশাপাশী,কখন বা উর্দ্ধাধঃ রূপে বিভক্ত হয়। এরূপ বিভাগের ফলে কোষ পিণ্ড উৎপন্ন হয় ও তাহাতে তিনটী স্তর গঠিত হয়। (১) এই কোষপিণ্ড গোলাকৃতি ; সুতরাং যাহা উর্দ্ধস্তর, তাহাই ঐ পিণ্ডের বহিরাবণ হইয়া যায় ; যাহা অধস্তর তাহাই কেন্দ্রাবরণে পরিণত হয় ; এবং যাহা মধ্যস্তর, তদ্বারা মধ্যাবরণ নির্ম্মিত হয়। এই বহিরা-

---

(১) Foster and Balfour Embryology 2d Edn. p, 319—317.

স্মরণই জীবদেহের বাহ্যত্বক; ইহা হইতেই ত্বক্‌, লোম, কেশ, নখাদি (২) উৎপন্ন হয়; এবং অপর দুই আবরণ হইতে দেহের অন্যান্য অংশ সকল নির্ম্মিত হয়। চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা—ইহারাও বাহ্য ত্বকের বিকার। ত্বক্‌ই বিভিন্নরূপে গঠিত হইয়া কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা নির্ম্মিত হইয়াছে; আর ত্বকেরই স্থান বিশেষে স্ফীত কোষ উৎপন্ন হইয়া তাহাতে বর্ণোপকরণ (৩) সঞ্চিত হওয়ায় চক্ষু সঞ্জাত হইয়াছে। নিম্নতম প্রাণী হইতে মানব পর্য্যন্ত সকলেরই কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের উৎপত্তির ইতিহাস এইরূপ। সুতরাং ত্বক্‌ হইতেই ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হইয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না (৪)। নিম্ন প্রাণীগণ মধ্যে অনেকের চক্ষু নাই, কিন্তু দেখিতে পায়; কর্ণ নাই, শুনিতে পায়, জিহ্বা নাই, স্বাদ পায়; এবং নাসিকা নাই, ঘ্রাণ পায়। ইহাদিগের এই সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য একত্বক্‌ ইন্দ্রিয় দ্বারাই সম্পন্ন হয়। চক্ষু না থাকিলেও, দর্শনেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অভাব সত্ত্বেও, বাহ্যত্বক্‌ অথবা তৎসংলগ্ন সূক্ষ্ম আঁশবৎ পদার্থ দ্বারা কোন কোন প্রাণী আলোক এবং অন্ধকারের প্রভেদ বুঝিতে পারে। এই সকল আঁশ ত্বকেরই রূপান্তর মাত্র। এক শ্রেণীস্থ ঊর্ণনাভ (৫) নিবিড় অন্ধকারপূর্ণ গুহামধ্যে বাস করে। উহাকে আলোতে আনিলেই অন্ধকারের দিকে যাইতে চাহে। উহার চক্ষুর কোন কিছুই নাই, এবং আঁশ কি শিরা কিছুই নাই। উহার আলোকের অনুভূতি ত্বক্‌ দ্বারাই হইয়া থাকে। সমুদ্রের মেডুসা Medusa ছত্রের ন্যায়; ঐ ছত্রের কিনারায় যে সকল গোলাকার কোষ আছে, তদ্দ্বারাই ঐ জীব আলোক অনুভব করিতে সক্ষম হয়। সমুদ্রবাসী কোন কোন মৎস্যের (Star fish) ডানাতে বর্ণোপকরণ বিশিষ্ট কোষ আছে; তাহাতেই উহাদিগের চক্ষুর কার্য্য হয়। কোন কোন শুগ্‌লিও (Oyster) তাহার বাহ্যাবরণের কিনারা-সংলগ্ন কোষ দ্বারা অন্ধকার হইতে আলোকের পার্থক্য বুঝিতে পারে।

---

(২) কেশ, লোম, নখাদি ত্বকের বিকারমাত্র।

(৩) Pigment, নব্যভারত ১৩১২ সন পৃষ্ঠা ৪০১—৪০২।

(৪) I am inclined to believe that the primal, fundamental sense—the sense of touch—from which all other senses have been evolved or developed has been in existence almost as long as life. Weir—The Dawn of reason p. 7.

(৫) Anthrobia.

অধিকাংশ চক্ষুহীন পোকার ত্বকে বর্ণোপকরণযুক্ত যে সকল কোষ আছে, তদ্দ্বারাই তাহারা আলোক অনুভব করে। ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। উহার বাহ্য-ত্বকে বর্ণোপকরণবিশিষ্ট ক্ষুদ্র গোলাকার গাঁইটের ন্যায় যে সকল কোষ আছে, তাহাতেই উহার চক্ষুর কার্য্য হয়। শম্বুকের চক্ষু তাহার শূঁড়ের অগ্রভাগে; তদ্দ্বারা সে দেখিতে পায়। শূঁড় বাহ্যত্বকেরই বিকাশ মাত্র। কোন কোন ছুঁচো চিরদিন অন্ধকারে বাস করে; এ নিমিত্ত তাহাদিগের চক্ষু একরূপ ক্রিয়াহীন হইয়া গিয়াছে; তথাপি তাহারা আলোক ও অন্ধকারের প্রভেদ বুঝিতে পায়। দাক্ষিণাত্যের উপকূলে কতিপয় সামুদ্রিক মৎস্য পাওয়া যায়, তাহাদের পৃষ্ঠস্থিত কোষ সকলই দর্শন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করে। কীট পতঙ্গদিগের মধ্যে অনেকের শূঁড়ের অগ্রভাগস্থ কোষই চক্ষু। মানবজাতির মধ্যেও কোন কোন জন্মান্ধ আলোক ও অন্ধকারের প্রভেদ বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। তাহাদিগের চক্ষু স্থানের ত্বক্ দ্বারাই এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। জীবদেহে চক্ষু উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, কখন বা ত্বক্ সংলগ্ন বর্ণোপকরণ-যুক্ত স্ফীত কোষ; কখন বা আঁশ, শিরা, অথবা শূঁড়ের অগ্রভাগস্থ ঐরূপ কোষ, দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য নিষ্পন্ন করিত। দেহের ত্বক্ সংলগ্ন কোষের বিকারেই আঁশ শিরা অথবা শূঁড়ের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার আঁশ, শিরা অথবা শূঁড়ের খর্ব্বতা বা লোপ বশতই চক্ষু পুনরায় দেহ সংলগ্ন হইয়াছে। প্রকৃত চক্ষু থাকুক, আর নাই থাকুক, জগতে বোধ হয় এমন জীবই নাই, যে আলোক এবং অন্ধকারের প্রভেদ বুঝিতে না পারে।* ত্বক্ অথবা ত্বকের বিকারই চক্ষুহীনের চক্ষু।

কর্ণের উৎপত্তির পূর্ব্বেও ত্বক্‌সংলগ্ন কোষ, আঁশ, কেশ, কিম্বা বাহ্য ত্বকের অন্য কোন বিকারের দ্বারা শ্রবণ কার্য্য সম্পন্ন হইত। কতিপয় পিপীলিকা, মশক, প্রজাপতি, ফড়িং, রেশম কীট, গোবরে পোকা এবং ছারপোকার মধ্যে কাহারও বা শূড়ে, কাহারও বা পায়ে আঁশ, কেশ অথবা বর্ণোপকরণযুক্ত কোষ আছে; তদ্দ্বারাই তাহারা শুনিতে পায়। উহা কাটিয়া দিলে ঐ সকল জীব বধির হইয়া যায়। এস্থলেও প্রথমতঃ ত্বক্ সংলগ্ন কোষ, পরে আঁশ আদি, অবশেষে তাহার খর্ব্বতা অথবা লোপে পুনরায় ত্বক্‌লগ্ন শ্রবণেন্দ্রিয়

* "I do not believe that there is a creature in existence today, whether it has eyes or not, which cannot tell the difference between night and day. Dawn of Reason, p 12.

গঠিত হইয়াছে। বাহিরের কর্ণ-পল্লব প্রকৃত শ্রবণেন্দ্রিয় নহে; উহা কেবল শব্দকে ঘনীভূত এবং একত্রিত করে। আর উহার সঞ্চালনে শব্দের দিক্ নির্ণয় হয়। *

অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক কীট মধ্যে কতিপয় কীটের † বিলক্ষণ স্বাদজ্ঞান আছে। তাহাদের আহার্য্য বস্তু শ্বেতসার। এই শ্বেতসারের চূর্ণ এবং বালিকণা ঐ সকল কীটের নিকটে রাখিলে, প্রথমোক্ত চূর্ণ অস্থায়ীকর দ্বারা গ্রহণ করে, কিন্তু বালুকা হয়ত গ্রহণই করে না, না হয় গ্রহণ করিলেও পরিত্যাগ করে। বালুকণা সকলকে কদাচ দেহমধ্যে প্রবিষ্ট করে না। প্রাথমিক জীব সকলের অনেকেরই এইরূপ। নিজের দেহ পোষণোপযোগী বস্তু ভিন্ন অন্য বস্তু ধরিলেও দেহমধ্যে প্রবিষ্ট করায় না। ইহারা আহার্য্য বস্তুর স্বাদ আপনা হইতেই বুঝিতে পারে, এবং বোধ হয় সেই নিমিত্তই কোন বস্তু গ্রহণ এবং অপর বস্তু পরিত্যাগ করে। স্বাদ এবং ঘ্রাণ, এতদুভয় অতিনৈকট্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট, এবং ইহাদিগের ক্রিয়াও প্রায় একপ্রকার। এই দুইটী ইন্দ্রিয় দ্রব্য-সংস্পর্শেই ক্রিয়া করে; প্রকৃত ত্বগিন্দ্রিয়ও সেইরূপই ক্রিয়া করে; কিন্তু চক্ষু এবং কর্ণ বস্তু সংস্পর্শ অপেক্ষা করে না। এই দিক হইতে লক্ষ্য করিলে নাসিকা জিহ্বা, ত্বক্, এই তিনকেই স্পর্শেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। চক্ষু এবং কর্ণ এতদুভয়ও স্পর্শেন্দ্রিয়েরই পরিণাম অর্থাৎ ত্বকেরই বিকাশ; কিন্তু ইহারা বস্তু সংস্পর্শ অপেক্ষা করে না। আলোক ইথার-সমুদ্রের তরঙ্গ-জনিত; শব্দ বায়ু-সমুদ্রের তরঙ্গ-জনিত; এই উভয়বিধ তরঙ্গ-সংস্পর্শে চক্ষু এবং কর্ণ যথাক্রমে রূপ এবং শব্দ অনুভব করে। এই দুই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া তরঙ্গ-স্পর্শের ফল; অপর তিন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বস্তু-স্পর্শজাত। রসনায় চিনি স্পর্শ না হইলে স্বাদ জ্ঞান হয় না; কর্পূরকণা নাসিকায় স্পর্শ না হইলে ঘ্রাণ বোধ হয় না, কিন্তু সূর্য্যদেবকে দূর হইতে দেখিতে পাই; সঙ্গীত দূর হইতে শুনিতে পাই। এই জন্যই বলিয়াছি যে, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক প্রকৃত পক্ষে স্পর্শ ইন্দ্রিয়ই। চক্ষু কর্ণকে দূরেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। লর্ড-কেল্‌ভিন্ বলিয়াছেন যে Smell and taste are extremes of one sense অর্থাৎ ঘ্রাণ এবং স্বাদ একই ইন্দ্রিয়ের পরিণাম। (‡) এই আলোচনা হইতে বুঝা যাইতে

* মানবের সঞ্চালন ক্ষমতা লোপ হইয়াছে।

† Actenophyr Eichornii.

‡ Lord Kelvin—Constitution of matter, p 299.

পারে যে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কর্ম্মও ত্বকের উপরেই নির্ভর করে। গন্ধ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বিশেষ পরীক্ষা করা হয় নাই; তথাপিও লাবক্ (Lubbock) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ যাহা কিছু পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, নাসিকা উদ্ভব হইবার বহু পূর্ব্বে জীব-রাজ্যে গন্ধবোধ অজ্ঞাত ছিল না।

এইরূপে অতি নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রাণীদিগের ব্যবহার আলোচনা করিলে. জানা যায় যে, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল না থাকিলেও দর্শন-শ্রবণাদি কর্ম্মের ব্যাঘাত হয় না। তাহাদিগের জীবন-ব্যাপারের উপযোগী সমস্ত কার্য্যই কেবল ত্বকের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। সত্যই ত্বক্ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পিতামহ। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, জীব সকলের ডিম্বাবস্থায় কিম্বা ভ্রূণাবস্থার প্রথম ভাগে কোষ বিভাগ হেতু যে তিনটী আবরণ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে বহিরাবরণ হইতেই চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল জাত হইয়াছে। সুতরাং ঐ বহিরাবরণ অথবা ত্বক্ই যে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্ব পুরুষ, ইহা স্বভাবতই অনুমিত হইতে পারে; আর নিম্নতম জীবগণের ব্যবহার দ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

কিন্তু উচ্চ প্রাণিগণের বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় সকল সমুদ্ভূত হইবার পর ত্বকের কার্য্যভার অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া থাকিলেও ত্বক্ অদ্যাপি দ্বিবিধ কার্য্য করিতেছে। ত্বকের কার্য্য এখনও অন্যান্যের দ্বিগুণ। অন্যান্যের প্রত্যেকে এক একটী কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু ত্বক্ এখনও দুইটী পৃথক বিভাগের কার্য্য করে। কোন পদার্থ স্পর্শ করিলে, উহা কঠিন, কি নরম, কি তরল, তাহা আমরা ত্বক্ দ্বারা অনুভব করি; আর সঙ্গে সঙ্গেই ঐ পদার্থ উষ্ণ কি শীতল, তাহাও অনুভব করিয়া থাকি। এই দুইটী বোধ—অর্থাৎ কাঠিন্য এবং তাপ, দুইটী পৃথক অনুভূতি। কোন উষ্ণ বস্তু নিকটে থাকিলেও তাপ অনুভূত হয়, দূরে থাকিলেও তাপ অনুভূত হয়। তাপ অনুভব করিবার জন্য বস্তুর স্পর্শ আবশ্যক হয় না। কিন্তু স্পর্শ ব্যতীত কাঠিন্য অনুভব করা যাইতে পারে না, সুতরাং কাঠিন্য বস্তু-স্পর্শের ফল। কিন্তু কাঠিন্য বোধটী কি? একটা লৌহ-দণ্ড হাতে লইলাম; উহা কঠিন বোধ হইল। আবার কতকগুলি কাচচূর্ণ হাতে লইলাম; উহা থর্থরে বোধ হইল, এবং উহা হইতে খোঁচা লাগার ন্যায় বোধ জন্মিল। আর, কতকগুলি বালুকণা হাতে লইলে কেবল থর্থরে বোধই উৎপন্ন হইল, খোঁচা লাগিল না। একটু জল হাতে লইলে তরল বোধ হইল। এই সকল স্পর্শানুভূতির প্রকৃত অর্থ কি? লৌহদণ্ডের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ আমার হস্ত-ত্বকের প্রত্যেক ক্ষুদ্রাংশের উপর চাপ দিয়া একটা ভার বোধ

জন্মাইয়াছিল। তাহাতেই উহার কাঠিন্য অনুভূত হইয়াছিল। আর কাচ-চূর্ণের প্রত্যেকটী গুঁড়ার কোণ সকল আমার ত্বকের প্রত্যেক অংশের উপর ঐরূপই চাপ দেওয়ায় খোঁচা লাগিয়াছিল; খোঁচা আর কিছুই নহে, তীক্ষ্ণাগ্রভাগের চাপ মাত্র। বালুকা-কণাগুলির স্পর্শানুভূতি ও কাচ চূর্ণের ন্যায়, কেবল উহার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ না থাকায় উহার চাপ খোঁচার ন্যায় নহে। জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকলও আমার ত্বকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের সহিত সংলগ্ন হইয়াছিল। জলেরও ভার আছে, সুতরাং এস্থলেও চাপই স্পর্শানুভূতির কারণ। এইরূপে দেখা যাইবে যে, বাষ্পীয় পদার্থ সকলের স্পর্শানুভূতিও চাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদিগের ত্বকে চাপ পড়াতেই কোন বস্তু কঠিন, নরম, কি তরল, তাহা বুঝিতে পারি।

"কিন্তু চাপ কি? আমি আপনার গায়ে আস্তে হাত দিলাম; আপনার স্পর্শ-বোধ হইল, সুতরাং চাপ বোধ হইল। আমার হাতে ক্রমে একটু একটু জোর বাড়াইতে বাড়াইতে বেশি জোরে উহা আপনার গায়ে চাপিতে লাগিলাম। যতই হাতে জোর বেশি দেই, ততই আপনার গায়ে চাপ বেশি অনুভব হয়, জোর কমাইলেই চাপ কম বোধ হয়। সুতরাং চাপ-বোধ জোরের উপর নির্ভর করে, শক্তির উপর নির্ভর করে। গণিতজ্ঞ জানেন যে, শক্তির কথা ভাবিতে গেলেই শক্তি প্রয়োগের স্থান, শক্তির পরিমাণ, ও শক্তি-পরি-চালন-দিকের বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। শক্তি কোন্‌ স্থানে প্রয়োগ করা হইল, কি পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করা হইল, এবং ঐ শক্তির গতি কোন্‌ দিকে—এই সকল জ্ঞানের সমষ্টি লইয়াই শক্তি-জ্ঞান। কাঠিন্যাদি বোধ চাপের উপর এবং চাপ যখন শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে, তখন পরিণামে কাঠিন্যাদি বোধও শক্তির প্রয়োগ স্থান, পরিমাণ ও দিকের প্রতি নির্ভর করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ত্বক্‌-ইন্দ্রিয়ের একটী কার্য্য এই সকলের উপর নির্ভর করিতেছে। *

এক্ষণে ত্বকের আর একটী কার্য্যের বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। এই কার্য্য তাপবোধ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাপ বোধ করিতে তপ্ত বস্তুর সহিত ত্বকের সংস্পর্শ আবশ্যক হয় না। তবে কিরূপে তাপ-বোধ উৎপন্ন হয়?

---

* It (tactile sense) is a sense of force, of directions of forces, and of places of application of forces. Lord Kelvin—Constitution of matter, P, 304.

পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র এক লঘু হইতেও লঘুতর, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, অতীন্দ্রিয় বস্তু বিদ্যমান আছে। এই বস্তুর নাম দিয়াছেন, ইথার। তপ্ত বস্তুর পরমাণু সকল কম্পিত হইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ ইথার-সমুদ্রে তরঙ্গ উৎপাদন করে; সেই তরঙ্গ আমাদিগের ত্বকে আসিয়া আঘাত করিলে ত্বকেও তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। ক্রমে সেই তরঙ্গজনিত কম্পন উপযুক্ত স্নায়ুযোগে মস্তিষ্কে নীত হইলেই তাপ বোধ জাত হয়। তাপ বোধ ইথার-সমুদ্রের কম্পন হইতে জাত। (১) উহা তপ্ত বস্তুর আণবিক কম্পনের প্রতি নির্ভর করে।

ত্বকের দ্বিবিধ কার্য্য গণিতের ভাষায় বলিলে বলা যায় যে ত্বক = চাপ + তাপ।

চাপ ও তাপ-বোধের সমষ্টিই ত্বগিন্দ্রিয়ের কার্য্য। এই নিমিত্তই ত্বক্‌কে যুগ্ম-ইন্দ্রিয় বলিয়াছিলাম।

এক্ষণে, ত্বগিন্দ্রিয়ের তাপ বোধ-কার্য্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ উভয় কার্য্যই এক প্রকার। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আলোক-বোধ ইথার-সমুদ্রের কম্পন-জনিত; ঐ কম্পন আমাদিগের চক্ষুতে আঘাত করিলেই সেই আঘাত মস্তিষ্কে নীত হইয়া আলোক-বোধ উৎপন্ন করে। শব্দবোধ বায়ু-মণ্ডলের তরঙ্গ-জনিত। শব্দায়মান বস্তুর অণুসকল কম্পিত হইয়া বায়ুতে তরঙ্গ উৎপন্ন করিলে উহা কর্ণ-পটহে আঘাত করে, এবং তাহা হইতেই ক্রমে শব্দবোধ উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চক্ষু, কর্ণ ও ত্বক্ (অর্থাৎ ত্বকের তাপ-বোধ-ক্রিয়া) সম্পূর্ণ সম-শ্রেণীর;—সেই এক কম্পন-জনিত বোধ। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ (অর্থাৎ ত্বকের চাপ-বোধ) সম-শ্রেণীর; কারণ ইহাদিগের ক্রিয়া বস্তু-সংস্পর্শ-জনিত। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইন্দ্রিয় সকলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। (১) চক্ষু, কর্ণ ও ত্বক্, (২) নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। প্রথম শ্রেণীকে দূরেন্দ্রিয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে স্পর্শেন্দ্রিয় বলিয়াছি। কিন্তু দূরেন্দ্রিয়-

(১) পণ্ডিতগণ এক্ষণে যেন তড়িৎকেই একমাত্র শক্তি বিবেচনা করিতেছেন; তাপ, আলোক ইত্যাদি উহারই রূপান্তর মাত্র। বস্তু পদার্থ কিছুই নহে, উহা তড়িৎ-শক্তিরই বিকাশ। ঐ শক্তির ক্রিয়াবিশেষ [Vortex motion] হইতে এক ভ্রমাত্মক বস্তু-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে ইথার-সমুদ্রের ঘূর্ণপাকের ন্যায় গতি হইতেই বস্তুজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ১০৬—১৩০ পৃষ্ঠা।

গণের ক্রিয়াও ত্বকের উপর ইথার অথবা বায়ুগুলের তরঙ্গ-জনিত আঘাত-বশতই উৎপন্ন হয়। এই আঘাতের অর্থ শক্তির প্রয়োগ, সুতরাং পূর্ব্ববৎ শক্তির প্রয়োগ—স্থান, পরিমাণ ও দিকের প্রতি নির্ভর করে। আমরা দেখিয়াছি যে, দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়াও ঐ তিনের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উল্লিখিত দুই শ্রেণীর ক্রিয়াই মূলতঃ এক; দুই শ্রেণীর ইন্দ্রিয়ই প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার; অর্থাৎ বাহ্যজগৎ হইতে ত্বকের উপর যে শক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহারই পরিণাম। ত্বক্‌দ্বারাই এবং ত্বক্‌ হইতেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বিষয়-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে।

যে জীবের কোন ইন্দ্রিয় নাই, তাহারও ত্বক্‌ আছে। তখন ত্বক্‌ই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিত। কিন্তু সেই অনুন্নত সময়ে জীবন-ব্যাপার জটিল ছিল না; ক্রমে ত্বগিন্দ্রিয়ের বিকারেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়জাত হইল; এবং জীবন-ব্যাপারও ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিল। এই সময়ে অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন কার্য্যভার গ্রহণ করায় ত্বকের কার্য্যভার অনেক লাঘব হইয়াছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ লাঘব হয় নাই। উহার প্রতি তাপ ও চাপ, এই উভয় বোধের ভার যুগপৎ ন্যস্ত থাকায় এখনও উহার বলক্ষয় হইতেছে। শ্রম-বিভাগ জগতের সাধারণ নিয়ম; একের কার্য্য অনেকে করায় শ্রম-লাঘব হয়, তাহাতে কার্য্যেরও সুবিধা হয়। এই মৌলিক নিয়ম হইতেই জীব-দেহে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় সকল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও শারীর যন্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে। ক্রম-বিকাশের নিয়মানুসারে ত্বকের বর্ত্তমান দ্বিবিধ কার্য্যও কালে অবশ্যই পৃথক্‌ হইবে, এরূপ আশা করা যায়। তখন ত্বগিন্দ্রিয়ও চক্ষু কর্ণাদির ন্যায় একটীমাত্র কার্য্য করিবে। অপর কার্য্য অন্য উপায়ে সংসাধিত হইবে। চক্ষু কর্ণের সহিত ত্বকের সমতা রক্ষা করিতে হইলে বোধ হয় যেন ত্বক কেবল তাপ-বোধই রাখিবে, চাপ-বোধের ভার অন্যের প্রতি অর্পিত হইবে। আর নাসিকা এবং জিহ্বার সহিত সমতা রক্ষা করিলে ত্বকের চাপ-বোধ মাত্র থাকিবে; তাপ-বোধ অন্যের কার্য্য হইবে। কিন্তু এতদুভয় প্রকার পরিণতির মধ্যে কোন্‌টী অধিকতর সম্ভব, তাহা কল্পনা করিতে সাহস হয় না। তবে, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ত্বকের কার্য্য-বিভাগ হইবেই। যখন ত্বকই একমাত্র ইন্দ্রিয় ছিল, তখন জীব অনুন্নত ছিল; কারণ একা সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে গেলে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না; সুতরাং বাহ্য-জগতের জ্ঞানও অপরিস্ফুট হয়। ক্রমে বিবিধ ইন্দ্রিয় জাত হইলে যেমন তাহাদিগের আপন

আপন কার্য্যও সুসম্পন্ন হইতে লাগিল, জীবের জ্ঞানও ততই পরিস্ফুট ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আমরা বাহ্য-জগতের কম্পন-সমুদ্রের মধ্যে বাস করিতেছি; চারিদিকেই কম্পন, চারিদিকেই স্পন্দন। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ চিরাতীত কাল হইতে কেবল কম্পনের ঘাত-প্রতিঘাত অনুভব করিতেছে। ইহারই প্রতিক্রিয়া বশতঃ মস্তিষ্ক-পদার্থ ক্রমে জটিলতা প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং জীবের বুদ্ধিও পরিমার্জ্জিত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়গণের বিকাশই মানবের বিরাট উন্নতির মূল কারণ।

উদ্ভিদের পরার্থপরতা।

ছোট হউক বড় হউক, প্রত্যেক উদ্ভিদই এক একটী জাতি। যেমন বাঙ্গালী, ইংরেজ, চীনা, জাপানী এক একটী জাতি, তেমনই প্রত্যেক গাছই এক একটী জাতি। যেমন রাম, শ্যাম, টম্, ডিক, চ্যাং প্রভৃতি এক এক ব্যক্তি, তেমনই গাছেরও প্রত্যেক পত্র এক এক ব্যক্তি। গাছের তো সকলই পত্র; পত্র, পুষ্প, ফল, কাঁটা, শিরা ছাল, ডালপালা ইত্যাদি যত কিছু সবই পত্রের রূপান্তর। বীজ হইতে যত গাছ হয়, সকলই এক-পত্রক অথবা দ্বিপত্রক।* অর্থাৎ সকলেরই বীজপত্র প্রথমে একটী অথবা দুইটী উদ্গত হয়। ইহার বিকারেই গাছের সমস্ত অংশ নির্ম্মিত। সুতরাং পত্রই ব্যক্তি। যেমন বহু ব্যক্তিতে একটী জাতি, তেমনই বহু পত্রে অথবা পত্র-বিকারে যে গাছ হয়, তাহাও একটী জাতি। জীব-সমাজে যেমন ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতি আছে, উদ্ভিদ সমাজেও তেমনই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গাছ আছে। ব্যক্তি অল্পায়ু কিন্তু জাতি দীর্ঘায়ু। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন আয়ুষ্কাল আছে। কোন গাছ এক বৎসর, কোন গাছ দুই বৎসর বাঁচে। কেহবা এক শত, কেহবা দুইশত বৎসর বাঁচে। কিন্তু পত্র-ব্যক্তি বৎসর বৎসর মরিয়া যায়, অথবা আরও কিছুকাল বাঁচে। কিন্তু উহারা অল্পায়ুঃ। পাতা এবং গাছের জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু যেমন নিয়মাধীন, মানবীয় ব্যক্তি এবং জাতির ঐ সকলও তেমনই নিয়মাধীন। †

একটী জাতি থাকিলেই তাহার আয় ব্যয়, আত্মরক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা চাই। তবে, যে জাতির কপাল পুড়িয়াছে, তা'র কথা আলাদা। গাছের মূল ও পত্র আয় করে; পত্র বায়ু হইতে ও মূল মৃত্তিকা হইতে আয় সঞ্চয় করে। পুষ্প ব্যয়—বিভাগ। কোন কোন উদ্ভিদের পুষ্প এত খরচ

---

* Monocotyledon ও dicotyledon.

† A tree is a nation, with its units of leaf-population coming and going year after year. It is subject to the same laws of rise, decline and ultimate fall, which history shows has characterised the national life of many countries.—Sagacity and morality of plants. p. 160.

করিয়া বসে যে ফুল থেকে বীজ তৈয়ারী হইলেই গাছেরও পঞ্চত্ব হয়। ফল গুলি রাজ্য বিস্তার করিয়া বেড়ায়, আর নানা দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। উহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে বীজ লইয়া যায়। কেহবা বায়ুতে চড়িয়া, কেহবা স্রোতে সন্তরণ করিয়া, কেহ বা নানা জন্তুর পেটে পীঠে উঠিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়া থাকে। তা'র পর, কাঁটা, খোঁচা নানাবিধ বিষ ও তীব্র আঘাতকর পদার্থ প্রস্তুত করিয়া আত্মরক্ষা করে। ইহারাই এক একটী সৈনিক পুরুষ।

আত্মরক্ষার আর একটী কৌশল ইহারা বেশ শিখিয়াছে। ইহারা অনেকেই সমাজবদ্ধ হয়। এবং এই উপায়ে নিতান্ত ক্ষুদ্র, দুর্ব্বলও পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর বলশালী হয়। যে যত ছোট ও দুর্ব্বল, সে যেন ততই বেশি সমাজবদ্ধ। পদদলিত দুর্ব্বা ঘাস অবধি মাথার ছাদের উপরকার শ্যাওলা * পর্য্যন্ত অতি ক্ষুদ্র, অতি দুর্ব্বলেরা কেমন লাখে লাখে জমাট বাঁধিয়া থাকে! কোন্ মনুষ্য-সমাজ ইহাদিগের সমাজের ন্যায় এত বিপুল! ইহারা জানে যে ইহারা ক্ষুদ্র। নানারূপেই অন্যে ইহাদিগকে সংহার করিতে পারে; ইহাদিগের কাঁটা ইত্যাদি কোন রূপ অস্ত্র নাই। অধ্যাপক টম্‌সন্ যে দিন মানবসমাজকে উৎসাহিত করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"The lower classes make their scores owing to their quantity and not to their quality." *

অর্থাৎ ইতর লোকেরা সংখ্যায় অধিক বলিয়া জয়ী হয়, গুণশালী বলিয়া নহে, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই উদ্ভিদেরা সামাজিক একতার ফল বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল; সংখ্যার বিশালতা যে জয়যুক্ত হইবার প্রধান হেতু, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিল। ছোট হউক, বড় হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।†

অনেক ফুল যেন এক একটী গ্রাম। আম্‌বেলিফেরী, কম্পোজিটী প্রভৃতি উদ্ভিদের এক একটী ফুল প্রকৃতপক্ষে এক একটী নহে, বহু ফুলের সমষ্টি; যেমন বহু লোকে এক গ্রাম, তেমনই বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল একত্রিত হইয়া একটী গ্রাম

---

* পাঠক এমন মনে করিবেন্ না যে আমার ঘরের ছাদ দিয়া জল পড়ে। তাহা হইলে দুঃখিত হইব।

* Heredity p. 52-3

† Their smallness has conduced to their social habits—sagacity p 170.

রচনা করে; আমরা তাহাকেই একটী ফুল বলি। দৃষ্টান্তস্থলে গ্যাঁদাফুল, সূর্য্যমুখী প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাহাকে একটী গ্যাঁদা ফুল বলে, তাহার নীচেকার খোসা ছাড়াইলে দেখা যায় যে, একটা আধারের উপর অনেকগুলি ফুল সজ্জিত রহিয়াছে৭ এই শ্রেণীর ফুলেরা পরস্পরের কতই উপকার করিতেছে, পরস্পরের উপকারের জন্য কতই স্বার্থত্যাগ করিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে মানব-শ্রেষ্ঠও লজ্জিত হইবেন। ইহাদিগের এক একটী ফুল কত সূক্ষ্ম, কত ছোট! যে সকল প্রজাপতি পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে রেণু ও কেশর বহন করিয়া ইহাদিগের বংশবৃদ্ধির সহায়তা করে, তাহারা এই জাতীয় ফুল এক একটী পৃথকভাবে থাকিলে হয় তো দেখিতেই পাইত না; পাইলেও তাহার উপর বসিতে পারিত না; সুতরাং ইহারা নির্ব্বংশ হইয়া যাইত। তখন ইহারা কি আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করিল! অধিক সংখ্যক একত্র হইয়া একটী ফুলের মত ভান করিতে লাগিল। তাহার ফলে ইহাদিগের প্রত্যেকের বর্ণ পুঞ্জীকৃত হইয়া সুন্দর শোভা ধারণ করতঃ পতঙ্গের চক্ষু আকৃষ্ট করিল। ইহাদিগের মধু নাই, পতঙ্গ যাইবে কি লোভে? অনেকে একত্র হইয়া সাজিয়া গুছিয়া রূপের বাহারে পতঙ্গকে মুগ্ধ করিল। তাই আজ ধরাতলে ইহারা জীবিত আছে। নতুবা বহু পূর্ব্বে ইহাদিগের উদ্ভিদ-জন্ম শেষ হইয়া যাইত। তার পর ইহাদিগের আর এক কৌশল যেরূপ বিস্ময়জনক, তেমনই প্রশংসনীয়। অনেক গ্যাঁদা ও সূর্য্যমুখীর পরিধির অর্থাৎ কিনারার নিকটবর্ত্তী ফুলগুলি মাঝের ফুলগুলি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লম্বা ও বৃহৎ; এই লম্বা ফুলগুলি জনন-শক্তি-হীন অর্থাৎ ইহাদিগের বিচি হয় না। এখন বিবেচনা করুন কি আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগ। এই কিনারার ফুলগুলি আয়তনে বড় ও পুষ্ট হইয়াছে; মাঝের ছোট ও দুর্ব্বল ফুলগুলিকে ইহারাই রক্ষা করিয়া থাকে। প্রবল বায়ু প্রভৃতি আপৎকে নিজ শিরে বহন করিয়া ছোটগুলিকে রক্ষা করে। নিজের বৃহৎকায় দেখাইয়া পতঙ্গগুলিকে আহ্বান করে; কিন্তু সে ক্ষুদ্রগুলির বংশ-রক্ষার নিমিত্ত। কারণ নিজে জননশক্তি-হীন। ক্ষুদ্রগুলির উপকারের নিমিত্ত নিজেরা নির্ব্বংশ হওয়া স্বীকার করিয়াছে। পরোপকারব্রত ধারণ করতঃ নিজেরা চির কুমার যোগী সাজিয়াছে। * এমন পরার্থপরতা মানবেও দুর্লভ।

* Their size has been increased for the benefit of their brethren, so as to render them more conspicuous to insects but they have sacrificed their own fecundity. —I bid ·p 168